Family Development Package - Book 5

The way is one

(মুসলিমদের একটাই পথ)

তাওহীদ ও শিরক
এবং
সুন্নাত ও বিদ'আত

আমির জামান
নাজমা জামান

Family Development Package – Book 5

Tawheed & Shirk – Sunnat & Bidat
তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নাত ও বিদ'আত

The Way is One

(মুসলিমদের একটাই পথ)

আমির জামান
নাজমা জামান

Islamic Creed & Monotheism

ইসলামী আকীদা ও আল্লাহর একত্ববাদ

সম্পাদনা পরিষদ

✍
ড. মানজুরে ইলাহী
পি.এইচ.ডি. ইসলামিক ল
মদীনা ইউনিভার্সিটি, সৌদিআরব

✍
শেখ বশির বিন আল মাসুমী
লেখক : ইসলামিক শিক্ষা সিরিজ
মক্কা, সৌদিআরব

✍
জাবেদ মুহাম্মাদ
পি.এইচ.ডি গবেষক
ইউনিভার্সিটি অব রেজাইনা, ক্যানাডা

✍
ড. কায়সার মামুন
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
সিংগাপুর

✍
সাইদুল হোসেন
লেখক এবং গবেষক
ক্যানাডা

✍
আলী আকবর
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
আমেরিকা

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

The Way is One
(মুসলিমদের একটাই পথ)

Amir Zaman
Nazma Zaman
Toronto, Canada
Email: themessagecanada@gmail.com

© Copyright: IFD Trust

1st Edition: June 2009
2nd Edition: December 2011
3rd Edition: January 2013
4th Edition: December 2015

প্রাপ্তিস্থান

Bangladesh:

IFD Trust	**UZ Sales Centre**	**Taleb Pharma**	**Al-Maruf Publications**	**Kabir Pablishers**
Mohammadpur	Dhaka	NurJahanRoad	Katabon, Dhaka	Chittagong
Dhaka	01712846164	Dhaka	029673237	01613061653
01710219310	01675865180	01917216350	01913510991	
01682711206		01712177474		

Canada:

TIC	**ATN Book Store**	**Proton Book Store**
Toronto Islamic Centre	Danforth, Toronto	Danforth, Toronto
575 Yonge St. Toronto	416-686-3134	416-686-3134
647-350-4262	416-671-6382	416-671-6382

Other Countries:

New York, USA	**California, USA**	**London, UK**	**Singapore**
917-671-7334	714-821-1829	447424248674	65-938-67588
718-424-9051	714-930-6677		

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা (BDT)
Price: $7 (Seven Dollars)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এই বইয়ের উদ্দেশ্য

আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু,

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি, আমরা ভুল ইবাদত করা থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাচ্ছি এবং এর সাথে সাথে আমাদের খারাপ আমলের জন্য তাঁর কাছেই ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যে পথভ্রষ্ট হয় তাকে আল্লাহ ছাড়া কেউ হিদায়াত দিতে পারে না।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ নামের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ থেকে ক্যানাডা মত একটি অমুসলিম দেশে এসে মনে হচ্ছে যেন নিজেরা জন্মগতভাবে মুসলিম হওয়া সত্বেও যেন আবার নতুন করে মুসলিম হলাম। আমরা এই প্রবাসে দীর্ঘ পনের বছর কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে (authentic source-থেকে) পড়াশোনা করে সঠিক ইসলামকে নতুন করে আবিষ্কার করি।

দুঃখের বিষয়, আমরা বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই জানিনা যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আমরা জানি না। অনেক সময় আমরা ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের অনেক মানুষই দ্বীন ইসলামের পূণ্যের কাজ মনে করে খুব বেশী বেশী শিরক ও বিদ'আতী কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছি। আমরা কুরআন থেকে নিজেদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখে নিজেদের মনগড়া ইসলাম পালন করে যাচ্ছি।

আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যিনি জীবনে একবার সম্পূর্ণ কুরআনটা অর্থ বুঝে ব্যাখ্যাসহ পড়েছি, সহীহ হাদীসগ্রন্থগুলো পড়েছি। আল্লাহ বলেছেন কুরআন আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (complete code of life) অর্থাৎ আমাদের জীবন পরিচালনার গাইডলাইন। অথচ কি দুঃখের কথা, সারা জীবন শুধু কুরআন তিলাওয়াতই করে গেলাম কিন্তু এর অর্থ কি তা কিছুই বুঝলাম না! আর কুরআন তথা আল্লাহর আদেশ/নির্দেষ যদি নাই বুঝি তাহলে আল্লাহর দেয়া এই জীবন পরিচালনা করব কিভাবে?

সূরা বাকারার ১৪০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে?" মহান আল্লাহর এই হুকুমকে পালন করার জন্য ২০০৭ সালে আমরা

দেশে যাই এবং A to Z লিষ্ট করে আমাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও প্রতিবেশীদেরকে ডেকে নিয়ে একটি Multimedia Presentation-এর মাধ্যমে তাদেরকে দ্বীনের 'সঠিক মেসেজ' বা বাণী পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করি এবং প্রতিটি পরিবারকে এক সেট সহীহ (authentic) ইসলামী বই উপহার দেই।

এই বইটি ছাপাতে গিয়ে আমরা গত ১৫ বছর নিয়মিত আকীদার উপর পড়াশোনা করেছি, এবং এখন পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় ৮-৯ ঘন্টা করে পড়াশোনা করে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করা ড. মনজুর ই ইলাহী ভাই এবং তার সাথে বিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ আমাদের এই বইটি আগাগোড়া সম্পাদনা করেছেন, এজন্য আমরা তাদের নিকট আন্ত রিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া এই বইটির গবেষণা কাজ চলাকালে আমরা University of Toronto-তে অনুষ্ঠিত Al-Kauther-এর আকীদার উপর একটি পরিপূর্ণ কোর্স করার সুযোগ পাই এবং শিক্ষক হিসেবে অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত (মদিনা ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটেড) ড. তৌফিক চৌধুরীর কাছ থেকে আমাদের এই বইয়ের অনেক বিষয়-ই পরিষ্কার করে নেই। এখানে এসে একটা স্বীকৃতি দিতে হবে যে আমরা বহু authentic বইপত্র এবং ওয়েবসাইট ঘেঁটে রেফারেন্স সংগ্রহ করে এই বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছি। যার জন্য আমরা সেই সব লেখকদের জন্য প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং তাদের জন্য দু'আ করছি।

এই বইয়ে কোন বিষয়ে-ই নিজেদের মনগড়া কোন কথা বলা হয়নি। যা গবেষণা করে উপস্থাপন করা হয়েছে তা অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিলের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। আর আগাগোড়া মূল বিষয়টি অর্থাৎ "সহীহ আকীদার" দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। কারণ একজন মানুষের জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি তার আকীদা ঠিক না থাকে।

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ইমেইল অথবা টেলিফোনে জানালে আগামী সংস্করণে তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে সঠিক পথে চলার তৌফিক দিন।

জাযাকআল্লাহু খায়রন,

আমির জামান ও নাজমা জামান
টরন্টো, ক্যানাডা

বইটি পড়ার আগে কিছু মূল্যবান তথ্য আমাদের জানা প্রয়োজন

ভারতবর্ষ প্রায় দুইশত বৎসর খ্রীষ্টানদের অধীনে থাকাকালে তৎকালীন এক বিট্রিশ প্রধানমন্ত্রী মি. গ্ল্যাডষ্টোন (১৮০৯-৯৮) একদিন একটি কুরআন উঁচু করে ধরে হাউজ অফ কমন্সে বলেছিলেন, - "দেখ, এটা হচ্ছে মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন, মুসলিমগণ যদি এই কুরআনের সঠিক শিক্ষা লাভ করে তবে তোমরা কোন মুসলিম দেশেই তোমাদের শাসন চালাতে সক্ষম হবে না। তোমরা যদি মুসলিম দেশগুলির উপর নিরাপদে রাজত্ব করতে চাও, তাহলে এই কুরআনের সঠিক শিক্ষা হতে মুসলিমদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।" মুসলিমদের কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল ঃ

১) প্রথম পরিকল্পনা ঃ ধর্মীয় শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র তথা ইংরেজদের হাতে থাকবে। আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রিন্সিপাল যেন ইংরেজ হতে পারে, তার জন্য আইন করলো I.C.S ক্যাডার ছাড়া কেউ প্রিন্সিপাল হতে পারবে না। তৎকালীন সময়ে মুসলিম ওলামাগণ ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, ইংরেজী নাসারাদের ভাষা, এটি শিক্ষা করা হারাম। তাই ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করার ফলে কোন মুসলিম I.C.S ক্যাডার হতে পারেননি। অন্যদিকে হিন্দু I.C.S ক্যাডারকে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করলে মুসলিমগণ কোন অবস্থাতেই মেনে নিবেন না। তাই খ্রীষ্টান I.C.S ক্যাডারগণ কোলকাতার আলীয়া মাদ্রাসাগুলির প্রিন্সিপাল ছিলেন একে একে ২৬ জন।

২) দ্বিতীয় পরিকল্পনা ঃ অনুযায়ী তারা মুসলিমদের মধ্যে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়া হলো যে, "মানুষের জীবনে দুইটি অংশ, একটি হলো দ্বীনদারী এবং আর অপরটি হলো দুনিয়াদারী।" দ্বীনদারী এবং দুনিয়াদারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, একটা থেকে অন্যটা সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বীনদারীর ব্যাপার শুধু দেখবে মাদ্রাসার হুজুররা এবং দুনিয়াদারী হলো কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিত মানুষের জন্য।

'দ্বীনদারী' হলো-

আকাশের উপরের এবং মাটির নীচের ব্যাপার যেমন, পরকালে কী হবে, কবর কিভাবে খুঁড়তে হবে, বাঁশ-চাটাই কয়টা লাগবে, কাফনের কাপড় কেমন হবে, লাশের গোসল গরম পানি না ঠান্ডা পানি দিয়ে হবে, আতর গোলাপ কেমন লাগবে, কবর আজাব কেমন হবে, মিলাদ কিভাবে পড়াতে হবে, কয়টা গরু দিয়ে চল্লিশা করতে হবে, হুজুর ভাড়া করে এনে কতবার সবিনা খতম পড়াতে হবে, জান্নাতে কতগুলো হুর দিবে, জান্নাতে ফুলের বাগান কেমন হবে, কেমন ফল খেতে দিবে, জাহান্নামে আগুনের তাপ কেমন হবে, পুল-সীরাত কত চিকন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মক্তব ও মাদ্রাসা হবে এসব বিষয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা পেয়ে মাওলানা, মৌলবী ও হুজুরেরা তথাকথিত দ্বীনদারী বিষয়ে মানুষকে দিকনির্দেশনা দেবে তবে এর বাইরে অর্থাৎ দুনিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কোন কিছু বলার অধিকার থাকবে না।

'দুনিয়াদারী' হলো-

আকাশ এবং মাটির মাঝের অংশ অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আমরা যা কিছু করছি তাই দুনিয়াদারী। যেমন ঃ দেশ শাসন, সমাজ পরিচালনা, পরিবার গঠন ইত্যাদি।

৩) তৃতীয় পরিকল্পনা হলো ঃ মাদ্রাসার সিলেবাস তৈরী করা এবং সেই সিলেবাসে যেন আল কুরআন বলতে শুধু পরকাল সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু না থাকে। তখন থেকেই মাদ্রাসায় বাস্তব জীবন সম্পর্কিত আল-কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সুকৌশলে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। চালু হলো না বুঝে কুরআনে হাফিজ, বিভিন্ন রকম কুরআন খতম, কুরআন দিয়ে নানারকম তাবিজ-কবজ, চাল পড়া দিয়ে চোর ধরা, কুলখানী, মিলাদ, সবিনা খতম, হালাকা যিকর, মোরাকাবা, আওলীয়া হওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ, পীর-মুরীদি, পীরদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দান, কলব পরিষ্কার, নানরকম চিল্লা লাগানো, মাজারের খেদমত করা, মাজারে শির্ণি দেয়া, ফুল-ফল দেয়া, আগর বাতি দেয়া ইত্যাদি।

ইংরেজরা সুকৌশলে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে এমন দুই মেরুতে ভাগ করে দিলেন যে যারা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তারা প্রশাসনে আসতে পারবেন না অর্থাৎ দেশ চালানোর মতো তাদের কোন যোগ্যতা থাকবে না। যারা মাদ্রাসা থেকে পাশ করে বের হবেন তাদের পেশা হবে সাধারণতঃ মুসলমানী করানো, বিয়ে পড়ানো, তারাবী পড়ানো, ইমামতি করা, মুয়াজ্জিন হওয়া, জানাজা পড়ানো, নানারকম খতম পড়ানো, মিলাদ পড়ানো, জীন-ভূত তাড়ানো, মাদ্রাসায় পড়ানো ইত্যাদি। অন্যদিকে তারা সাধারণ স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজালেন যেন তার মধ্যে কুরআনের কোন প্রকৃত শিক্ষা না থাকে যদিও কুরআন হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (complete code of life). তাই যারা দেশ চালাবেন, পার্লামেন্টে বসবেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় চালাবেন, ইন্ডাসট্রিজ, ব্যাংক, কোর্ট, থানা, ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদির দায়িত্বে থাকবেন তাদের মধ্যে থাকবে না কুরআনের সঠিক শিক্ষা।

বিশেষ অনুরোধ ঃ কাউকে ছোট বা হেয় করার জন্য উপরের তথ্যগুলো দেয়া হয়নি এবং তুলনা করা হয়নি। কেউ আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু দুই প্রফেশনের ভাই-বোনদেরকেই সচেতন করা। আসলে দ্বীন ও দুনিয়া একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। (There is no Deen without Dunya)। আল্লাহ দ্বীন পাঠিয়েছেন এই দুনিয়াকে সঠিক নিয়মে পরিচালনার জন্যে। যিনি আমাদের পাঠিয়েছেন তিনিই ভাল জানেন কিভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করলে আমরা সকলে মিলে সুখে শান্তিতে থাকবো। আমরা যদি সঠিক ইসলামী শিক্ষাকে আমাদের প্রত্যাহিক জীবনের সাথে সমন্বয় (integrate) করতে পারি তাহলেই আমরা এই পৃথিবীতে এবং আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারবো।

সূচীপত্র

১ম অধ্যায় ঃ ইসলামী আকীদা (Islamic Creed)

আকীদা কী? ১৩
"আকীদা" শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ১৩
আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব ১৪
মানবজীবনে আকীদার প্রভাব ১৪
ইসলামী আকীদার উৎস ১৪
মানুষের আকীদা নষ্টকারী বিভিন্ন বিষয় ১৫
আকীদাগত বিষয়সমূহ ১৫
আকীদার উৎসগ্রন্থ এবং আকীদা বিষয়ক পূর্ববর্তী আলেমগণের নীতি ১৬
সঠিক আকীদা থেকে বিচ্যুতির কারণ এবং তা থেকে বাঁচার পন্থাসমূহ ১৭

২য় অধ্যায় ঃ তাওহীদ ও শিরক

তাওহীদ কী? ২১
তাওহীদের শ্রেণীবিভাগ ২১
শিরক কী? ২৬
শিরক আল-আকবর (বড় শিরক) ২৮
শিরক আল-আসগর (ছোট শিরক) ২৯
শিরকের শ্রেণীবিভাগ ৩০

৩য় অধ্যায় ঃ আমাদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক

মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শিরক ৩১
জন্মগতভাবে মুসলিম ৩৩
কবর এবং মাযারকে ঘিরে নানারকম শিরক ৩৪
মাযার এবং মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক ৩৯
পীর বা কোন ওলীর কাছে কিছু চাওয়া শিরক ৪১
বিশ্বজাহান সৃষ্টির পর আল্লাহ বিশ্রাম নিয়েছেন এই আকীদা শিরক ৪৩
আল্লাহ নিরাকার এই আকীদা শিরক ৪৩
আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই আকীদা শিরক ৪৫
কিছু থেকে কিছু হয় না সব কিছু আল্লাহ থেকে হয় এই আকীদা শিরক ৪৫
আলী (রা.) এবং হোসাইন (রা.)-কে ঘিরে শিরক ৪৬
ওমর (রা.)-কে নিয়ে শিরক ৪৭
মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-কে ঘিরে নানারকম শিরক ৪৮
কারো মাধ্যমে দু'আ করা শিরক ৫৩
হাজ্জ করতে গিয়ে নানারকম শিরক ৫৬

কাবা নিয়ে নানারকম শিরক ৫৭
পীরের অনুমতি ছাড়া ফরয হাজ্জ পালন না করা শিরক ৫৮
আরাফা নিয়ে মিথ্যা গল্প এবং শিরকী আকীদা ৫৮
গরম মাযারের রহস্য এবং শিরক (শাহ পরাণ ও শাহ জালাল রহ.) ৫৮
গুলিস্তানে গোলাপ শাহর মাযার এবং শিরক ৬০
বায়েজীদ বোস্তামীর শিরকী আকীদা ৬০
হায়দার বাবার রহস্য এবং শিরক ৬১
চুলের জট, চটের বস্তা, শিকল-এর রহস্য এবং শিরক ৬২
উয়াইস করনীর দাঁত ভাঙ্গার গল্প এবং শিরক ৬৩
ফানাফিল্লাহর রহস্য এবং শিরক ৬৪
মনসুর হাল্লাযের আল্লাহ দাবী এবং শিরক ৬৪
খিজীর (আ.)-এর ঘটনা ৬৫
পীরের গোসল শরীফের মাধ্যমে শিরক ৬৬
লেংটা বাবা ও শিরকী কর্ম-কান্ড ৬৬
মাথা ঠেকানোর শিরক ৬৭
তামা, দস্তা, বা লোহার চুড়ি এবং আংটি পড়া শিরক ৬৮
তাবিজ ও কবজ বাঁধার শিরক ৬৯
কুরআনীয় তাবিজ-কবজ শিরক ৭০
সোলায়মানী তাবিজের কিতাব থেকে শিরক ৭২
শিরকীয় ঝাড়-ফুঁক থেকে সাবধানতা ৭৩
ভাগ্য গণনা করা শিরক ৭৪
রাশিচক্রে বিশ্বাস করা শিরক ৭৫
মানত মানায় শিরক ৭৬
গান, কবিতা, গল্প, নাটক, সিনেমা ও কালচারের নামে নানারকম শিরক ৭৭
পহেলা বৈশাখ ও শিরকের সঠিক ধারণা ৭৯
লালন ফকিরের ধর্মীয় মতবাদ ৮১
দেয়ালে কারো ছবি টাঙানো এবং ঘরে মূর্তি রাখা শিরক ৮১
প্রাণীর ছবি আঁকা এবং ভাস্কর্য বানানো শিরক ৮১
জ্বীন জাতীর রহস্য এবং শিরক ৮২
পালা গানের মাধ্যমে শিরকের প্রচার ৮২
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শিরকী প্রতারণা ৮৩
পাকিস্তানী পীর এবং বিদেশী শিরক ৮৪
নানারকম ভুল ধারণার মাধ্যমে শিরক ৮৪
কথা এবং চিন্তার মধ্যে শিরক ৮৫
শিশুর কপালে কালো টিপের রহস্য ৮৬

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে ঘিরে নানারকম শিরক ৮৭
মুহাম্মাদ ﷺ নূরের তৈরী ছিলেন না, তিনি মরণশীল মানুষ ছিলেন ৯৫
শিরকের উপর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তার বিশ্লেষণ ১০০
ইউটিউবে নানা পীরের শিরকী ওয়াজ থেকে সাবধানতা ১০১
তালাশ, ক্রাইম ওয়াচ ও একুশের চোখে শিরকের শিক্ষা ১০১
লাল শালু উপন্যাসের মাধ্যমে শিরকের শিক্ষা ১০২
কুসংস্কারে বিশ্বাস করা এবং শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলা শিরক ১০৩

৪র্থ অধ্যায় ঃ সুন্নাত ও বিদ'আত

সুন্নাহ কী? ১১৪
আমরা রসূল ﷺ -কে কতটুকু ভালবাসি? ১১৫
বিদ'আত কী? ১১৭
বিদ'আত কিভাবে চালু হয়? ১১৯
বিদ'আত প্রচলিত হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক কারণ ১২০
বিদ'আত সমর্থনে পীর-ওলীর দোহাই ১২০
বিদ'আতের তিনটি মৌলিক নীতিমালা ১২১
বিদ'আতীর পরিণাম ১২৮
বিদ'আত কবীরা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক! ১৩০
বিদ'আতে "হাসানা" এবং বিদ'আতে "সাইয়েআ" বলতে কিছু নেই ১৩১

৫ম অধ্যায় ঃ আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ

'শবে বরাত' ও 'শবে মিরাজ' পালন করা বিদ'আত ১৩৪
ঈদে মিলাদুন্নবী পালন বিদ'আত ১৩৫
মিলাদ পড়া সুস্পষ্ট বিদ'আত ১৩৭
মুখে উচ্চারণ করে সলাতের নিয়্যত করা বিদ'আত ১৩৮
কাযা এবং উমরী কাযা সলাত বিদ'আত ১৩৮
সলাত শেষে ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে মুনাজাত করা বিদ'আত ১৪০
মহররমের মেলা বিদ'আত ১৪৩
পানি পড়া, তেল পড়া ও সুতা পড়া বিদ'আত ১৪৩
চাল পড়া ও বাটি চালান বিদ'আত ১৪৪
স্বপ্ন দেখা নিয়ে বিদ'আত ১৪৫
নানারকম ভিত্তিহীন খতমের হাত থেকে আত্মরক্ষা ১৪৮
একটি বিদ'আত পরিবর্তন হয়ে নতুন বিদ'আত! ১৪৮
কিছু দু'আ বা ঘটনা কপি করে বিতরণ করার রহস্য ১৪৯
ফাতিমা নামের ফযীলতে জান্নাত! ১৪৯
অন্য কারো মাধ্যমে রসূল ﷺ -এর কবরে সালাম পাঠানো বিদ'আত ১৫০
হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে সতর্কতা ১৫০

হাজ্জে গিয়ে মদীনায় ৪০ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা বিদ'আত ১৫১
হাজ্জ করতে গিয়ে একের অধিক উমরাহ করা বিদ'আত ১৫১
কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো বিদ'আত ১৫৩
খোদা হাফেয থেকে আল্লাহ হাফেয উভয়ই বিদ'আত ১৫৩
সম্রাট আকবরের নতুন ধর্ম 'দ্বীনে ইলাহী' বিদ'আত ১৫৪
আমাদের সমাজে প্রচলিত আরো কিছু বিদ'আত ১৫৪

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়

ইসালে ছাওয়াব কী? ১৬৮
ইসালে সওয়াবের প্রচলিত ভুল পদ্ধতিসমূহ ১৬৮
ইসালে সওয়াবের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো কুরআন হাদীস সম্মত নয় ১৭১
কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় ১৭২
ইসালে সওয়াবের জন্য কী করা যেতে পারে? ১৭৪
মাতা-পিতার মৃত্যুর পর করণীয় ১৭৬
সুশীল সমাজে লাশ দাফন নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি ১৮০
মৃতদের নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর ১৮১

৭ম অধ্যায় ঃ কাউকে অন্ধ অনুসরণ করা ইসলামে নিষেধ

অন্ধ অনুসরণ বা তাকলীদ করা কেন নিষেধ ১৮৩
পিতৃ পুরুষের আচরণের অন্ধ অনুসরণ বৈধ নয় ১৮৩
মাযহাব মানা কি ফরয? ১৮৫
হানাফী মাযহাব সংক্রান্ত জটিলতা ১৮৬
সহীহ হাদীসের সাথে হানাফী মাযহাবের এতো পার্থক্য কেন হলো? ১৮৮
হাদীস সম্বন্ধে চার মাযহাবের চার ইমামের বক্তব্য ১৮৯
জাল ও দুর্বল (মওজু ও যঈফ) হাদীস থেকে সাবধানতা অবলম্বন ১৯২
আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু জাল হাদীস ১৯৪
আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল তথ্য ১৯৬
ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা অবলম্বন ২০২
কেরামত ও মজাদার গল্প-কাহিনী হতে সাবধানতা ২০৩
ইবলিস শয়তানের পলিসি থেকে সাবধানতা ২০৩
বাজারে ভিত্তিহীন দু'আ-দুরূদ ও কিচ্ছা কাহিনীর বই-পত্র ২০৪
তাবলীগ নিয়ে কিছু প্রশ্ন এবং পরিষ্কার ধারণা ২০৭

৮ম অধ্যায় ঃ তরিকত

প্রথমেই কিছু প্রশ্ন ২২৪
চার তরিকার রহস্য ২২৭
তরিকার উৎপত্তি কোথা হতে? ২২৯

কুরআন হাদীসের বাইরে এত তরিকা কেন? ২৩০
পীর শব্দের তাৎপর্য ২৩২
হাক্কানী পীর বলতে কিছু নেই ২৩৩
দ্বীনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন ওলী নেই? ২৩৩
আউলিয়া মনোনীত করার জন্য কাউকে অনুমতি দেয়া হয়নি ২৩৬
তাসাউফ শিক্ষা করা কি ফরয? ২৩৭
পীর ধরা কি ফরয? ২৩৭
'ওসীলা' হওয়ার দাবী ভিত্তিহীন! ২৩৯
তরিকতের যিকরের রহস্য ২৪১
সত্যিকার যিকর বলতে আল্লাহ কি বুঝিয়েছেন? ২৪৪
আল্লাহর রসূল ﷺ -এর দুরূদ এবং পীরসাহেবদের বানানো দুরূদ ২৪৬
পীরসাহেবদের দাবী তারা রসূল ﷺ -এর সাথে মিটিং করেন! ২৪৮
জেগে থাকা অবস্থায় রসূল ﷺ -এর দর্শন লাভ অসম্ভব ২৫০
শাফায়াত বা সুপারিশ সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশ কী? ২৫১
হাশরের মাঠে কে শাফায়াত করবেন? ২৫১
আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের খবর জানেন না ২৫৫
পীরসাহেবরা কুরআন-হাদীস পড়তে উৎসাহিত করেন না কেন? ২৫৮
জাহিরী ইল্‌ম ও বাতিনী ইল্‌ম কী ২৫৯

৯ম অধ্যায় ঃ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তার বিশ্লেষণ

সূফীজমের ভেতরে থেকে তার উপর গবেষণা ২৬১
প্রথম পীরসাহেবের উপর পর্যালোচনা ২৬২
দ্বিতীয় পীরসাহেবের উপর পর্যালোচনা ২৬৪

১০ম অধ্যায় ঃ তরিকতের ভাইদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি

ইসলামে সত্যিকার তাসাওউফ কী? ২৭০
ইসলামের সঠিক আধ্যাত্মবাদ কী? ২৭৩
আধ্যাত্মিকতার জন্য ইসলামের শিক্ষা-পদ্ধতি ২৭৫
কুরআন বুঝে পড়া জরুরী কেন? ২৭৭
মাতা-পিতার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাঠি ২৭৯
আখিরাতের ময়দানে পীরসাহেব মুরীদদের কোন কাজে আসবে না ২৮০
কুরআন-হাদীসের দলিল অনুযায়ী ভাল কাজের তালিকা ২৮৩
শেষ কথা ২৮৫

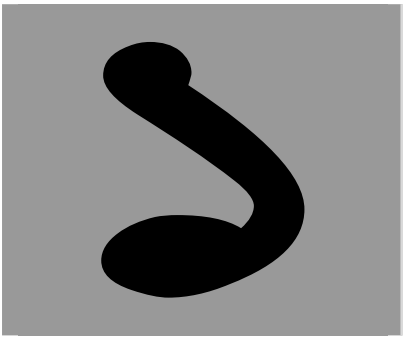

ইসলামী আকীদা
(Islamic Creed)

আকীদা কী?

"আকীদা", আরবী, একবচন। বহুবচন "আকাইদ"। মূল ধাতু "আক্‌দ"। ধাতুগত অর্থ হলো দু'টি বস্তুর মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করা, ধারণ করা, বাঁধন দৃঢ় করা, সম্পর্কযুক্ত করা। এই জন্যে বিয়ে এবং লেনদেনের সময় প্রণীত চুক্তিকে "আকদ" বলা হয়। যেহেতু কোন বিশ্বাসকে মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা হয় সেহেতু সেটাকে "আকীদা" বলা হয় অর্থাৎ বিশ্বাস যা অন্তরে বাঁধা আছে। "আকীদার" কিছু ব্যাখ্যা ঃ

"আকীদা" শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ঃ বিশ্বাসকে মনে এমনভাবে ধারণ করা যাতে এর মাঝে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। "আকীদা হলো এমন একটি বিষয়বস্তু এতটা শক্ত ও দৃঢ়ভাবে মনেপ্রাণে মেনে নেয়া যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।" মানুষ যাকে অন্তর দিয়ে পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও প্রশান্তি সহকারে গ্রহণ করে এবং যার প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় বা অন্বেষা থাকে না, তাই "আকীদা"। সুতরাং সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস আকীদার অন্তর্ভূক্ত নয়। প্রকৃত আকীদা সেটাই যাতে ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) প্রবল। অন্য কথায় আকীদার জন্যে ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) অপরিহার্য্য। এজন্যে আল কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, "সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই" (৫৩ ঃ ২৮) যেখানে সন্দেহ শেষ, সেখানেই আকীদা শুরু। সুতরাং আকীদা এমন এক বিশ্বাস যা সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। "আকীদা বলতে এমন বিষয় মনে আঁকড়িয়ে ধরা এবং জানা যে এটা অস্বীকার করা অপরাধ।" এই সংজ্ঞার মাধ্যমে বোঝা যায় যে ধর্মীয় আকীদায় একটা পবিত্রতা ও বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। মানুষের সমস্ত কাজকর্ম ও চলাফেরা তার চিন্তা ও কল্পনার ফল। আর যে কল্পনা পরিপক্ক, অনঢ় ও সন্দেহমুক্ত তাই আকীদা। মোটকথা আকীদা এমন ধারণা যাতে কোন

সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। ইসলামী পরিভাষায় আকীদার অপর নাম ঈমান। ঈমান এনেছে অর্থাৎ বিশ্বাস করেছে, এই বিশ্বাসে কোন সন্দেহ নেই।

আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, আকীদা হলো ইসলামের ভিত্তি ও মূল। আকীদা ব্যতীত ইসলামের কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান। তাই তাঁর জীবনবিধান মানতে হলে সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আকীদা হলো আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। কেননা আকীদা যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়। আল্লাহ বলেন ঃ কেউ ঈমান (ইসলাম) প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫) তৃতীয়ত, আখিরাতে নাজাত লাভের জন্যে আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা আমরা তাই বুঝতে পারি। চতুর্থত, যুগে যুগে নাবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল আকীদা। প্রত্যেক নাবী প্রথমে আকীদার দাওয়াত দিতেন। নাবী ﷺ এজন্যেই মক্কায় সর্বপ্রথম আকীদা সংশোধনের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। মুসলিম মাত্রই ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে সে মুসলিম এবং যে এর ব্যতিক্রম করে সে ইসলামের দৃষ্টিতে কাফির বা অবিশ্বাসী। আর মুখে যে ব্যক্তি ইসলামের কথা ঘোষণা করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করেনা, সেই ব্যক্তি হলো মুনাফিক। মুনাফিক কাফির হতেও নিকৃষ্টতর ও মারাত্মক। এই জন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে (সূরা নিসা ঃ ১৪৫)।

মানবজীবনে আকীদার প্রভাব ঃ আকীদা মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আকীদাপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী মানুষ সব সময়েই মনে করে যে এই দুনিয়াই তার জীবনের শেষ নয়। তার সামনে স্থায়ী জীবন তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ফলে জীবনে চলার পথে সে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনা। আকীদা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং জীবনযুদ্ধে তাকে আশাবাদী করে তোলে। কল্যাণকর কাজে সে অগ্রগামী হয়।

ইসলামী আকীদার উৎস ঃ ইসলামী আকীদার একমাত্র উৎস হলো আল-কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসসমূহ। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকীদার মূল বিষয় ছয়টি ঃ ১) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ২) ফিরিশতাগণের উপর

ঈমান ৩) আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান ৪) নাবী-রসূলগণের উপর ঈমান ৫) আখিরাত সম্পর্কে ঈমান ৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের বিষয়ে ঈমান ।

মানুষের আকীদা নষ্টকারী বিভিন্ন বিষয় ঃ মানবজীবনে বিভিন্ন বিষয় আছে যা তার আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে । তন্মধ্যে-

১) প্রচলিত আদত-অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা দুষ্কর;
২) ভুল তথ্য পরিবেশনও আকীদা বিনষ্ট করতে পারে;
৩) অসৎ সঙ্গের প্রভাবেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;
৪) পূর্বপুরুষদের ইসলাম পরিপন্থী ধ্যানধারণা অনুসারে চললে;
৫) কোন কোন মানুষ স্বভাবত সঠিক আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করতে অক্ষম;
৬) কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তির সাহচর্যে ও প্রভাবেও সঠিক আকীদা লোপ পেতে পারে;
৭) সঠিক আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তির অসদাচরণেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;
৮) ধারণা বা অনুমান নির্ভর আচরণেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;
৯) চুলচেরা বিশ্লেষণ বা খুঁটিনাটি ভুলত্রুটি অনুসন্ধানে অধিক আগ্রহ আকীদা নষ্ট করতে পারে;
১০) দ্বীনের ব্যাপারে বেশী বেশী প্রশ্ন এবং তর্ক-বিতর্কেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;
১১) আদর্শ ব্যক্তির ভুলের কারণেও তার অনুসারীদের আকীদা নষ্ট হতে পারে;
১২) কোন কোন সময় ভুল কথা বারবার প্রচারিত হলে মানুষ তা পরিত্যাগ করে সঠিক আকীদা গ্রহণে অক্ষম হয়;
১৩) মানুষের অন্তর নরম । তাই সে যখন শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে চলে তখন তার আকীদায় বিভ্রাট দেখা দিতে পারে;
১৪) অর্থনৈতিক সংকটেও আকীদা নষ্ট হতে পারে ।

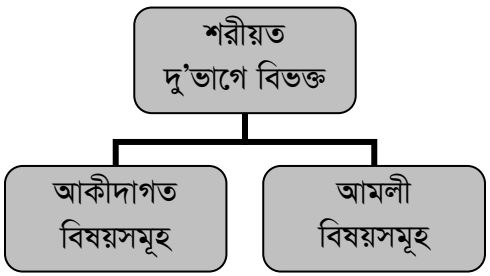

আকীদাগত বিষয়সমূহ ঃ আকীদাগত বিষয়সমূহ হল এমন যা কাজে রূপায়িত করার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় অর্থাৎ যার কোন বাহ্যিক কার্যরূপ নেই । যেমন এই

আকীদা পোষণ করা যে, আল্লাহ রব এবং তাঁর ইবাদত করা ওয়াজিব। একইভাবে ঈমানের উল্লেখিত বাকী রুকনগুলোর প্রতিও বিশ্বাস রাখা। এগুলোকে বলা হয় মৌলিক বিষয়।

আমলী বিষয়সমূহ ঃ আর আমলী বিষয়সমূহ হল এমন যা কার্যে পরিণত করা যায়, যেমন সলাত আদায়, যাকাত প্রদান, সাওম পালন ও যাবতীয় সকল আমলী বিধান। এগুলোকে বলা হয় আনুষঙ্গিক বিষয়। অতএব বিশুদ্ধ আকীদা হল এমন মৌলিক ভিত্তি যার উপর দ্বীন স্থাপিত এবং যা থাকলে আমল শুদ্ধ ও সহীহ হয়। আমল শিরক থেকে মুক্ত না হওয়া ব্যতীত কবুল হয় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই রসূলগণ সর্বপ্রথম আকীদা সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই তাঁরা সর্বপ্রথম স্ব-স্ব জাতির লোকদেরকে অন্য সব কিছুর ইবাদত ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার আহবান জানিয়েছিলেন।

নাবী ﷺ নবুওয়াতের পর তের বছর ধরে মানুষকে তাওহীদের প্রতি ও আকীদা সংশোধনের প্রতি আহবান জানাতে থাকলেন। কেননা আকীদাই হচ্ছে ঐ মৌলিক স্থাপনা যার উপর দ্বীনের ভিত্তি স্থাপিত। আর প্রত্যেক যুগেই দা'ঈ-ইলাল্লাহ (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) ও সংস্কারকগণ নাবী ও রসূলগণের সে আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা তাওহীদের প্রতি ও আকীদা সংশোধনের প্রতি আহবান করার মাধ্যমেই তাঁদের কাজ শুরু করেছিলেন। এরপর তাঁরা দ্বীনের অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের দিকে মনোনিবেশ করেন।

আকীদার উৎসগ্রন্থ এবং আকীদা বিষয়ক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলেমগণের নীতি

আকীদার জ্ঞান ওহী নির্ভর। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলিল বা প্রমাণ ছাড়া কোন আকীদা সাব্যস্ত করা যাবে না। আকীদার ক্ষেত্রে নিজস্ব রায়, অভিমত ও ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং আকীদার উৎস শুধুমাত্র আল কুরআন ও সুন্নাহয় যে তথ্য এসেছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এজন্যই এদেরকে অভিহিত করা হয়েছে "আল-ফিরকাহ আন নাজিয়াহ" অর্থাৎ বিজয়ী দল অথবা মুক্তিপ্রাপ্ত দল নামে। কেননা নাবী ﷺ তাদের পক্ষে নাজাতের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যখন উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে বলে তিনি খবর দিয়েছেন, যে দলগুলোর একটি ছাড়া বাকী সবগুলো দল জাহান্নামী হবে বলে তিনি জানিয়েছিলেন। আর যখন এ একটি দল সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি ও আমার সাহাবাগণ আজ যে

আদর্শের উপর রয়েছি যারা সে আদর্শের উপর রয়েছে তারাই হল সে মুক্তিপ্রাপ্ত বা নাজাতপ্রাপ্ত দল।" (আহমদ)

সঠিক আকীদা থেকে বিচ্যুতির কারণ এবং তা থেকে বাঁচার পন্থাসমূহ

বিশুদ্ধ আকীদা থেকে বিচ্যুত হওয়া ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ। কেননা বিশুদ্ধ আকীদাই কল্যাণকর আমল করার শক্তিশালী প্রেরণাদায়ক উপাদান। বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া যে কোন ব্যক্তি ধারণা-কল্পনা ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যেতে পারে, যা অতি সহজেই তার মন মস্তিষ্কে দানা বেঁধে সুখী জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ থেকে তাকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে। ফলে তার জীবন হয়ে পড়বে সঙ্গীন ও সংকীর্ণ। সহীহ আকীদা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেগুলো জানা অপরিহার্য। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সহীহ আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতা। আর এ অজ্ঞতার কারণ হচ্ছে সহীহ আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করা, ফলে তরুণ প্রজন্ম বড় হচ্ছে জ্ঞানহীন মূর্খ অবস্থায়, তারা মিথ্যাকে সত্য ভাবছে আর সত্যকে ভাবছে মিথ্যা।

২. পূর্বপুরুষের মতাদর্শ ঃ বাপ-দাদা তথা পূর্বপুরুষগণ যে মতাদর্শের উপর ছিলেন সে ব্যাপারে গোঁড়ামী প্রদর্শন এবং ভুল হওয়া সত্ত্বেও কঠোরভাবে তা আঁকড়ে থাকা। অতীতে মক্কার কুরাইশরা পূর্বপুরুসের দোহাই দিয়ে ভুল পথে চলতে দ্বিধা করেনি এবং আজকের দুনিয়াতে অনেক মানুষ একই যুক্তি দেখিয়ে নিজেদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

"যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো। তারা বলে, আমরা তো অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের পূর্ববর্তী পুরুষদেরকে আমরা পেয়েছিলাম। (তারা কি এমনই করবে?) যদিও তাদের পূর্ববর্তী পুরুষগণ কিছুই উপলব্ধি করতো না এবং সুপথ পেত না।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৭০)

৩. মানুষের অন্ধ অনুসরণ ঃ দলিল প্রমাণ ছাড়াই আকীদার ক্ষেত্রে মানুষের বক্তব্য অন্ধভাবে মেনে নেয়া। যেমনটি বাস্তবে লক্ষ্য করা যায় জাহ্মিয়া, মু'তাযিলা, আশ্আরীয়া, সূফীয়া প্রমুখ সত্যবিরোধী দলসমূহের ক্ষেত্রে। কেননা তারা তাদের পূর্ববর্তী ভ্রষ্ট ইমাম ও নেতৃবৃন্দের অন্ধ অনুকরণ করেছে। ফলে তারা বিশুদ্ধ আকীদা থেকে বিভ্রান্ত এবং বিচ্যুত হয়ে গেছে।

৪. অলী-আওলিয়াদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ঃ তাদেরকে তাদের যোগ্য মর্যাদার চাইতে অনেক উপরে স্থান দেয়া এবং তাদের ব্যাপারে এ আকীদা পোষণ করা যে, তারা কল্যাণ সাধন অথবা অকল্যাণ রোধ করতে পারেন, তারা দু'আ কবুলের মাধ্যম, তাই তাদের মাযারসমূহে পশু যবেহ করা, মানত করা, তাদের কাছে দু'আ করা, আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে নৈকট্য ও সওয়াব অর্জন করা যায় বলে বিশ্বাস করা। অথচ কেবলমাত্র আল্লাহই আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম।

৫. আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করা ঃ আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা থেকে সরে যাওয়া; যার ফলে তাদের ধারণা হয় যে, এসব কিছু একমাত্র মানুষেরই সামর্থের ফসল। ফলে তারা মানুষকে অতি মাত্রায় সম্মান দিতে থাকে এবং এ সকল অর্জন শুধু মানুষের পরিশ্রম ও আবিষ্কারের ফসল মনে করতে থাকে।

৬. পারিবারিক দ্বীনি শিক্ষার অভাব ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারগুলো সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত থাকে। নাবী ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদি অথবা নাসারা কিংবা মাজুসি তথা অগ্নিউপাসকে পরিণত করে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সুতরাং শিশুর ঝোঁক, প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নে বাবা-মায়ের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

৭. ত্রুটিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা ঃ ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমগুলো তাদের দায়িত্ব আদায় থেকে দূরে থেকেছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারিক্যুলাম ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যাপারটিকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। অথবা তার প্রতি আদৌ কোন গুরুত্বই থাকে না। আর অডিও-ভিজুয়াল ও স্টাডি উপযোগী প্রচারমাধ্যমসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বংস ও অধঃপতনের উপকরণে পরিণত হয়েছে। অথবা এগুলো শুধুমাত্র বৈষয়িক ও আনন্দ-উল্লাসের ব্যাপারেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সে সব বিষয়ে কোনই গুরুত্ব প্রদান করে না যা নৈতিকতা ও চরিত্রকে মূল্য দিয়ে থাকে এবং সহীহ আকীদার বীজ বপন করে; ফলে এদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক প্রজন্ম যারা নাস্তিক্যবাদের সামনে জ্ঞানহীন, সে লোকদের প্রতিরোধ করার মত সামর্থ

তাদের কাছে আর অবশিষ্ট নেই। এ অধঃপতনের ও ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার উপায়সমূহকে নিম্নে এভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক) কুরআন ও সুন্নাহের দিকে ফিরে আসা; যাতে এ উভয় উৎস থেকে সহীহ আকীদা অর্জন করা যায় যেমনিভাবে সালাফে-সালেহ তথা পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ উৎসদ্বয় হতে তাদের আকীদা আহরণ করতেন। আর এ উম্মতের সর্বশেষ লোকদেরকে সংশোধন শুধুমাত্র সেই বস্তুই করতে পারে যা উম্মতের প্রথম অংশকে সংশোধন করেছিল। এর পাশাপাশি জানা থাকতে হবে বিভ্রান্ত দলসমূহের আকীদা এবং তাদের সংশয়সমূহ, যেন তাদের সে সংশয়গুলো সংশোধন করা যায় এবং এ সকল দল সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা যায়। কেননা যারা অনিষ্ট সম্পর্কে জানে না তারা সে অনিষ্টে পতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

খ) শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে সহীহ আকীদা তথা সালাফে-সালেহীনের বিশুদ্ধ আকীদা পড়ানোর প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা, শিক্ষাক্রমের মধ্যে আকীদা বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাঠদানের সময় বাড়ানো এবং এ পরীক্ষা পাশের জন্য এ বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া।

গ) সালাফে-সালেহীনের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ সিলেবাসভুক্ত করা এবং সূফীয়া, বিদ'আতী, জাহ্‌মিয়া, মু'তাযিলা, আশ'আরিয়া ও মাতুরিদিয়াহসহ আরো যে সব বিভ্রান্ত দলসমূহ রয়েছে তাদের গ্রন্থসমূহ সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া। অবশ্য এ দলসমূহ সম্পর্কে শুধু এজন্য জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে যাতে তাদের মধ্যে যে ভুল আকীদা রয়েছে তার জবাব দেয়া যায় এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক করা যায়।

ঘ) এমন এক দল সংস্কারক দা'ই ইলাল্লাহ তৈরী হওয়া যারা মানুষের জন্য সালাফ তথা পূর্ববর্তী আলেমদের আকীদাকে নবায়ন করবে এবং সে আকীদা থেকে যারা বিচ্যুত হয়েছে তাদের বিভ্রান্তি সংশোধন করবে।

তাওহীদ ও শিরক এবং
সুন্নাত ও বিদ'আত

ইসলামের সব নিয়ম-কানুন চর্চা করলেও কোন মুসলিম যদি তাওহীদের মূল সূত্রাবলী না বুঝেন অথবা না মানেন তবে তার ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে না। তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে বহু মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত শরীয়াহ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নাত ও বিদ'আত এই চারটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকটি মুসলিমের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিরক তাওহীদের বিপরীত (Negation) আর বিদ'আত সুন্নাতের বিপরীত। শিরক হলো আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা। আর বিদআত হলো রসূল ﷺ -এর সুন্নাহর বিপরীত কোন আমল করা অথবা সুন্নাহয় নেই এমন কাজ সওয়াবের কাজ হিসেবে করা।

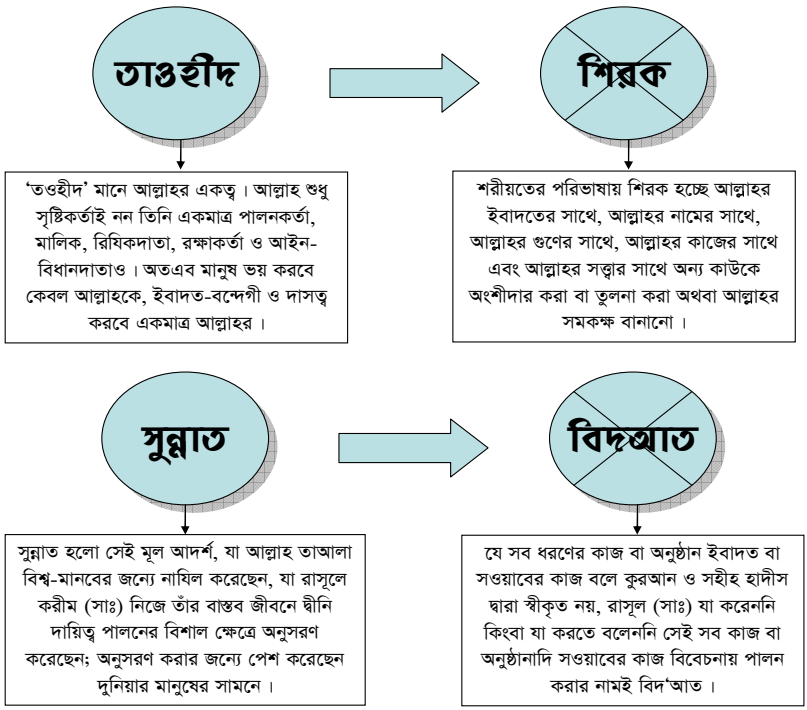

২

তাওহীদ ও শিরক
(Monotheism)

তাওহীদ কী?

'তাওহীদ' মানে আল্লাহর নির্ভেজাল একত্ব (Monotheism)। আল্লাহর এ একত্ব সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাত্মক। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন তিনি একদিকে যেমন একমাত্র পালনকর্তা, মালিক, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা ও আইন-বিধানদাতা তেমনি একমাত্র ইলাহ (ইবাদতের যোগ্য) ও উপাস্যও বটে। অতএব মানুষ ভয় করবে কেবল আল্লাহকে, ইবাদত-বন্দেগী ও দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহর।

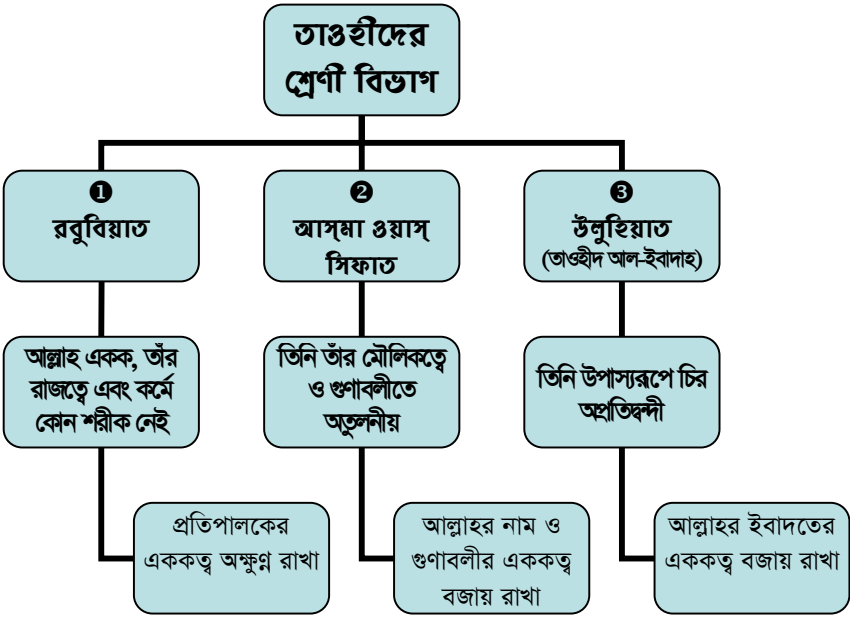

রবুবিয়াত

এই শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী আল্লাহই হচ্ছেন আমাদের রব (সৃষ্টিকর্তা), একমাত্র সত্যিকার শক্তি, তিনিই সকল বস্তুর চলাফেরা ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যেটুকু ঘটনা ঘটতে দেন সেটুকু ব্যতীত সৃষ্টি জগতে কিছুই ঘটে না। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি স্বরূপ মুহাম্মাদ ﷺ প্রায়ই "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই) বলে উক্তি করতেন। কুরআনে বহু জায়গায় রবুবিয়াহ আকীদার ভিত্তি পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলছেন ঃ

- *"আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা।" (সূরা আয-যুমার ঃ ৬২)*
- *"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।" (সূরা আস-সফফাত ঃ ৯৬)*
- *"আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১১)*

আসমা ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলী) ঃ এই শ্রেণীর কয়েকটি রূপ আছে ঃ

১) **আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব** ঃ কুরআনে ও হাদীসে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না।

২) **আল্লাহকে কখনো তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী দেয়া যাবে না** ঃ মানুষের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, আল্লাহ বিশ্রামের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। কিন্তু বাইবেল ও তাওরাতে দাবি করা হয় যে আল্লাহ ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং তারপর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন। এই কারণে ঈহুদিগণ শনিবারকে এবং খ্রীষ্টানগণ রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসেবে নেয় এবং ঐদিনে কাজ করাকে পাপ বলে মনে করে। এই ধরনের দাবি স্রষ্টার উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করে। [*আসমানসমুহ ও পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহকে ক্লান্ত করে না– সূরা বাকারা ২ ঃ ২৫৫*]

৩) **মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী আরোপ না করা** ঃ আমাদের সমাজে পীর আওলীয়াগণকে আল্লাহর ক্ষমতায় গুণান্বিত করা হয় যেমন ঃ তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, গায়েব জানেন, মৃতকে জীবিত করতে

পারেন, মানুষের ভাল-মন্দ করতে পারেন, গুনাহগারকে জান্নাতে পার করে দেবেন, কবরের আজাব মুক্ত করে দেবেন, নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারেন, বোবাকে কথা বলাতে পারেন, রিযিক বাড়িয়ে দিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি ।

৪) **আল্লাহর সিফাতী নামে কাউকে না ডাকা** ঃ যেমন ঃ "আর-রউফ" (যিনি সবচেয়ে সমবেদনায় ভরপুর) এবং "আর-রহীম" (সবচেয়ে দয়ালু), এই ধরনের নাম আল্লাহর পূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য । এই ধরনের নাম মানুষের ক্ষেত্রে তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন তার নামের আগে "আব্দ" শব্দটি ব্যবহার করা হবে, যেমন -- আব্দুর রউফ, আব্দুর রহীম, আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি ।

তেমনিভাবে আব্দুর রসূল (রসূলের গোলাম), আব্দুন নাবী (নাবীর গোলাম), আব্দুল হোসাইন (হোসাইনের গোলাম) ইত্যাদি নামগুলো নিষিদ্ধ । কারণ এখানে মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের গোলাম হিসেবে ঘোষণা করছে । একইভাবে গোলাম মুস্তফা, গোলাম মুহাম্মাদ, গোলাম নাবী, গোলাম রসূল, নুরুল্লাহ, হায়াতুন্নবী ইত্যাদি নামে কাউকে ডাকা যাবে না ।

উলুহিয়াত

'উলুহিয়াত' মানে ইবাদত । এর মর্ম হলো ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য করা, অন্য কারো জন্য নয় । মক্কাবাসীদের তাওহীদ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি তারা অন্যকিছুর উপাসনা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে কাফির (নাস্তিক) এবং মুশরিক (পৌত্তলিক) হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন । অতএব সকল প্রকার ইবাদত করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে । সেজন্য মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে যে কোন ধরনের মধ্যস্থতাকারী, সুপারিশকারী অথবা যোগাযোগকারীর প্রয়োজন নেই ।

যে সূরা ফাতিহা আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে অন্ততঃপক্ষে ৩২ বার পড়ে থাকি, তার চতুর্থ আয়াতে আমরা বলি "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই" । এই আয়াতে পরিষ্কার বলা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে না । কিন্তু বাস্তবে আমরা করছি তার উল্টোটা । রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

"তুমি যদি ইবাদতে কিছু চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও এবং তুমি যদি সাহায্য চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও" । (আত-তিরমিযী)

তাওহীদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Tawheed)

By Way of Individual (Bipartitle)	By Way of Allah (Tripartite)
A) Affirmation & Recognition (By Heart) উপলব্ধি করা ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসস্থাপন করা (অন্তরে)	❶ Lordship OR Rubboobiya (By Heart) তাঁকে মালিক ও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনে নেয়া (অন্তরে)
	❷ Names & Attributes OR Asmaa' was-Sifaat তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জানা
B) Action & Deeds (By Limbs) কাজকর্মে তার প্রতিফলন (দৈহিক)	❸ Worship OR Uluuhiyyah (By Limbs) তাঁর ইবাদত করা (দৈহিক)

<u>উদাহরণ</u> ঃ তাওহীদের ক্ষেত্রে মাঝামাঝি কোন বিষয় নেই; আমি ৫০% মানি বা ৭০% মানি তা হবে না । আর এ ক্ষেত্রে মাঝামাঝি হচ্ছে সন্দেহ, ইসলামে সন্দেহের কোন স্থান নেই যা হবে তা হতে হবে ১০০% অর্থাৎ পুরোপুরি সত্য ।

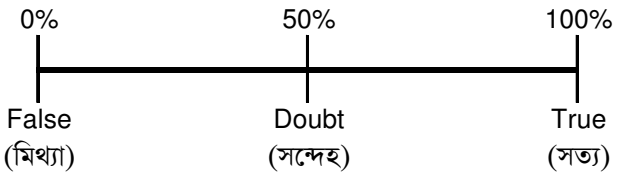

বাস্তব চিত্র

বাস্তবে আজ মুসলিম সমাজে আল্লাহকে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় বটে । কিন্তু কার্যত দেখা যায়, আল্লাহর উলুহিয়াতী (ইবাদত) তাওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু তাঁর রবুবিয়াতের (প্রভুত্ব) তাওহীদ স্বীকার করা হচ্ছে না । মুখে স্বীকার করলেও বাস্তবে রব হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে আরো অনেক শক্তিকে । আর এটাই হচ্ছে শিরক ।

শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে-ই রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভাবশালী, কর্তৃত্বসম্পন্ন, বিশ্বব্যবস্থাপক এবং রব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই মৃত 'বুযুর্গ' (?) লোকদের নিকট প্রার্থনা করে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরই ভয় করে চলে, তাদেরই নিকট থেকে কোনো কিছু পেতে আশা পোষণ করে। বিপদে পড়লে তাদের নিকটই নিস্কৃতি চায়, তাদের নিকট থেকেই চায় উন্নতি লাভ করতে। মনে করে ঃ এরা অলৌকিকভাবে মানুষের দু'আ শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, ফায়েজ দিতে পারে। ভালমন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাদের সন্তোষ কামনা করে। আর তাদের সন্তোষ বিধানের জন্যেই তাদের উদ্দেশ্যে মানত মানে, পশু জবাই করে, মরার পর তাঁদের কবরের ওপর সিজদায় মাথা লুটিয়ে দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্যে ব্যয় করা কর্তব্য মনে করে। আর এসব কারণেই দেখা যায়, এ শ্রেণীর লোকদের কবরকে নানাভাবে সম্মান ও ভক্তি করা হচ্ছে, বহু অর্থ খরচ করে কবরের ওপর পাকা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর সফর করা হয়। এক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চারিদিক থেকে তাদের ভক্তেরা এসে জমায়েত হয়। ঠিক যেমন মুশরিক জাতিগুলো গমন করে তাদের ধর্মীয় তীর্থভূমিতে।

ইসলামে তাওহীদী আকীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট দু'আ (প্রার্থনা) করা বা আর কাউকে সম্বোধন করে দু'আ করা সুস্পষ্ট শিরক। ইসলামে তা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। কোন কিছুর মধ্যে শিরকের গন্ধ থাকলে সেই ইবাদত কবুল হবে না। কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হলো ঃ

- *"আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে ডাকছো তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়। বরং নিজের সাহায্যেও অক্ষম।" (সূরা আরাফ ঃ ১৯৭)*

- *"কোনো দুঃখ বা বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহর মর্জীতেই হয়েছে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান।" (সূরা আল আনআম ঃ ১৭)*

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

- *"আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৭)*

- *"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই নিকট দু'আ কর, তাদের কেউই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। তা সত্ত্বেও যদি তোমরা তাদেরই ডাক, তাদের নিকটই দু'আ কর, তবে [জেনে রাখ যে] তারা তো তোমাদের ডাক শুনতেও পায় না।" (সূরা ফাতির ঃ ১৩-১৪)*

- *"আর তারা তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা নিজেদের অপকার অথবা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না, এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।" (সূরা ফুরকান ঃ ৩)*

- *"তুমি অন্য কোন প্রভুকে আল্লাহর সংগে ডাকবে না, ডাকলে তুমি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও।" (সূরা শুআ'রা ঃ ২১৩, ২১৪)*

শিরক কী?

শিরক হলো অংশীদারিত্ব; শরীক হলো অংশীদার ঃ ইসলামী পরিভাষায় শিরক হচ্ছে আল্লাহর নামের সাথে, আল্লাহর গুণের সাথে, আল্লাহর কাজের সাথে, আল্লাহর সত্ত্বার সাথে অথবা আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা, তুলনা করা অথবা আল্লাহর সমকক্ষ বানানো। আল্লাহ বলেন ঃ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিল মুল্‌ক (সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। সূরা ফুরকান ঃ ২)

শিরকের সহজ সংজ্ঞা ঃ স্রষ্টার বিন্দু পরিমান অথবা সামান্য পরিমান ক্ষমতা তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দিলেই তা হবে সুস্পষ্ট শিরক। যেমন ঃ আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের স্রষ্টা, আর দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা হচ্ছে তার সৃষ্টি যেমন, পীর, আউলিয়া, কবর, মাযার, গাছ, কচ্ছপ, কুমির, পাথর, তাবিজ, কুরআন ইত্যাদি।

এখন কেউ যদি বিশ্বাস করে যে পীর বা আউলিয়ার ক্ষমতা আছে মুরীদের ভাল বা মন্দ করার তাহলেই এখানে আল্লাহর ক্ষমতা পীর বা আউলিয়াকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং সুস্পষ্ট শিরক হচ্ছে। কেউ যদি মনে করে যে বায়েজীদ বোস্তামী মাজারে গাছে সুতা বাঁধলে বা কচ্ছপকে খাওয়ালে বা মনোবাসনা পূর্ণ হবে! এখানে গাছ এবং কচ্ছপকে আল্লাহর ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে বলে সুস্পষ্ট শিরক হবে। আবার কেউ যদি মনে করে যে কোন মাযারে গেলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে তাহলে সেখানে আল্লাহর ক্ষমতা ঐ মাযারকে দেয়া হচ্ছে তাই শিরক হবে। আবার কেউ যদি কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলায় তাহলেও শিরক হবে, কারণ এখানে আল্লাহর ক্ষমতা তাবিজের মধ্যে দেয়া হচ্ছে। (রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবী (রা.) কখনও কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ বানিয়ে ব্যবহার করেন নি, বরং কুরআনের আয়াত দিয়ে রুকইয়া বা ঝাঁড়ফুক করেছেন।)

শিরকের সূচনা ঃ নূহ (আ.)-এর যুগ থেকে শিরকের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। আবদা, শুয়াইয়া, গুছিয়া, উকো, নাসার নামের পাঁচজন সৎ ব্যক্তির প্রতি তাদের অতি ভক্তি থেকে সর্বপ্রথম শিরকের সূচনা হয়েছে। তৎকালীন ভক্তরা তাদের জীবিত অবস্থায় যেমন শ্রদ্ধা করতো ঠিক তাদের মৃত্যুর পর কিভাবে শ্রদ্ধা করবে তা নিয়ে চিন্তায় পরে গেল। তখন শয়তান সুযোগ পেয়ে গেল। সে তাদেরকে পরামর্শ দিল যে তাদের স্মৃতিকে জাগ্রত রাখার জন্য ছবি বা মূর্তি তৈরী করো। তখনো কিন্তু পূজা শুরু হয়নি। পরবর্তী জেনারেশন দেখলো যে আমাদের বাপ-দাদারা এসব ছবি বা মূর্তি শ্রদ্ধা করতো, তারপর শয়তানের পরামর্শে তারা এই ৫ সৎ ব্যক্তির ছবি ও মূর্তির পূজা শুরু করলো। এভাবেই শয়তান মানুষের মাঝে মূর্তিপূজা চালু করলো।

শিরক-এর পরিণাম জাহান্নাম

মহান আল্লাহ বলেন

- *আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে। (সূরা নিসা ঃ ৪৮, ১১৬)*
- *নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। এবং তার অবস্থান জাহান্নাম। অত্যাচারী যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা ঃ ৭২)*

- *হে মুহাম্মাদ], তুমি ঘোষণা করে দাও, আমি আমার রবকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না। (সূরা জ্বিন ঃ ২০)*
- *অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাত লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে যেন নিষ্ঠার সাথে সৎকর্ম সম্পাদন করতে থাকে, আর তার রবের দাসত্ব, ইবাদত-বন্দেগীতে যেন অপর কাউকেও শরীক না করে। (সূরা কাহাফ ঃ ১১০)*
- *তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও ইবাদত করো। আর অন্য কোনো কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করো না। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)*
- *যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ডাকে। তার সমর্থনে তার হাতে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। তার হিসাব-নিকাশ হবে আল্লাহর নিকট। এ ধরনের কাফিররা কিছুতেই কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারে না। (সূরা মু'মিনুন ঃ ১১৭)*

রসূল ﷺ বলেছেন

- আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করার অবস্থায় যদি কারোর মৃত্যু হয় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী)
- যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে শিরক করে না, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে তাঁর সাথে শিরক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে যাবে। (সহীহ মুসলিম)

শিরক আল-আকবর (বড় শিরক)

বড় শিরক যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। বড় শিরকে লিপ্ত হলে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়। বড় শিরক তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হবে না। বড় শিরক চার প্রকার।

(ক) দু'আ ও প্রার্থনায় শিরক ঃ যেমন, মাযার ও পীরের নিকট কিছু চাওয়া।
(খ) নিয়ত, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে শিরক ঃ যেমন, পীর-আউলিয়ার উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করা।
(গ) আনুগত্যে শিরক ঃ যেমন, কোন পীরের ইচ্ছানুযায়ী হালালকে হারাম করা বা হারামকে হালাল করা।
(ঘ) ভালবাসায় শিরক ঃ যেমন, আল্লাহর মতো পীর-আউলিয়াকেও ভালবাসা।

যে সব মুসলিম রসূল ﷺ -এর কাছে প্রার্থনা করে অথবা মাযারের কাছে প্রার্থনা করে এই বিশ্বাসে যে, এরা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন, সেই সব মুসলিম এই ধরনের শিরক আল-আকবর করে। প্রার্থনা করতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে। প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পারি ঃ সূরা আল-আন'আম ঃ ৪০-৪১, সূরা আল-আ'রাফ ঃ ২৯, সূরা ইউনুস ঃ ১০৬, সূরা আর-রা'দ ঃ ১৪, সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৮, সূরা আল-মু'মিন ঃ ১৪ ।

শিরক আল-আসগর (ছোট শিরক)

ছোট শিরক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, তবে তা কবীরা গুনাহ। ছোট শিরক দুই প্রকার ।

(ক) প্রকাশ্য ঃ কথার মাধ্যমে প্রকাশ্য ছোট শিরক যেমন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা অথবা এমন বলা - আল্লাহ যা চায় এবং আপনি যা চান অথবা এমন বলা - আপনি না থাকলে উপকৃত হতাম না ইত্যাদি। কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ্য ছোট শিরক যেমন ঃ তাবিজ, সুতা, পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করা, ভাগ্য পরীক্ষা করা, বিভিন্ন কুলক্ষণ নির্ধারণ করা ইত্যাদি ।

(খ) গোপন ঃ গোপন শিরক হলো নিয়ত, সংকল্প, উদ্দেশ্য ইত্যাদির শিরক। রসূল ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল ছোট শিরক। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন "ইয়া আল্লাহর রসূল, ছোট শিরক কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "আর-রিয়া"– লোক দেখানো বা জাহির করা, কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, "দুনিয়ার জগতে যাদের কাছে তুমি নিজেকে জাহির করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং দেখ তাদের নিকট হতে কোন পুরষ্কার পাও কি না।" (আহমদ)

এছাড়া আল্লাহর নির্দেশ অবজ্ঞা করে নিজের নফসের কথা মতো পুরোপুরি চলাও শিরক, কারণ এখানে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে নিজের নফসের কথা মতো কাজ করা হচ্ছে। আবার যদি কেউ কোন বস্তু বা মানুষের প্রতি ভালবাসাকে এত গুরুত্ব দেয় যে সেটা তার এবং আল্লাহর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে যেন সে ঐ বস্তু অথবা ব্যক্তিরই উপাসনা করলো। এভাবে ধনদৌলত, কামনা-বাসনাও তার আরাধ্য দেবতা হয়ে যেতে পারে। রসূল ﷺ বলেছেন, "দিরহামের (টাকা-পয়সার) পূজারীরা সব সময়ই দুর্দশাগ্রস্ত থাকবে"। (সহীহ বুখারী) এবং আল্লাহ বলেন ঃ *"তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করে?" (সূরা ফুরকানঃ ৪৩)*

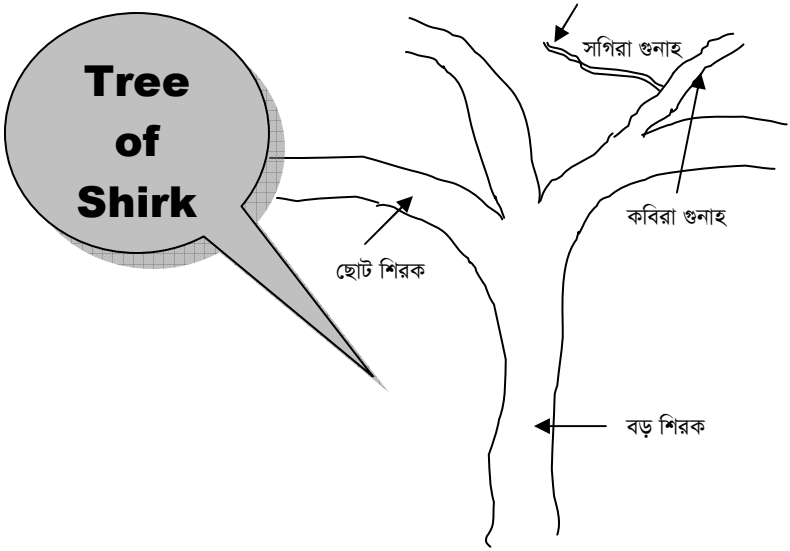
Tree
of
Shirk
সগিরা গুনাহ
কবিরা গুনাহ
ছোট শিরক
বড় শিরক

শিরকের শ্রেণীবিভাগ

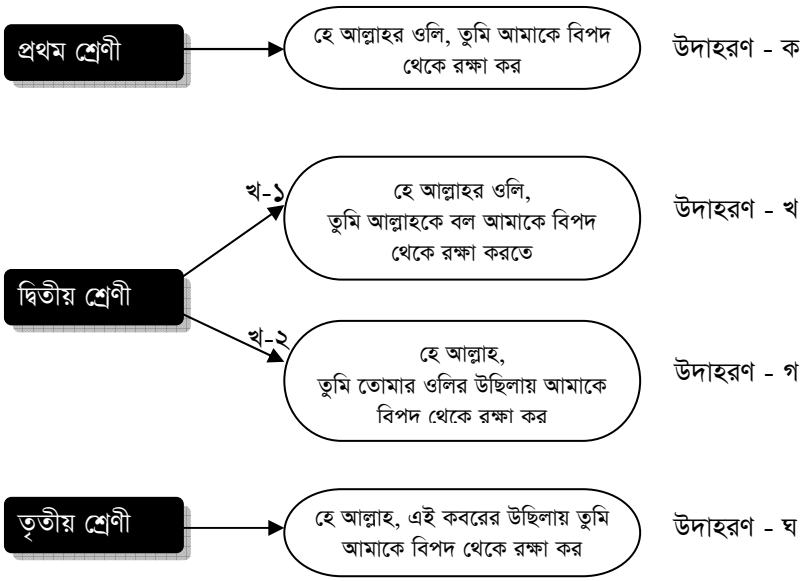
প্রথম শ্রেণী
হে আল্লাহর ওলি, তুমি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর
উদাহরণ - ক
দ্বিতীয় শ্রেণী
খ-১
হে আল্লাহর ওলি, তুমি আল্লাহকে বল আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে
উদাহরণ - খ
খ-২
হে আল্লাহ, তুমি তোমার ওলির উছিলায় আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর
উদাহরণ - গ
তৃতীয় শ্রেণী
হে আল্লাহ, এই কবরের উছিলায় তুমি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর
উদাহরণ - ঘ

৩ আমাদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক

মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শিরক

১. **দু'আর শিরক** ঃ নাবী, আওলিয়া, পীর বা মাজারের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রমোশন, রোগমুক্তি, সন্তান লাভ ইত্যাদির জন্য দু'আ (প্রার্থনা) করা শিরক ।

২. **মহব্বতের শিরক** ঃ কোন পীর, দরবেশ বা অলীকে আল্লাহর মত ভালবাসা শিরক ।

৩. **আনুগত্যের শিরক** ঃ কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী কাজে পীর, ইমাম বা আলেমদের আনুগত্য করা শিরক ।

৪. **সম্পর্কের শিরক** ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিলীন হয়ে আছেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এইরূপ ধারণা করা শিরক ।

৫. **ব্যবস্থাপনার শিরক** ঃ আওলিয়া ও কুতুবগণ সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন এই বিশ্বাস করা শিরক ।

৬. **নির্ভরতার শিরক** ঃ বিপদে পড়লে স্বীয় পীরকে স্মরণ করা শিরক । অথবা খাজা বাবা বা আব্দুল কাদের জীলানী বা অন্যান্যদেরকে স্মরণ করা শিরক ।

৭. **ক্ষমতার শিরক** ঃ পীর, আউলিয়া, মাযার ইত্যাদির মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা আছে এরূপ মনে করা শিরক ।

৮. **গুণের (সিফাত) শিরক** ঃ আল্লাহর কোন কোন সৃষ্টিকে ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী মনে করা যা শুধু একমাত্র আল্লাহর । যেমন নাবী, রসূল, পীর, আওলিয়া, জ্বীন গায়েবের খবর জানে বলে ধারণা করা শিরক ।

৯. **আমলের শিরক** ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কুরবানী করা, মানত করা, নজর-নেয়াজ দেয়া ইত্যাদি শিরক।

১০. **তাওয়াফের শিরক** ঃ কাবাঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা শিরক (অর্থাৎ পীর আওলিয়াদের মাযার তাওয়াফ করা শিরক)।

১১. **হিফাজতের শিরক** ঃ বিদায়ের আগে কারো নিরাপত্তা কামনায় পীর আওলিয়াদের নাম করে তাদের হিফাজতে দেয়া শিরক।

১২. **মর্যাদার শিরক** ঃ আল্লাহ ও মুহাম্মাদ ﷺ -কে একই মর্যাদার অধিকারী মনে করা কিংবা তা মনে করে কোথাও লিখে রাখা শিরক।

১৩. **রিসালাতের শিরক** ঃ মুহাম্মাদ ﷺ -এর আনীত জীবনবিধানকে লংঘন করে অন্য কোন জীবনবিধান মেনে নেয়া বা অনুসরণ করা রিসালাতের শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. **ইবাদতের শিরক** ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দেখানোর জন্যে ইবাদত করা। নাবী, রসূল, ফিরিশতা, পীর, দরবেশ, ফকির, আউলিয়া, জ্বীন, গণক, যাদুকর, তাবিজকারী অথবা অন্য কারো ইবাদত করা অথবা আল্লাহর ইবাদতের সময় তাদেরকে অংশীদার বানানো শিরক।

১৫. **কবর সংক্রান্ত শিরক** ঃ হাজরে আসওয়াদ ছাড়া অন্য কিছুকে চুমু খাওয়া যেমন ঃ মাযার বা কবরকে চুমু খাওয়া, কবরে হাত লাগানো, কবরে পশু জবেহ করা, কবরে ওরস করা, কবরে মানত করা, কবরে সিন্নি দেয়া, কবরে মোমবাতি জ্বালানো, আতর, গোলাপ ছিটানো, কবরে টাকা দেয়া ইত্যাদি শিরক। (অবস্থাভেদে ছোট ও বড় শিরক দু'টোই হতে পারে)।

১৬. **রসূল ﷺ -কে নিয়ে শিরক** ঃ রসূল ﷺ হাজির-নাজির অর্থাৎ আমি যা করছি তা তিনি সব দেখছেন, শুনছেন এমন আক্বিদা থাকা। মিলাদের সময় রসূল ﷺ -এর জন্য একটি খালি চেয়ার রাখা, তিনি মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন ভেবে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ানো শিরক।

১৭. **ভাগ্য পরিবর্তনের শিরক** ঃ শরীরে তাবিজ লটকানো, আকিক বা এ ধরনের অন্যান্য পাথর ব্যবহার করলে ভাগ্য পরিবর্তন হবে এমন আক্বিদা (বিশ্বাস) থাকা শিরক।

১৮. **অন্যান্য শিরক** ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কসম খাওয়া, অন্যের যিকর করা, অন্যের নিকট তওবা করা, কাউকে ক্ষতি ও উপকারের মালিক মনে করা এবং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা শিরক।

জন্মগতভাবে মুসলিম

আবু সাইদ আল খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত; রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় ভাগ্যবান তারা অবশ্যই অবগত যে, এই ধরনের মুসলিমদের আপনা আপনিই জান্নাত পাবার নিশ্চয়তা নেই। কারণ রসূল ﷺ সাবধান করেছেন যে মুসলিম জাতির একটি বৃহদাংশ এত ঘনিষ্ঠভাবে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের অনুসরণ করবে যে, তারা যদি একটি সাপের গর্তে প্রবেশ করে মুসলিমরাও তাদের পেছন পেছন প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, কিয়ামতের পূর্বে কিছু মুসলিম সত্যি সত্যিই মূর্তি পূজা করবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ঐ সব লোকদের মুসলিম নাম থাকবে এবং তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করবে কিন্তু কিয়ামতের দিন এগুলি তাদের কোন কাজে আসবে না। আজকাল পৃথিবীর চারদিকে এমন সব মুসলিম রয়েছে যারা মৃত ব্যক্তির পূজা করছে, কবরের উপর স্মৃতিসৌধ এবং মসজিদ নির্মাণ করছে এবং এমনকি এসব ঘিরে পূজার অনুষ্ঠানাদি পালন করছে। বাংলাদেশে আজকাল রীতিমতো অগ্নি পূজা করছে, যেমন কেউ মারা গেলে মোমবাতি জ্বালিয়ে শোক পালন করা হয়। শুধু মারা গেলে নয়, যেকোন ধরনের শোক পালন করার জন্য মুসলিম-অমুসলিম সকলে মিলে মোমবাতি জ্বালানো হচ্ছে অথচ এটা সরাসরি শিরক।

মাযার/কবর ভক্তরা অনেকে বলেন, আমরাতো কবর পূজা করি না, আমরা কবরকে শ্রদ্ধা করি। আসলে ভক্তরা শিরকের বিষয়ে পরিষ্কার না। যে কাজ মূর্তির সামনে করা হয় সেই একই কাজ করা হচ্ছে মাযার এবং পীরের সামনে। দূর্গা আর দর্গা একই, দূর্গার পিছনে যে ফিলোসফি কাজ করে ঠিক তেমনি দর্গার পিছনেও ঐ একই ফিলোসফি কাজ করে। যেমন ঃ কবরকে সাজদা করা, মৃত ব্যক্তিকে ডাকা, কবরে ফুল, আগরবাতী উপঢৌকন দেয়া ইত্যাদি - কেউ বলে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' আর কেউ বলে 'ইয়া গাওসুল আযম মাদাদ কর'। মূল ঘটনা একই।

আবার কিছু লোক কুরআনকে সৌভাগ্যের যাদুমন্ত্রে পরিণত করে কণ্ঠহার হিসেবে গলায়, তাদের গাড়ীতে অথবা চাবির চেইনে ঝুলায়, ক্ষুদ্র আকারের কুরআন শরীফ যা খালি চোখে পড়া যায় না তা বিপদের সাথী হিসেবে সাথে রাখে বা তাবিজের মধ্যে ভরে শরীরে বেঁধে রাখে।

সুতরাং, যারা এই ধরনের মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাদের পিতামাতা যা করেছিল বা বিশ্বাস করেছিল তা অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাদের এটা বন্ধ করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে তারা কি শুধু ঘটনাচক্রে মুসলিম নাকি পছন্দের দ্বারা মুসলিম? ইসলাম কি তাই যা তাদের পিতামাতা, গোষ্ঠি, দেশ অথবা জাতি যা যা করেছিল? না কি ইসলাম তাই যা কুরআন শিক্ষা দেয় এবং রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যা করেছিলেন? অন্ধ অনুকরণ শুধুমাত্র আল্লাহ এবং রসূল ﷺ -কেই করা যায় অন্য কাউকে নয়। নিম্নে আমাদের মুসলিম সমাজের কিছু প্রচলিত শিরক সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

কবর এবং মাযারকে ঘিরে নানারকম শিরক

ইসলামের কবর যিয়ারত করা জায়িয ও সুন্নাত-সমর্থিত। কিন্তু বর্তমানে কবর, বিশেষ করে পীর-অলী বলে কথিত লোকদের কবরকে কেন্দ্র করে মাযার নাম দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে যা কিছু করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বিদ'আত, ইসলাম বিরোধী এবং সুস্পষ্ট শিরক, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না।

যেমন ঃ মাযার বা কবরকে চুমু খাওয়া, কবরে হাত লাগানো, কবরে পশু জবেহ করা, কবরে ওরস করা, কবরে গিলাফ দেয়া, কবরে চান্দিনা টানানো, কবরে মানত করা, কবরে গিয়ে কান্না-কাটি করা, কবরে শায়িত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, কবরে টাকা-পয়সা দেয়া, কবরে সিন্নি দেয়া, কবরে মোমবাতি জ্বালানো, কবরে আগরবাতি জ্বালানো, কবরে আতর-গোলাপ দেয়া, কবরে ফল-ফুল দেয়া, কবর বা মাযার থেকে ফেরার পথে উল্টো হয়ে ফেরা, কবরের চারিদিকে তাওয়াফ করা, কবরকে ভক্তি করা, কবর বা মাযারের ক্ষমতা আছে মনে করা ইত্যাদি সুস্পষ্ট বিদ'আত ও শিরক।

সংশোধন ঃ ইসলামী পরিভাষায় কোন কবরকেই মাজার বলা যাবে না। সেটা কোন নাবী, রসূল, সাহাবা, ওলী-আউলিয়া বা কোন পীর-বুজুর্গের কবরই হোক না কেন। কবরকে মাজার বলা বিদ'আত। মদীনার বাকি কবরস্থানকে 'জান্নাতুল বাকি' বলাও বিদ'আত। কারণ রসূল ﷺ এই নামকরন করেননি, এটি অতি উৎসাহি লোকেরা করেছে। সহীহ হাদীসগুলোতে এটি 'বাকি কবরস্থান' নামেই পরিচিত, 'জান্নাতুল বাকি' বলতে হাদীসে কিছু নেই ।

কবর পাকা করা নিষেধ

কবরকে পাকা-পোখ্‌ত ও শক্ত করে বানাতে, তার ওপর কোনোরূপ নির্মাণ কাজ করতে, তার ওপর বসতে এবং তার ওপর কোনো কিছু লিখতে, কবরকে মাটি থেকে উচু করতে নাবী করীম ﷺ সুস্পষ্ট নিষেধ করেছেন। এবং কবরের উপরে নির্মিত যেকোন কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং কবর মাটির সাথে মিলিয়ে ফেলতে হবে। (সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ)

আমাদের দেশে কবরস্থানগুলোতে গেলে দেখা যায় দামী সুন্দর সুন্দর টাইলস দিয়ে কবরকে বাঁধানো হয়েছে। কবর বাঁধানো নিয়ে কেমন যেন একরকম প্রতিযোগীতা চলে, এটা এমনকি সামাজিক সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যদি মদিনার বাকি কবরস্থানে যাই তাহলে দেখতে পাই যে সেখানে ওসমান, ফাতিমা, মা আয়িশা (রা.)-সহ শত শত সাহাবীর কবর রয়েছে এবং একটা কবরও মাটি থেকে উচু বা বাঁধানো নয়, শুধু মরুভুমি, তবে চিহ্নস্বরূপ কোন কোন কবরে এক টুকরা পাথর রয়েছে। নিরাপত্তার কারণে রসূল ﷺ -এর কবরের বিষয়টি একটু ভিন্ন।

কবরে মসজিদ নির্মাণ নিষেধ

আয়িশা (রা.) রসূল ﷺ -এর মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের ওপর এ জন্যে যে, তারা তাদের পয়গম্বরদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ)

তাই যে সকল মসজিদের পাশে কবর/মাযার আছে সেখানে সলাত আদায়ের সময় খুব সাবধান থাকতে হবে যে, কোন কারণে যেন কবরের ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ বা প্রার্থনা না হয়ে যায়, যদি হয় তাহলে সরাসরি শিরক হয়ে যাবে।

সংশোধন ঃ কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, মদীনায় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর কবর তো মসজিদে নববীর ভিতরে। আসলে এই ধারণা ঠিক নয়। এটি মসজিদে নববীর এক পাশে। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর কবর হয়েছিল মা আয়িশা (রা.)-র ঘরে এবং তাঁর ঘর ছিল মসজিদে নববীর সাথে লাগানো। কারণ নাবীদের দাফন হয় সেখানে যেখানে তাদের মৃত্যু হয়। দেখলে মনে হতে পারে যে কবরটি মসজিদের ভিতরে, আসলে তা নয় এটি মসজিদের শেষ মাথায়, এরপর আর মসজিদের অংশ নেই এবং খালি জায়গায় সলাত হয় না। তুরস্কের লোকদের ভিতরে প্রচুর শিরক এবং বিদ'আতী আকীদা ছিল। একসময়

এই তুর্কীরা সৌদিআরব শাষণ করতো। তখন তারা রসূল ﷺ -এর কবরের উপর সবুজ গম্বুজ তৈরী করেছে, কবরের উপর পাকা ছাদ দিয়েছে এবং তারা মসজিদে হারামে এবং মসজিদে নববীতে নানারকম বিদ'আতী কারুকার্য করেছে যার অনেকটা আজও রয়েছে। তাদের আমল থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহর সলাত চালু হয়েছে। তাদের আমলে কাবার চারদিকে চারটি মাযহাবের আলাদা আলাদা জামাতে সলাত হতো। তাদের শাষণ আমল শেষ হওয়ার পরে এই চারটি জামাত বন্ধ হয়েছে এবং সৌদি আরব থেকে অনেক শিরক-বিদ'আতী প্রচলন ও নিদর্শন ধ্বংস করা হয়েছে।

কবরে সলাত আদায় করা এবং ইবাদতের স্থান বানানো নিষেধ

কবর পূজার পথে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে (নিয়্যত যাই থাকুক না কেন) কবরস্থানে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা দেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, কবরস্থান এবং শৌচাগার ব্যতীত জমিনের সকল স্থানই মসজিদ (ইবাদতের স্থান)। (আত-তিরমিযী, আবু-দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের বাড়িতে (নফল এবং সুন্নাত) সলাত আদায় কর, তাকে কবরস্থান বানিও না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ইবনে মাসুদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা যারা শেষ দিনে (কিয়ামতের আগে) জীবিত থাকবে এবং যারা কবরকে ইবাদতের স্থান করে নেবে। (আহমদ, আত-তাইয়ালাসী)

কবরস্থানে কুরআন পড়া নিষেধ

কবরস্থানে কুরআন পড়ার অনুমতি নেই। কারণ রসূল ﷺ অথবা তাঁর সাহাবীগণ কুরআন পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বিশেষ করে মা আয়িশা (রা.)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কবরে গিয়ে কী পড়তে হবে? তিনি সালাম (শান্তির সম্ভাষণ) এবং দু'আ করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে সূরা ফাতিহা পড়তে বলেননি। (আহকাম আল-যানাজ)

কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত করা নিষেধ

ইচ্ছাকৃতভাবে কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করতে রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। কারণ পরবর্তীতে অজ্ঞ লোকেরা এই ধরনের কাজকে স্বয়ং মৃতদের

প্রতি উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা করা বলে ধরে নিতে পারে। রসূল ﷺ বলেছেন, 'কবরের দিকে লক্ষ্য করে সলাত আদায় করিও না অথবা ঐগুলির উপর বসিও না।' (সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

কবরকে কেন্দ্র করে ওরস ও মেলা নিষেধ

কবরকে কেন্দ্র করে যে ওরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা ইসলামে নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা দেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার কবরকে ঈদ (উৎসবের স্থান) অথবা তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না এবং তোমরা যেখানেই থাক আমার জন্য আল্লাহর আশীর্বাদ চাও, কারণ তা আমার কাছে পৌঁছাবে। (আবু দাউদ, আহমাদ)

মহিলাদের কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে

কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে যারা বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযী, আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

শিরকের আশংকায় প্রথম দিকে মহিলাদেরকে কবর যিয়ারতের জন্য নিষেধ করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাদের যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে কারণ এতে মৃত্যুর কথা মনে হবে।

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ নিষেধ

কোন নাবী বা ওলী বা কোনো নেককার লোকের কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্য বিদেশ ভ্রমণ করাও জায়িয নয়। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম দলিল হচ্ছে নাবী করীম ﷺ -এর তীব্র ও জোরদার নিষেধ বাণী। তিনি বলেন ঃ

আল্লাহর নৈকট্য লাভমূলক সফর কেবল তিনটি মসজিদ যিয়ারতের জন্য করা যাবে, তা হলো ঃ মসজিদে হারাম (কাবা ঘর), মসজিদে নববী, এবং মসজিদে আকসা। এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অপর কোনো স্থানের জন্যে সফর করবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

কোন মাযারের নিকট দু'আ করা শিরক

আমরা জানি আল্লাহ শিরকের গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। (সূরা নিসা ঃ ৪৮, ১১৬) কেউ শিরক করলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং তাকে

আবার নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। শিরকের সোজা সংজ্ঞা হচ্ছে সৃষ্টার কোন ক্ষমতা তার সৃষ্টির উপর আরোপ করলেই তা হবে শিরক। যেমন আমরা যদি মনে করি কোন মাযার বা ওলি বা কোন পীর কাউকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করতে পারেন, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারেন বা ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন, তাহলেই তা হবে সুস্পষ্ট শিরক। তাই কোন মাযার বা পীর বা কোন ওলির নিকট কোন কিছু চাওয়া যাবে না এবং দু'আ করা যাবে না।

কবরস্থানে গিয়ে দু'আ করার সঠিক নিয়ম

'কবর যিয়ারত' আমাদের দেশে খুব প্রচলিত। 'কবর যিয়ারত' মানেই আমরা বুঝি কবরে গিয়ে দু'আ-দুরূদ ও কুরআন তিলাওয়াত করা। 'যিয়ারত' আরবী শব্দ, এর অর্থ ভিজিট অর্থাৎ কোন স্থান পরিদর্শন করা। যেমন এরাবিয়ানরা বলবে ক্যানাডার নায়াগ্রা ফল্‌স যিয়ারতে গিয়েছিলাম। আমরা হয়তো অবাক হবো যে, বলে কি? নায়াগ্রা ফল্‌স যিয়ারতে গিয়েছে! এবার আসি রসূল ﷺ আমাদেরকে কবর পরিদর্শনে কেন যেতে বলেছেন এবং গিয়ে কী করতে বলেছেন? রসূল ﷺ আমাদেরকে মূলতঃ কবর পরিদর্শন করতে অনুমতি দিয়েছেন কবরবাসির জন্য নয় বরং আমাদের নিজেদের জন্য আমরা যারা জীবিত আছি। কারণ কবরে গেলে আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে এবং আমরা আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবো। প্রথম দিকে রসূল ﷺ মুসলিমদেরকে কবরে যেতে নিষেধ করেছিলেন কবরকে নিয়ে নানারকম শিরক ও বিদ'আত সংঘটিত হওয়ার আশংকায়। পরে অনুমতি দিয়েছেন জীবিতদের মৃত্যুভয় জাগ্রত করার জন্যে।

কবর যিয়ারত করা জায়িয কিন্তু তা করতে হবে শরীয়ত সম্মতভাবে। কবরস্থানে গিয়ে যেমন শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না, কোনো অবাঞ্ছিত কথাও বলা যাবে না। ইমাম নববী লিখেছেন ঃ 'যিয়ারতকারীর কর্তব্য কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সালাম করবে এবং কবরস্থ সকলের প্রতি মাগফিরাত, রহমত নাযিল হওয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে।' এই সালাম ও দু'আ তাই হওয়া উচিত, যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কবর ধরা, স্পর্শ করা এবং তাকে চুমু খাওয়া – যা বর্তমান কালের সাধারণ মানুষ করছে– নিঃসন্দেহে শিরক ও বিদ'আত, শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং ঘৃণিত। তাই এধরনের আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে।

এছাড়া অতিরিক্ত হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে তবে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যেন কবর মুখি হয়ে দু'আ না করি, দু'আ করতে হবে কিবলা মুখি হয়ে। এতে কবর যদি আমাদের পিছন দিকেও তাতে তাকে কোন অসুবিধা নেই, এমনকি মদীনায় রসূল ﷺ -এর কবরেও একই নিয়ম পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে করলেই তিনি তার সওয়াব পাবেন। এছাড়া প্রত্যেক সলাতের পরই বাবা-মার জন্য দু'আ করতে বলা হয়েছে।

যিয়ারতের সঠিক দু'আ

আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়াইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লা-লাহিকূনা নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াতা।

অর্থ ঃ হে মু'মিন মুসলিমদের গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে অচিরেই মিলিত হব, আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের নিজেদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করি। (সহীহ মুসলিম)

মাযার এবং মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক

যারাই কবরে প্রার্থনা করে তাদের বেশীরভাগই এই ভ্রান্ত ধারণা বহন করে যে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তারা আল্লাহর এতই নিকটে যে তাদের আশেপাশে যেসব উপাসনার কাজ করা হয় সেগুলি আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হবার সম্ভাবনা বেশী। অর্থাৎ যেহেতু এসব মৃত ব্যক্তিবিশেষরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তাদের আশেপাশের সবকিছুও নিশ্চয় আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তাদের কবরে সৌধ নির্মাণ এবং এমনকি যে জমির উপর ঐগুলি নির্মিত হয়েছে বা যে এলাকায় তাদের কবর সে জমি এবং এলাকায়ও নিশ্চয়ই আশীর্বাদ প্রবাহিত হচ্ছে। এই বিশ্বাসের কারণে কবর-ভক্তরা প্রায়ই অতিরিক্ত আশীর্বাদ লাভের জন্য কবরের দেয়ালে হাত মুছে শরীরের উপর হাত বুলায়, বরকতের আশায় ঐ এলাকার নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে। তারা প্রায়ই কবরের আশেপাশের মাটি সংগ্রহ করে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে যে যাদের কবর দেয়া হয়েছে তাদের উপর আশীর্বাদ আরোপের কারণে ঐ মাটির আরোগ্য করার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সাহায্য বা ক্ষতি কোনো কিছু করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। এ জন্যে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়ার কথাই নানাভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই মাযার এবং মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ বলেন ঃ

- *"হে নাবী! মৃত ব্যক্তিকে তুমি কোন কথা (কোন আহ্বান) শুনাতে পারবে না।" (সূরা নামল ঃ ৮০)*
- *"হে নাবী! তোমার সাধ্য নেই যে তুমি মৃত ব্যক্তিকে কিছু শোনাবে।" (সূরা রুম ঃ ৫২)*
- *"জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে না, আল্লাহ যাকে চান শুনান। হে নাবী! তুমি সেই লোকদেরকে শুনাতে পারবে না যারা কবরসমূহে দাফন হয়ে রয়েছে।" (সূরা ফাতির ঃ ২২)*
- *"মরা লাশ যারা জীবিত নয় তারা এও জানে না যে কবে তাদেরকে উঠানো হবে।" (সূরা নাহল ঃ ২১)*

যারা মরে গেছেন– তাঁরা ওলী-ই হন, আর নাবী-ই হন তাঁদের নিকট জীবিত লোকদের কোনোরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা– বিদ'আতীদের ভাষায় যাকে বলা হয় ইস্তেমদাদে রূহানী– সুস্পষ্ট বিদ'আত এবং শিরক। মৃত ব্যক্তি যতো বড় ওলীই হোন তিনি অপরের জন্য তো কিছু করতেই পারেন না এমনকি নিজের জন্যও কিছুই করতে পারেন না। রসূল ﷺ বলেছেন মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব সে কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকে যা সে জীবিত অবস্থায় করে গেছে ঃ

(১) সদকায়ে জারিয়া (সে ভাল কাজের জন্য যা দান-সদাকা করে গেছে)
(২) এমন জ্ঞান যা সে বিতরণ করেছে এবং
(৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।

সহীহ্ মুসলিমের এই হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারি যে, কোন ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন থেকে সে নিজের জন্য আর কিছুই করতে পারে না, অন্যের জন্য কিছু করা তো দূরের কথা। কোন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আত্মা আর এই পৃথিবীতে থাকে না। ভাল আত্মাগুলো থাকে ইল্লীনে (যা জান্নাতের সাথে যুক্ত) এবং পাপী আত্মাগুলো থাকে সিজ্জীনে (যা জাহান্নামের

সাথে যুক্ত) । কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আত্মাগুলো ঐ দুই জায়গায় থাকবে । আর কবর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়টাকে বলা হয় "আলমে বারযাখ" ।

যাহোক, অনেকের ধারণা মৃত্যুর পর আত্মা এসে ঘোরাঘুরি করে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । মৃতের আত্মা মৃত্যুর পর আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসে না । তাই এ ব্যাপারে খুব সাবধান!

কবর পূজা নিষেধ ঃ কবর ভক্তরা বলতে পারেন যে, 'আমরা তো কবর পূজা করি না, কবর আবার কেউ পূজা করে নাকি?' আসলে অজ্ঞতার কারণে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশী শিরক করে থাকে কবরকে ঘিরে । যেমন, কবরে মানত করা, পশু যবাই করা, ওরশ করা, গিলাফ দেয়া, ফুল দেয়া, আগর বাতি দেয়া, মোমবাতি দেয়া, গোলাপ পানি দেয়া, কবরের নিকট কিছু চাওয়া এসবই পূজার অন্তর্ভুক্ত ।

পীর বা কোন ওলীর কাছে চাকুরী, প্রমোশন, ব্যবসা, উন্নতি, ভাগ্যের পরিবর্তন, বিপদ-আপদ ও রোগমুক্তি ইত্যাদি চাওয়া শিরক

বান্দার ভাল-মন্দ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না ঃ *(হে মুহাম্মাদ)! তুমি ঘোষণা করে দাও- আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই, আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তবে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারতাম আর কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। অতএব অদৃশ্য জগতের কোন খবরই আমি রাখি না, আমি শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮৮)*

প্রমাণ স্বরূপ আমরা আরও দেখতে পারি কুরআনের এই আয়াতগুলো ঃ সূরা আল মায়িদা ঃ ৪১; সূরা ইউনুস ঃ ৪৯, ১০৭; সূরা রা'দ ঃ ১৬; সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৬; সূরা আল-ফুরকান ঃ ৩; সূরা আল-ফাতহ ঃ ১১; সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ৪; সূরা আল জ্বিন ঃ ২১ ।

চাকুরী, প্রমোশন, ব্যবসা, উন্নতি শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" (সূরা আত-তালাক ঃ ২-৩)

"আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল'। (তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে) 'তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, 'আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।" (সূরা নূহঃ ১০-১২)

"বল, 'নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযকদাতা।" (সূরা আস-সাবা' ঃ ৩৯)

"আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের (রিযিক) বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ০৭)

প্রমাণ স্বরূপ আমরা আরো দেখতে পারি কুরআনের এই আয়াতগুলো ঃ সূরা আল-বাকারা ঃ ২১২, সূরা আল-মায়িদা ঃ ৮৮, সূরা হুদ ঃ ৬, সূরা রাদ ঃ ২৬, সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৫৮, সূরা আল-আনকাবুত ঃ ১৭, ৬০, সূরা আর-রূম ঃ ৪০, সূরা ফাতির ঃ ৩, সূরা আল-মু'মিনুন ঃ ১৩, সূরা আশ-শুরা ঃ ২৭, সূরা আয-যারিয়াত ঃ ৫৮, সূরা আল মুল্‌ক ঃ ১৫, ২১ ।

বিপদ থেকে রক্ষা করার মালিক একমাত্র আল্লাহ

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না।" (সূরা তাগাবুনঃ১১)

"আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৭)

"কোনো দুঃখ বা বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহর মর্জীতেই হয়েছে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান।" (সূরা আনআম ঃ ১৭)

আরো প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পারি কুরআনের এই আয়াতগুলো ঃ সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৬, সূরা আন-নামল ঃ ৬২, সূরা আঝ-ঝুমার ঃ ৩৮, ৪৯, সূরা ইউনুস ঃ ১২, সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৪, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৬, সূরা আনয়াম ঃ ৪০-৪১, সূরা আল-আ'রাফ ঃ ২৯, সূরা ইউনুস ঃ ১০৬, সূরা রা'দ ঃ ১৪, সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৮, সূরা আল-মু'মিন ঃ ১৪ ।

রোগমুক্তি করার মালিক একমাত্র আল্লাহ

প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পারি কুরআনের সূরা আশ-শু'আরা ৮০নং আয়াত

"আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই সুস্থ করে দেন।"

বিশ্বজাহান সৃষ্টির পর আল্লাহ বিশ্রাম নিয়েছেন এই আকীদা শিরক

বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ ছয় দিনে এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ) । আল্লাহ বিশ্রাম নিয়েছেন কুরআন ও হাদীসের এর কোন দলিল নেই । আল্লাহ ছয় দিনে এই বিশ্বজাহান ঠিকই সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সপ্তম দিনে কোন প্রকার বিশ্রাম নেননি । আল্লাহ তা'আলা আমাদের মতো নন যে তিনি একটা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পরেন । তাই আল্লাহর সাথে অন্য কোন জীবের তুলনা হয় না যার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় । বাইবেলের এই কথাটা সূফীজমের অনেক লোকেরা বিশ্বাস করে থাকেন । এবং পীর-মুরীদেরা এই ভুল তথ্য প্রচার করে থাকেন ।

আল্লাহ নিরাকার এই আকীদা শিরক

আল্লাহর কি আকার আছে? আমাদের মধ্যে একটি ভুলধারণা আছে যে আল্লাহ নিরাকার অর্থাৎ আল্লাহর কোন আকার নেই । এই ধরনের বিশ্বাসও সম্পূর্ণরূপে ভুল । আল্লাহ নিরাকার নয়, আল্লাহর আকার আছে । তবে তাঁর আকার কেমন তা আমরা জানি না সেটা তিনিই ভাল জানেন । আল্লাহর আকারের সাথে তাঁর

সৃষ্টির সাথে কোন তুলনা করা যাবে না। তুলনা করতে চাইলে বড় গুনাহয় লিপ্ত হবে। আমাদের মধ্যে একটা ভুল প্রচলিত আছে যে আল্লাহ নূরের তৈরী। আসলে এই কথাটারও সহীহ হাদীসে কোন দলিল নেই। আল্লাহ যে কিসের তৈরী তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। তবে ফিরিশতারা নূরের (লাইট বা আলোর) তৈরী। আল্লাহর পর্দা (হিযাব) নূরের (আলো) তৈরী। এই হিযাব দ্বারা আল্লাহর চেহারাটুকু ঢাকা রয়েছে। এই কারণে মিরাজে গিয়ে নাবী ﷺ আল্লাহকে দেখার বিষয়ে বলেছেন আমি তো নূর দেখেছি, তিনি আল্লাহকে দেখননি কিন্তু আল্লাহর সামনে যে পর্দা ছিল তা তিনি দেখেছিলেন। কোন মানুষের নাম নুররুল্লাহ রাখা যাবে না। কারণ আল্লাহর যে নূর এটা আল্লাহর একটি সিফাত। (সূরা জুমার ঃ ২২)

কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আল্লাহর আকার আছে

- কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ পা বের করে দেবেন এবং তাঁর পায়ে সিজদা করার নির্দেশ দেবেন, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য ছিল তারা সিজদা করতে পারবে না, কিন্তু যারা ঈমানদার তারাই সিজদা করতে পারবে। (সূরা কালাম ঃ ৪২-৪৩)

- পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ, তোমরা যে দিকে তোমাদের মুখমণ্ডলকে ফিরাবে সে দিকেই আল্লাহর চেহারা থাকবে। (সূরা বাকারা ঃ ১১৫)

- আল্লাহ তোমাদিগকে আপন নফসের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩০)

- আল্লাহ ফিরিশতাদিগকে বললেন, "আদমকে সুঠাম করব, তারপর আদমের মধ্যে আমার রূহ প্রদান করব, তারপর তাকে তোমরা সিজদা করবে।" (সূরা হিজর ঃ ২৯)

- সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যাঁর হাতে বিশ্ব নিখিলের সকল বিষয়ের ক্ষমতা, তাঁর নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৮৩)

- আল্লাহর জাত কি দিয়ে তৈরী তা আমরা জানিনা, কিন্তু আল্লাহর ছায়া আছে। আবূ হুরাইরা (রা.) সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তার ছায়া দিবেন যখন তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) এখানে আরশের ছায়া নয় এটা আল্লাহর ছায়া।

- আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমানসমূহকে পরস্পর একত্রিত করে ডান হাতে রাখবেন, এবং মাটির সকল স্তরকে একত্রিত করে বাম হাতে রাখবেন। (সহীহ মুসলিম)
- হে নূহ! তুমি আমার চোখের সম্মুখে নৌকা তৈরি কর। (সূরা হুদ ঃ ৩৭)

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই আকীদা শিরক

আল্লাহ কোথায়? আমাদের মধ্যে একটি ভুলধারণা বিদ্যমান যে 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান'। এই ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ভুল। আল্লাহ সবর্ত্র বিরাজমান নয়, আল্লাহর জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান এবং "আল্লাহ রহমান আরশে আজীমে সমাসীন"। (সূরা ত্ব-হা ঃ ৫)

'যতো কল্লা ততো আল্লাহ। মু'মিনদের হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর আরশ। অন্তর হলো আল্লাহর ঘর। যে দিকে তাকাও সেদিকে আল্লাহ। যে দিকে তাকাও সেদিকে ইশ্বর। যে দিকে তাকাও সেদিকে ভগবান।' এগুলো হচ্ছে হিন্দুদের আকীদা। হিন্দু ধর্মে বলে ঃ 'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়, হরিকে দেখিয়া হরি, হরিতে লুকায়'। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে ভগবান সর্বত্র বিরাজমান। বাংলাদেশের নবম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইতে লিখা রয়েছে যা হিন্দু ধর্ম শিক্ষার ৪র্থ শ্রেণীর বইতে একই লিখা আছে যে- 'আল্লাহ অদৃশ্য, নিরাকার, সর্বত্রবিরাজমান'।

সূফীরা বলেন প্রতিটি মু'মিনের ক্বলবে আল্লাহ থাকেন। এই ধরনের আকীদা শিরক। কারণ এতে বুঝায় আল্লাহ অনেকগুলো, কারণ যতো মু'মিন ততো আল্লাহ। আবার আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই আকীদাও শিরক। কারণ আল্লাহ যদি সর্বত্র বিরাজমান হতো তাহলে বুঝায় তিনি মসজিদেও আছেন আবার টয়লেটেও আছেন। (নাউযুবিল্লাহ) হ্যাঁ, তবে আল্লাহর জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান, কোথায় কী হচ্ছে তা তিনি সর্বক্ষণ জানেন।

কিছু থেকে কিছু হয় না সব কিছু আল্লাহ থেকে হয় এই আকীদা শিরক

এই আকীদা হচ্ছে জাবরিয়া আকীদা। তাদের বিশ্বাস ন্যায়-অন্যায় সব কিছু আল্লাহ করায়। যে চুরি করে, যিনা করে, মানুষ খুন করে তা আল্লাহই তাকে দিয়ে করান, এখানে তার কোন দোষ নেই। আব্দুল আলিমের এই গানের কথায়

কথায় তা বর্ণনা করা হয়েছে যা শিরক। যেমন এখানে আল্লাহকে দোষ দেয়া হচ্ছে। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদেরকে যেভাবে নাচাচ্ছেন আমরা ঠিক তেমনি নাচ্ছি, এতে আমাদের কী দোষ? আবার তিনি আমাদেরকে দিয়ে অন্যায় করাচ্ছেন আবার তিনিই আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন, এতে আমাদের কী দোষ? তিনিই আমাদের ক্ষতি করছেন আবার তিনিই আমাদের ক্ষতি লাঘব করছেন, এতে আমাদের কী দোষ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া। এতো যত্নে গড়াইয়াছেন সাঁই
ছায়া বাজি পতুল রূপে বানাইয়া মানুষ।
তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি। পতুলের কি দোষ?
তুমি হাকিম হইয়া হুকুম করো। পুলিশ হইয়া ধরো।
সর্প হইয়া দংশণ করো। ওঝা হইয়া ঝাড়ো।

আলী (রা.) এবং হোসাইন (রা.)-কে ঘিরে শিরক

সিরিয়ার শিয়াদের মধ্যে অনেকে মনে করে যে, পয়গম্বর মুহাম্মাদ ﷺ -এর চাচাতো ভাই ও মেয়ের জামাই আলী (রা.)র মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ ছিল এবং তারা তাঁর উপর আল্লাহর অনেক গুণ আরোপিত করেছিল। এদের মধ্যে আছে নুসাইরিয়া সমপ্রদায় ও ইসমাঈলী সম্প্রদায়। ইসমাঈলীরা আগাখানি বলে পরিচিত, তারা তাদের নেতা আগা খানকে স্রষ্টার প্রকাশ বলে মনে করে। লেবাননের দ্রুজ মুসলিমরাও এই শ্রেণীভুক্ত, যারা বিশ্বাস করে যে ফাতেমীয় খলিফা আল-হা'কিম বিন আমরিল্লাহ মনুষ্য জাতির মধ্যে আল্লাহর শেষ প্রকাশ।

একইভাবে আমাদের এই উপমহাদেশের অনেক পীর মুরীদদের বিশ্বাস যে, কুরআন ৩০ পারা নয় মোট ৬০ পারা আল্লাহ নাযিল করেছেন। ৩০ পারা জাহেরী যা বর্তমানে পৃথিবীতে আছে এবং বাকী ৩০ পারা বাতেনী যা আল্লাহ গোপনে নাযিল করেছেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ এই ৩০ পারা সকলের নিকট প্রকাশ না করে গোপনে শুধুমাত্র আলী (রা.)-কে দিয়ে গেছেন। এবং আলী (রা.) গোপনে হাসান বসরিকে দিয়ে গেছেন এবং হাসান বসরি গোপনে গোপনে অন্যান্য ওলিদেরকে দিয়ে গেছেন এভাবে গোপনে গোপনে ঐ ৩০ পারা পীরসাহেবদের হৃদয়ে চলে এসেছে। যে কোন মানুষের এই ধরনের বিশ্বাস থাকা সুস্পষ্ট শিরক। মনে রাখতে হবে যে ইসলামে গোপন বলতে কিছু নেই। রসূল ﷺ মা আয়িশা (রা.)-কে বলেছেন তাঁর ভেতরের এবং বাইরের অর্থাৎ internal-external সমস্ত কর্মকান্ড মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিতে। এছাড়া

আল্লাহ তার কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন আল্লাহর বাণী সকলের নিকট পৌঁছে দিতে। যেমন সূরা বাকারার ১৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ *"তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার দেয়া সত্যকে গোপন রাখে?"*

এছাড়া আমরা মুহাররম মাস আসলে দেখি যে এক শ্রেণীর মানুষ হোসাইন (রা.)কে নিয়ে নানারকম শিরক এবং বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে যায়। শিয়া সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখার অনেকে কারবালায় হোসাইন (রা.) যেখানে শহীদ হয়েছিলেন সেখানকার মাটি সংগ্রহ করে আগুনে সেঁকে ছোটছোট বিস্কুটের মতো তৈরী করে বিভিন্ন মসজিদে ও পকেটে রেখে দেয় এবং সলাতের সময় সেগুলির উপর সিজ্‌দাহ করে। আমাদের দেশে মোশাররফ হোসেনের লিখা 'বিষাদ সিন্ধু'-র মধ্যে রয়েছে প্রচুর মিথ্যা গল্প। এটি একটি জনপ্রিয় ভক্তিমুলক নজরুল সঙ্গীত, এই গানটির কথার মধ্যে রয়েছে শিরক।

মহার্‌রমের চাঁদ এলো ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়া,
ইয়া হোসেন হায়, ইয়া হোসেন হায়, সে তারই মাতম শুনা যায়।

ইমাম বলা যাবে না ঃ ইমাম হোসাইন বা ইমাম হাসান বলা যাবে না। এটা সিয়াদের আকীদা। এই দুইজনের নামের আগে ইমাম লাগানো যাবে না। একইভাবে ইমাম মাহদী বলা যাবে না। এটা সিয়াদের আকীদা।

ইয়া আলী বলা যাবে না ঃ আমাদের সামাজে প্রচলিত আছে যে, ভারি কিছু উত্তলনের সময় কেউ কেউ বলে 'ইয়া আলী', আবার অনেক জায়গায় দেখা যায় শ্রমিকরা অনেকে মিলে কোন ভারি কিছু একসাথে ঠেলে সরাচ্ছে তখন সুরে সুরে নানা শিরকী পংক্তি বলে এবং তার সাথে সাথে আলীর নাম নেয়। ইবলিস শয়তান হয়তো কোন দিন আমাদের মধ্যে এই তথ্য দিয়ে দিয়েছে যে আলীর নাম নিলে শরীরে অতিরিক্ত শক্তি পাওয়া যায়। (নাউযুবিল্লাহ)

ওমর (রা.)-কে নিয়ে শিরক

আমাদের দেশের বড় বড় হুজুররা ওয়াজে বলে থাকেন যে, "রাতে ঘুমানোর সময় আঙুল দিয়ে বুকের উপর ওমর (রা.)-এর নাম লিখে ঘুমালে সারারাত শয়তান কাছে আসতে পারবে না, তবে তা আরবী বা বাংলায় লিখতে হবে, ইংরেজীতে লিখলে হবে না"। (নাউযুবিল্লাহ) সত্যিকার অর্থে এই ধরনের কথার কোন ভিত্তি নেই, এগুলো বানানো গল্প, সাহাবীদের নামে মিথ্যা রচনা। এছাড়া আরো ওয়াজে বলে থাকেন যে, একদিন সকালে ওমর (রা.) নাকি মসজিদে

নববীর বারান্দায় সাহাবাদের নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এবং এক সময় সূর্যের তাপ খুব প্রখর হয়ে উঠেছে এবং ওমর (রা.)-র পিঠে তাপ লাগাতে তিনি খুব বিরক্ত হয়েছেন এবং চোখ দুটি বড় বড় করে গরম হয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়েছেন তখন সূর্য ভয়ে তার তেজ কমিয়ে দিয়ে নিভু নিভু হয়ে গেছে। অতঃপর ওমর (রা.) তার বক্তৃতা শেষ করে আবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসেছেন তখন সূর্য তার স্বাভাবিক তেজ বাড়িয়ে দিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) আসলে ওয়াজের এই সকল ভিত্তিহীন কথা-বার্তা বলে শেষ করা যাবে না। এই ধরনের দলিল বিহীন ওয়াজ-নসীহত তো এলাকায় এলাকায় সারারাত ধরে হয়, সারা বছর ধরে হয়, কয়টার কথা উল্লেখ করবো?

মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-কে ঘিরে নানারকম শিরক

মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) ছিলেন ইসলামের একজন সৈনিক বা মুজাহিদ, দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন এই ভারত উপমহাদেশে। তার মৃত্যুর পর দুর্বল ঈমানের মানুষেরা তার কবরকে ঘিরে বানিয়েছে মারাত্মক শিরক ও বিদ'আতের আখড়া, আর এক শ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ীরা শুরু করেছে নানারকম ব্যবসায়িক ধান্দা। খাজা ফার্সি শব্দ এর অর্থ গুরু বা শিক্ষক। 'খাজা বাবা' নাম দিয়ে তার নামে বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় হয় চাঁদাবাজী ও ওরস, আর ওরসের নামে সারারাত হয় শিরক-বিদ'আতী গান ও কাউয়ালী (যেমন ঃ "খাজা বাবার দরবারেতে, কেউ ফিরে না খালি হাতে"), সেই সাথে নানারকম ইসলাম-বিরোধী কাজ। যাদের সন্তান হয় না তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সন্তান চায় আজমীর শরীফে কবরে শায়িত মৃত খাজাবাবার নিকট। (মনে রাখতে হবে, নিজের জন্মদাতা পিতা ছাড়া অন্য কাউকে বাবা পরিচয় দেয়া যাবে না, এটা আল্লাহ রসূল ﷺ এর পালক সন্তানের পর থেকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন)। চাকুরী, প্রমোশন বা ব্যবসার জন্য বা নানারকম অন্যায় কাজ করে মুক্তি লাভের জন্য আজমীর যায়, তারা সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক করে। আমরা জানি যে শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। (সূরা নিসা ঃ ৪৮, ১১৬)

আজগুবি গল্প ঃ মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-কে নিয়ে বাজারে প্রচুর অবাস্তব গল্প চালু আছে যা ভিত্তিহীন এবং এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন, তিনি যখন কাফেলা নিয়ে প্রথম এই উপমহাদেশে আসলেন তখন কোন এক জায়গায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য তাবু টানালেন। এবার সবার ওযূ করার প্রয়োজন হলো কিন্তু তৎকালীন রাজার লোকেরা তাদেরকে পানি দিতে নারাজ হলো।

তারপর মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার এক সাথীকে পাঠালেন সাগর থেকে এক বদনা পানি আনার জন্য। ঐ এক বদনা পানি আনার কারণে পুরো ভারত উপমহাদেশের সমস্ত নদ-নদী এবং সাগরের পানি শুকিয়ে গেল, কোথাও এক ফোটা পানি রইল না, সব পানি গিয়ে ঐ এক বদনার মধ্যে ঢুকলো! এবার রাজা নিজে তার কাছে ক্ষমা চাইলেন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক মুখরোচক কাহিনী। এগুলো বিশ্বাস করা সুস্পষ্ট শিরক।

আজমীরের ক্ষমতা ঃ খাজা বাবার মাযারের কারণে এই আজমীর শরীফের ক্ষমতার শেষ নেই। সব ধর্মের লোকেরাই যার যা সমস্যা তা নিয়ে যাচ্ছে সেখানে। সিনেমার নায়ক-নায়িকা থেকে শুরু করে, ব্যবসায়ী, বিখ্যাত সব খেলোয়ার, শিল্পী, মন্ত্রি, প্রেসিডেন্টও যাচ্ছেন তাদের মনোবাসনা পূরণের জন্য। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে মৃত বা জীবিত খাজা বাবার কোন ক্ষমতা নেই। এই সকল বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে শিরক।

মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-কে বাজারে অনেক শিরকী কথা-বার্তা চালু আছে। যেমন তার অনেক শিরকী উপাধী রয়েছে,তার মধ্যে গরীবে নেওয়াজ একটি। 'গরীবে নেওয়াজ' অর্থ হলো গরীবদের চাহিদা পুরণকারী, প্রার্থনা পুরণকারী। মাঝে মধ্যে উর্ধ আকাশে নাকি গরীবে নেওয়াজের ছবি দেখা যায় এবং লক্ষ লক্ষ ভক্তরা এই দৃশ্য দেখে। যাদের সন্তান হয় না তারা অনেকেই যায় আজমীর শরিফে সন্তান ভিক্ষা আনার জন্য। (নাউযুবিল্লাহ) খাজাবার দরবারে নাকি একটি বিশাল পাত্র রয়েছে। ভক্তরা চাল-ডাল, ফল-মুল, দই-মিষ্টি, তরী-তরকারী, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি যা নিয়ে আসে তা ঐ পাত্রের ভিতরে দিয়ে সব মিশিয়ে একত্রে রান্না করা হয় এবং এটা নাকি একটি বরকতপূর্ণ মনবাসনা পূর্ণ হওয়ার তবারক। (নাউযুবিল্লাহ) এরপর রয়েছে খুবই বিখ্যাত এক রকমের রঙিন সুতা। এই সুতা ভক্তরা আজমীর শরিফ থেকে নিয়ে আসে এবং নিয়্যত করে গলায় বাঁধে, হাতে বাঁধে। (নাউযুবিল্লাহ)

পরামর্শ ঃ যারাই খাজা-বাবা এবং বড় পীরসাহেবের ভক্ত তাদের উচিত মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) এবং আব্দুল কাদের জিলানীর (রহ.)-এর authentic বিস্তারিত জীবনী সংগ্রহ করে পড়া, তবে বাজারে তাঁদের ঘিরে অনেক গাঁজাখুরী গল্পের বই পাওয়া যায় সেগুলো থেকে সাবধান। এবং তাঁদের জীবনী থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত যে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী সংগ্রাম করেছিলেন। আজকাল তাঁদের ভক্তরা তাঁদের ঘিরে যে ধরনের শিরকী কাজকর্ম করছে সেই ধরনের কোন কাজের নির্দেশ তারা তাদের জীবদ্দশায় বলে দিয়ে গেছেন কিনা।

আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) কে নিয়ে নানারকম শিরক

পীরতন্ত্র আব্দুল কাদের জিলানীকে 'গওসুল আজম' বলে মানে। 'গওস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী, বিপদআপদ থেকে মুক্তকারী ও উদ্ধারকারী। সাকালায়িন মানে জিন ও ইনসান। গওসুস-সাকালায়িন মানে মানব ও দানবের আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী, মানব ও দানবের বিপদহন্তা ও উদ্ধারকারী। একবার কি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন যে কি ধরনের শিরক আপনি আল্লাহর সাথে করছেন?

যেখানে তাওহীদের মূল শিক্ষাই হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া উদ্ধারকর্তা, বিপদহন্তা ও আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী কেউ নেই, সেখানে একবার চিন্তা করুন, মানুষ কেমন করে এসব গুণের অধিকারী হতে পারে? কিন্তু পীরভক্তরা আল্লাহর এসব গুণে মানুষের অধিকার সাব্যস্ত করে ছেড়েছে। 'গওস' সম্পর্কে এই যে ধারণা, খ্রীষ্টানরা ঠিক ঈসা (আ.) সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করে থাকে, আর রাফেযীরা আলী সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে। কেউ কেউ আব্দুল কাদের জিলানীকে এতোই ভক্তি করে যে তারা 'বোগদাদী' সলাত আদায় করে থাকে অর্থাৎ তারা কাবাকে বাদ দিয়ে ইরাকের বাগদাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সলাত আদায় করে (নাউজুবিল্লাহ)।

কোন মানুষ সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে কুরআন ও হাদীস মতে শিরক- এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আল্লাহই হচ্ছেন অন্নদাতা, আল্লাহই হচ্ছেন বিপদমুক্তকারী, আল্লাহই হচ্ছেন আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী, আল্লাহই হচ্ছেন সরাসরি সাহায্যকারী- এক কথায় আল্লাহই হচ্ছেন 'গওস'। নজিব, নকিব, আবদাল, কুতুব, আওতাদ ও 'গওস' প্রভৃতি কথা কুরআন ও হাদীসের কোন জায়গায় উল্লেখ নেই। অথচ দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ কেউ আব্দুল কাদের জিলানীকে এই উপাধিতে ডেকে তাঁর সাহায্য এবং আত্মরক্ষা কামনা করে, যদিও আল্লাহ আগেই বলেছেন ঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

"আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেউ নাই।" (সূরা আল-আনআম ঃ ১৭)

অনেকের বিশ্বাস যে, আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বাগদাদের কবরে শুয়ে শুয়ে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে পারেন। কিন্তু আমেরিকা যখন অবৈধভাবে

ইরাক আক্রমণ করে মিসাইলের পর মিসাইল মেরে একটা সুন্দর সাজানো গোছানো দেশটাকে তছনছ করে দিল! বাগদাদের মতো একটা পুরোনো সভ্য শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করল! বাগদাদে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা ইরাকী মেয়েদেরকে ধরে ধরে ধর্ষণ করছিল তখন কি আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বাগদাদে থেকেও কিছুই করতে পারলেন না? ভুল না বুঝি, এখানে আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-কে ছোট করার জন্য কোন কথা বলা হচ্ছে না, শুধু বুঝার সুবিধার্থে যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, মৃত মানুষ আসলে কিছুই করতে পারেন না ।

অতিরিক্ত সতর্কতা ঃ বাজারে সবচেয়ে বেশী আজগুবি গল্প প্রচারিত আছে আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-কে ঘিরে । যেমন ঃ তিনি মরা মানুষ জীবিত করতেন! তিনি যখন তার মায়ের পেটে ছিলেন তখন এক ভিক্ষুক তার মায়ের ইজ্জতহানী করতে চেয়েছিল তখন তিনি মায়ের পেট থেকে বের হয়ে বাঘ হয়ে সেই ভিক্ষুককে খেয়েছিলেন! শোনা যায় তিনি মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা বানিয়ে ছিলেন! আবার তিনি মুরগির মাংস খাওয়ার পর সেই হাঁড়গুলোকে একত্র করে জীবন্ত মুরগি বানিয়ে ছিলেন! আবার তিনি কাকে যেন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তার পায়ের খড়ম পাঠিয়ে অলৌকিকভাবে পিটিয়ে ছিলেন! এগুলো সবই আজগুবি গল্প ।

বিশেষ গল্প ১ ঃ মিরাজের রাতে রসূল ﷺ সাত আসমান পাড়ি দিয়ে যখন সিদরাতুল মুনতাহার পর্যন্ত গিয়েছিলেন তখন নাকি রসূল ﷺ কোথায় রাস্তায় হোচট খেয়েছিলেন এবং তখন আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) তাকে সাহায্য করেছিলেন শুধু তাই নয় ঐ রাতে কোন একটা জায়গায় রসূল ﷺ উপরে উঠতে পারছিলেন না তখন তিনি আব্দুল কাদের জিলানীর ঘাড়ের উপর পা রেখে উপরে উঠেছিলেন ।

গল্পের বিশ্লেষণঃ এবার আসুন দেখি গল্পের নমুনা, আল্লাহ তা'আলা রসূল ﷺ -কে এই পৃথিবী থেকে স্পেশাল বাহনে করে এতো দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলেন আর চলার পথে তিনি হোচট খেলে আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) তাকে সোজা করে দিলেন এবং একটা জায়গায় উপরে উঠার জন্য আব্দুল কাদের জিলানীর (রহ.) ঘাড়ে পা রেখে উপরে উঠার জন্য স্পেশাল হেল্পের প্রয়োজন পড়ল। ঐ রাতে আল্লাহর কি মইয়ের খুবই অভাব ছিল। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ কি এতোই disorganized যে দাওয়াত করে একজন গেষ্টকে নিচ্ছেন তার সাথে দেখা করাতে আর তার জন্য কোন ভাল ব্যবস্থা

রাখেন নাই যার কারণে গেষ্ট রাস্তা-ঘাটে হোচট খাচ্ছেন আর মইয়ের অভাবে উপরে উঠতে পারছেন না! (নাউযুবিল্লাহ) ।

বিশেষ গল্প ২ ঃ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-কে পীরানে পীর 'দস্তগীর' উপাধিতে ডাকা হয় । দস্তগীর অর্থ ধরে উত্তলন করা । এর বিভ্রান্ত ইতিহাস হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা যখন সর্বপ্রথমে জান্নাত তৈরী করলেন তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে জান্নাতটা কেমন হলো তা পরিদর্শন করবেন । তিনি একা পরিদর্শন না করে কাউকে সাথে নিয়ে পরির্দশন করার মনস্থির করলেন । কিন্তু কাকে নিয়ে করবেন? পরে চিন্তা করলেন তাঁর প্রিয় পাত্র আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-কে নিয়ে পরিদর্শন করবেন । যখন তারা দু'জনে জান্নাত পরিদর্শন করছিলেন তখন কে যেন কলা খেয়ে কলার ছোলা জান্নাতের ফ্লোরে ফেলে রেখেছে! আল্লাহ তা'আলা হাটতে হাটতে হঠাৎ ঐ কলার ছোলার মধ্যে পা পিছলে পরে যেতে নিয়েছিলেন, আর ঐ মুহূর্তে আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) আল্লাহর হাত ধরে টেনে তুলেছেন । (নাউযুবিল্লাহ) তারপর খুশি হয়ে আল্লাহ তা'আলা আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-কে উপাধি দিয়েছেন 'দস্তগীর' । (নাউযুবিল্লাহ)

গল্পের বিশ্লেষণ ঃ এবার আসুন দেখি গল্পের নমুনা, আল্লাহ তা'আলার কি জান্নাত সরজমিনে পরির্দশন করে দেখতে হয়? পরিদর্শনের জন্য সাথী হিসেবে আর কাউকে পেলেন না! আর কেইবা জান্নাতের ফ্লোরে কলা খেয়ে ছোলা ফেলল! আল্লাহ তা'আলা হাটতে গিয়ে কলার ছোলাটা পর্যন্ত দেখলেন না! (নাউযুবিল্লাহ)

এই ধরনের চিন্তা করাই নিষেধ । তাই এই সকল কল্পকাহিনী থেকে খুবই সাবধান থাকতে হবে যা আমাদের মূল আকীদা বা ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে ।

আমরা যদি রসূল ﷺ এবং সাহাবীদের বিস্তারিত জীবনী পড়ি তাহলে দেখতে পাই যে আব্দুর কাদের জিলানী (রহ.) যতো কারামত দেখিয়েছেন তার এক অংশও রসূল ﷺ এবং তাঁর কোন সাহাবী দেখাতে পারেননি । রসূল ﷺ কোনদিন মরা মানুষ জীবিত করেননি যদি করতে পারতেন তাহলে তিনি যুদ্ধে অনেক প্রিয় সাহাবীদেরকে হারিয়েছেন এবং তাদেরকে আবার জীবিত করে নিতে পারতেন নিজের দলের শক্তি বাড়ানোর জন্য । যেমন ওহুদের যুদ্ধে চাচা হামজা (রা.)-কে হারিয়ে তিনি প্রচন্ড কষ্ট পেয়েছিলেন আবার প্রিয় স্ত্রী খাদিজা (রা.)-র মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, তিনি কি তাদেরকে জীবিত করতে পারতেন না? রসূল ﷺ -এর কি আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর চেয়ে বেশী ক্ষমতা ছিল না?

বাস্তবে দেখা যায় জ্ঞানের অভাবে অনেক ভক্তরাই বিভিন্ন ওলীদেরকে বা বুজুর্গদেরকে বা পীরদেরকে নাবী-রসূল এবং সাহাবীদের উর্ধ্বে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে নাবী-রসূলরা তাদের নিজ নিজ স্থানে মর্যাদাবান, কোন সাহাবী তাদের মর্যাদার কাছে যেতে পারবেন না। আবার সাহাবীরা তাদের নিজ নিজ স্থানে মর্যাদাবান, কোন তাবীঈ তাদের মর্যাদার কাছে যেতে পারবেন না। ঠিক তেমনি তাবীঈরা তাদের নিজ নিজ স্থানে মর্যাদাবান, কোন ওলীই তাদের মর্যাদার কাছে যেতে পারবেন না।

সতর্কতা ঃ একটা কথা সব সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আল্লাহ ছাড়া কারো কিছু করার বা দেয়ার ক্ষমতা নেই, সে যতো বড় ওলি বা বুজুর্গই হোক না কেন। আমার ভাগ্যের পরিবর্তন যেমন ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রোমোশন, সন্তান-সন্ততি, বাড়ি-গাড়ি, রোগ-মুক্তি, আয়-উন্নতি, ব্যাংক ব্যাল্যান্স, ফসলের উন্নতি, পরীক্ষায় ভাল রিজাল্ট, স্বামী-স্ত্রীর মিল, বিদেশ গমন, আমেরিকার কাগজ প্রাপ্তি ইত্যাদি কোন পীর-মুর্শেদ বা কোন মাযার দিতে পারবে না। আর আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো (গায়রুল্লাহর) কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশায় কোথাও যাই তাহলে সেটা হবে সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক। আমার যা কিছু চাওয়ার সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং ইন্‌শাআল্লাহ, আল্লাহ আমাকে দিবেন।

কারো মাধ্যমে দু'আ করা শিরক

দু'আ কবুলের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই ঃ দু'আ ঈমান গভীরতর করে এবং আল্লাহর তাওহীদ ও সর্বময় ক্ষমতার প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে শিরকে আকবার (সবচেয়ে বড় এবং জঘন্যতম শিরক।) আমরা জ্ঞানের অভাবে মনে করি যে ওমুক হুজুর বা পীর বা বুজুর্গ আমার জন্য দু'আ করলে আল্লাহ শুনবেন, এই ধরনের কথা ভুল, কুরআন-হাদীসে এর কোন দলিল নেই। আর আমরা যদি মনে করি যে ওমুক হুজুর বা পীরসাহেবের দু'আ কুবল হয়, তার সাথে আল্লাহর সরাসরি যোগযোগ আছে, তার স্পেশাল পাওয়ার আছে তাহলেই সেখানে শিরক হবে। আবার আমরা অনেকেই মনে করি যে আমি চাইলে আল্লাহ নাও শুনতে পারেন, ওমুক হুজুরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে হয়তো মনের আশা পুরণ হবে, এই ধরনের ধারণা একেবারেই ভুল।

এমনকি রসূল ﷺ -এর মাধ্যমেও আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যাবে না এবং রসূল ﷺ -এর কাছেও কিছু চাওয়া যাবে না।

দু'আ হচ্ছে আল্লাহর সংগে বান্দার সরাসরি যোগাযোগ যেখানে কোন প্রকার মধ্যস্থতার বা মাধ্যমের (intermediary-র) প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহ তাঁর কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন যে 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো' [উদ্ উনী আস্তাজিবলাকুম ঃ সূরা মু'মিন ঃ ৬০]। এবং বান্দা যখন সলাতে থাকে তখন তার সাথে আল্লাহর সরাসরি যোগাযোগ হয়ে যায়।

শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত দু'আর হাত থেকে আত্মরক্ষা ঃ আমরা অনেক সময় না জানার কারণে বিভিন্ন নিয়মে দু'আ করে থাকি যা অনেক সময় শিরক বা বিদ'আত মিশ্রিত হয়ে যায়।

নিম্নের বাস্তব উদাহরণগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে এখানে সরাসরি আল্লাহর কাছে দু'আ করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু মাঝখানে একটা উসিলা যোগ করা হচ্ছে, তাই এই দু'আর ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও শিরক হচ্ছে আবার কোথাও কোথাও বিদ'আত হচ্ছে। যেমন ঃ

- হে আল্লাহ! এই মাহফিলে যার হাত তোমার পছন্দ হয় তার উসিলায় তুমি আমাদের সবার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! এই মাহফিলে একজন বৃদ্ধ মুরুব্বী আছেন তার উসিলায় তুমি আমাদের সবার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! এই মাহফিলে একজন বেগুনা মাসুম বাচ্চা আছে তার উসিলায় তুমি আমাদের সবার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! আমরা এতক্ষণ তোমার পেয়ারা দোস্ত মুহাম্মদ ﷺ -এর শানে নাথে রসূল পাঠ করলাম এর উসিলায় তুমি আমাদের দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! এই মাহফিলে আমরা যা দু'আ-দুরূদ পাঠ করলাম তা বকশে দাও এবং এর উসিলায় তুমি আমাদের সবার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! এই মিলাদ মাহফিলের সবার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! এই মাযারের উসিলায় তুমি আমার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! এই কবরের উসিলায় তুমি আমাদের সবার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! উপরে তুমি আর নিচে আমার পীরসাহেব, তুমি আমার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! তুমি তোমার ওলির উসিলায় আমার দু'আ কবুল কর।

- হে আল্লাহ! তুমি আমার মোরশেদ পীর কেবলা বাবার উসিলায় আমার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! এই আরাফাতের ময়দানে তুমি নাবী মুহাম্মদ ﷺ -এর নামের উসিলায় আদম (আ.)-এর দু'আ কবুল করেছো, তাদের উসিলায় আমার দু'আও কবুল করো।
- হে আল্লাহ! তুমি তোমার বন্ধু মুহাম্মদ ﷺ -এর উসিলায় আমার দু'আ কবুল কর।
- হে আল্লাহ! এই করবে যিনি শুয়ে আছেন তাকে মাফ করো এবং তার উসিলায় আমাদেরকেও মাফ করো।

নিম্নের দু'আগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে এখানে মাযার বা হুজুরের নিকট কোন কিছু চাওয়ার মাধ্যমে সরাসরি শিরক করা হচ্ছে। যেমন ঃ

- হে খাজা বাবা আপনি আমাকে সন্তান দিন।
- হে গরীবে নেওয়াজ, আপনি আমাকে একটি পুত্র সন্তান দিন।
- হে শাহজালাল বাবা আপনি আমার মনের আশা পুরণ করুন।
- হে গাউসুল আজম, আপনি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন।
- হুজুর আপনি আমাকে চাকুরীতে প্রোমোশনের ব্যবস্থা করে দিন, ব্যবসায় উন্নতি দিন।
- হে আল্লাহর ওলি, আপনি আমার সংসারে সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা করে দিন।
- হুজুর আমি অনেক বড় বিপদে পরেছি, আমাকে এই মহা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করুন।
- হুজুর আপনি আমাকে একটু দয়া করুন, আপনার কাছে করুণা ভিক্ষা চাই।
- হে দয়াল বাবা, আপনি আমার দিকে একটু দয়ার দৃষ্টিতে তাকান।
- হুজুর, আগে আল্লাহ পরে আপনি, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন।
- হুজুর আপনি আছেন বলে আমার রক্ষা, আমাকে দয়া করুন।
- হুজুর আপনার দু'আ ছাড়া পরকালে পার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই।
- হুজুর আমাদের আর কিছু প্রয়োজন নেই, আমরা শুধু আপনার দু'আ চাই।
- হুজুর আমাদের জান্নাত প্রয়োজন নেই, আপনি যেখানে যাবেন আমরা সেখানেই যাব, আপনি যদি দোযখে যান আমরাও দোযখেই যাবো।

হাজ্জ করতে গিয়ে নানারকম শিরক

হাজ্জে গিয়ে অনেকে অধিক নেকী ও দু'আ কবুলের আশায় হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামানী, কাবার দরজা, কাবার গিলাফ প্রভৃতির মধ্যে মুখ-বুক লাগিয়ে ঘসা-ঘসি করেন। কিছু পাওয়ার আশায় কাবার গিলাফের সুতা ছিড়ে নিয়ে আসেন। উচ্চঃস্বরে কান্নাকাটি করেন ও প্রচণ্ড ভিড় করে অন্যদের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটান ও কষ্ট দেন। মনে রাখতে হবে এতে দু'আ কবুলতো দুরের কথা বরং গুনাহ হবে। আর এধরনের কাজ ইসলাম বিরোধী এবং বিদ'আত। কারো দেখাদেখি এই ধরনের কাজ থেকে সাবধান থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে ঃ

- আমরা কাবা ঘরকে সিজদা করি না বা কাবা ঘরের ইবাদত করি না।
- কাবা ঘরের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবা ঘরের দেয়ালের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার গিলাফের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার দরজার কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার হাতীমের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- হাজরে আসওয়াদের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবা ঘরের কোন কর্ণারের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- মাকামে ইব্রাহিমের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- জমজমের কুপের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- সাফা-মারওয়া পাহাড়ের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার ইমাম সাহেবের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- মক্কা বা মদীনার মাটির কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- বাকী কবরস্থানের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।

আমরা যদি মনে করি উপরের এই লিষ্টের কারো কোন বিন্দু পরিমাণও ক্ষমতা বা পাওয়ার আছে তাহলে তা হবে শিরক। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা ইবাদত করি একমাত্র মহান আল্লাহর এবং সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। যা কিছু চাওয়ার আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। কাবা হচ্ছে আল্লাহকে সিজদা করার দিক নির্দেশনা অর্থাৎ কিবলা। মক্কার কাবার আগে কিবলা ছিল জেরুজালেমের মাসজিদে আকসা।

জায়নামাযের মধ্যে কাবার ছবি থাকে, এটি বিদ'আত। কাবাকে কল্পনা করে সলাত আদায় ঠিক না, মনে করতে হবে আল্লাহ আমার সামনে। জায়নামাযের কাবার ছবির উপর পাড়া লাগলে অনেকে সালাম করেন বা গুনাহ হবে মনে করেন, এটিও বিদ'আত। কারণ কাবাঘর পা দিয়ে পাড়া দিলে কিছুই হবে না। যারা কাবা ঘর পরিষ্কার করতে ভিতরে ঢুকেন তারা তো কাবা ঘর পা দিয়ে পাড়ান আবার যারা কাবার গিলাফ পরিবর্তন করেন তারাও কাবার উপরে উঠে কাবার উপর তা করেন। রসূল ﷺ -এর যুগে মক্কা বিজয়ের দিন বিলাল (রা.) কাবার ছাদে দাড়িয়ে আযান দিয়েছিলেন।

কাবা নিয়ে পীরসাহেবদের নানারকম শিরক

কোন কোন 'ওলি বা পীরের ক্বলবের মধ্যে কাবা' এই ধরনের কথা সম্পূর্ণ ভুল এবং শিরক। পীরসাহেবরা তাদের উপধি নিয়েছেন 'পীর কেবলা'। 'যেই কাবা সেই আল্লাহ' এই ধরনের কথা সুস্পষ্ট শিরক। মনে রাখতে হবে মুসলিমদের কিবলা একটাই আর তা হচ্ছে মক্কার কাবা। পীরসাহেবের ভিতরে কোন কাবা নেই এবং অবশ্যই তিনি কারো কিবলা নন।

আমাদের এক আত্মীয় আছেন পীরসাহেব। আমরা হাজ্জ করে মক্কা থেকে ফেরার পরে ঐ পীরসাহেব খুব রেগে গিয়েছিলেন। তার কথা হচ্ছে হাজ্জ করার জন্য মক্কায় যেতে হবে কেন? হাজ্জ করতে হবে ঘরে বসেই, আর তা হবে রূহানী জগতের মাধ্যমে। পীরসাহেবের ক্বলবের মধ্যেই তো কাবা ঘরের স্থান, আর পীরসাহেবকে সেবা-যত্নের মাধ্যমেই মুরীদের হাজ্জ পালন হয়ে যাবে। আবার পীরসাহেব আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন আছ? আমরা উত্তর দিয়েছিলাম "আলহাম্‌দুলিল্লাহ্" তাও তিনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তার কথা হচ্ছে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো কেমন আছ? তোমরা উত্তরে বলবে, ভাল আছি। কিন্তু তোমরা বলছ অন্য কথা, "আলহাম্‌দুলিল্লাহ্ = সকল প্রশংসা আল্লাহর। সঠিক উত্তর না দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করছ, এটা কেমন কথা"? যেমন একটি বিখ্যাত মারফতি গানঃ

দয়াল বাবা কেবলা কাবা আয়নার কারিগর
আয়না বাসাইয়া দে মোর ক্বলবের ভিতর
বাবা আমার আল হাক্বকানী
বেলায়েতের হইলো খনি..... ।

পীরের অনুমতি ছাড়া ফরয হাজ্জ পালন না করা শিরক

পীর কেবলার অনুমতি না পেলে ফরয হাজ্জে যাওয়া যাবে না এই ধরনের আকীদা শিরক। এখানে হাজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হাজ্জ পালন না করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হচ্ছে এবং পীর বাবার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে সরাসরি শিরক করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহর কোন ফরয হুকুম পালন করার জন্য পীর-আওলিয়ার কোন অনুমতির তো প্রশ্নই উঠে না। এমনকি যে কোন ফরয হুকুম পালন করার জন্য কোন নাবী-রসূলেরও অনুমতির প্রয়োজন নেই, কারণ আদেশটা তার বান্দার জন্য সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আরাফা নিয়ে মিথ্যা গল্প এবং শিরকী আকীদা

আরাফা নিয়ে বাজারে কিছু গল্প প্রচলিত রয়েছে, যার সহীহ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। অনেক হুজুররা সেই গল্প হাজীদেরকে আরাফায় গিয়ে খুব গুরুত্বসহকারে শুনিয়ে থাকেন। যেমন ঃ 'আল্লাহ আদম (আ.)-কে এই আরাফায় ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কারণ আদম (আ.) জান্নাত থেকে বিতারিত হওয়ার পর দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করছিলেন কিন্তু আল্লাহ ক্ষমা করছিলেন না। একদিন তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করছিলেন, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এই নাম কিভাবে জানলে? তখন আদম (আ.) উত্তরে বলেছিলেন আমি যখন জান্নাতে ছিলাম তখন সেখানে লিখা দেখেছি। তখন নাকি আল্লাহ সেই নামের উছিলায় আদম (আ.)-কে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।' এই ধরনের বানোয়াট গল্পের কোন ভিত্তি নেই। কে যে এই গল্প বানিয়েছে আল্লাহই ভাল জানেন! এই ধরনের আকীদা (বিশ্বাস) শিরক এবং বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

গরম মাযারের রহস্য এবং শিরক
(শাহ পরাণ ও শাহ জালাল মামা-ভাগিনা রহ.)

ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি যে শাহ পরাণের মাযার শরীফ খুব গরম! শাহ জালাল ছিলেন মামা আর শাহ পরাণ ছিলেন ভাগিনা! দুইজনই আউলিয়া, একজন নরম আর একজন গরম! প্রথম দিকে মামা ভাগিনা একসাথেই থাকতেন কিন্তু কিছু দিন পর মামা বুঝতে পারলেন যে ভাগিনার ক্ষমতা প্রচন্ড গরম! তাই মামা একদিন ভাগিনাকে ডেকে বললেন, তুমি আর আমার সাথে থাকতে পারবে

না, তুমি অন্যত্র চলে যাও! তখন ভাগিনা জিজ্ঞেস করলেন আমি কোথায় যাবো? তারপর মামা তার হাতের লাঠিটা ছুড়ে মারলেন এবং লাঠিটা গিয়ে যেই পাহাড়ে পড়লো সেখানেই তার আস্তানা নির্ধারিত হলো! এরপর থেকে শাহ পরাণ ঐ পাহাড়েই অবস্থান করতেন এবং ধ্যান করতেন! মামার ছুড়ে দেয়া লাঠিটি যেখানে পরেছে সেই লাঠিটি একসময় মাটি থেকে গাছ হয়েছে এবং সেই অলৌকিক গাছ আজো নাকি আছে শাহ পরাণের মাজারের উপরে! এই গাছের ফল যার গায়ে পরবে তার ভাগ্য খুলে যাবে, যার সন্তান নেই তার সন্তান হবে! আমরা শুনেছি যে, মুনাজাত করার সময় নিঃসন্তান এরশাদের গায়ের উপর নাকি এই গাছের ফল পরেছিল তাই তার সন্তান হয়েছে! (নাউযুবিল্লাহ)

বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে আরেকটি ঘটনা প্রচলিত আছে যে, অনেক আগের জামানার এক বিখ্যাত নায়ক রহমান নাকি এই গরম মাযারের সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং গাড়ি থামিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেননি বলে তিনি গাড়ি এক্সিডেন্ট করে একটি পা হারিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

আমাদের আকীদার জ্ঞান না থাকার আগের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ঃ আমরা একবার সিলেট গিয়েছিলাম কোন কাজে, তারপর মনে হলো সিলেটে এসেছি আর যদি মাযারে না যাই তাহলে ক্ষতি হতে পারে। তাই কাছেই ছিল শাহজালাল (রহ.)-এর মাযার সেখানে গেলাম, তারপর সেখানে গিয়ে মনে হল মাযারে টাকা না দিলে হয়তো ক্ষতি হতে পারে তারপর খাদেমের হাতে টাকা দিলাম যিনি একটি ডেগ নিয়ে বসে আছেন। সকল কাজ সেরে যখন ঢাকায় ফিরে আসলাম তার এক-দুইদিন পরে শরীরটা কোন কারণে একটু খারাপ লাগছিল। তখন ভয় হলো যে গরম মাযারে তো যাইনি অর্থাৎ শাহ পরাণ (রহ.)-এর মাযারে তো যাওয়া হয়নি, মনে হয় এই কারণে বাবা রাগ করেছেন আর শাস্তি দিচ্ছেন।

আমরা যে শিক্ষণীয় ঘটনা তুলে ধরলাম এখানে প্রতি পদে পদে শিরক হয়েছে। যেমন ঃ ১) মাযারে না গেলে ক্ষতি হতে পারে ২) মাযারে টাকা না দিলে ক্ষতি হতে পারে ৩) শাহ পরাণের মাযারে না যাওয়ার কারণে অসুস্থ লাগছে ৪) বাবা নারাজ হয়ে একশান নিচ্ছেন ৫) শাহ পরাণের মাযার খুব গরম, এদিক-সেদিক হলেই ক্ষতি হতে পারে ৬) ক্ষতি হওয়ার ভয়ে শাহ পরাণের মাযার থেকে ফিরার সময় উল্টো হয়ে বের হওয়া। শাহ পরাণ (রহ.) ও শাহ জালাল (রহ.)-কে ঘিরে কতো যে শিরকি গান আছে তার কোন সীমা নেই, যেমন একটি গান ঃ

ইয়া শাহ পরাণ, তুমি আওলিয়ার সর্দার
আর কত পাপি তাপিরে তুমি করেছো উদ্ধার
ও শাহ পরাণ, ও শাহ পরাণ
কুদরত কা মাল বাবা দূলে দালাল
তোমাই পাইয়া সিলেটবাসি হইয়া গেল লালে লাল
তুমি কুদরতে কা মাল, লালে লাল গুলেজালাল ।

গুলিস্তানে গোলাপ শাহর মাযার এবং শিরক

আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি ঢাকার গুলিস্তানে চৌরাস্তার মাঝে একটি মাযার এবং তার সাথে মসজিদ । এই মাযারের কারণে ঐ স্থানে সবসময় প্রচন্ড ট্রাফিক জ্যাম লেগেই থাকে । একারণে দীর্ঘ দিন ধরে বাস ড্রাইভাররা এই মাযার সরানোর জন্য দাবী পেশ করে আসছিল কিন্তু মাযারের ভয়ে কোন অথরিটিই এই দায়-দায়িত্ব নিচ্ছিলেন না । যাহোক এরশাদ সরকারের আমলে ঐ স্থান থেকে মসজিদটি ভেঙ্গে পাশের পার্কে পূনর্নির্মাণ করা হয় কিন্তু মাযারটি রোডের মাঝখানেই রয়ে যায় । তৎকালীন সময়ে হাফিজি হুজুর মন্তব্য করেছিলেন যে আমরা মসজিদ ভাঙ্গতে দ্বিধাবোধ করি না কিন্তু মাযার ভাংতে ভয় পাই । এই মাযারটি রোডের মাঝখানে এবং মনোবাসনা পূরণের আশায় লোকজন চারিদিক থেকে সেখানে টাকা-পয়সা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দেয়, অনেকে আবার ঐ রাস্তা দিয়ে ক্রস করার সময় ভয়ে টাকা-পয়সা দেয় এজন্য যে, যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায়! টাকা না দিলে বাবা যদি মনঃক্ষুন্ন হন! ইউটিউবে দেখা যায় সেখানে মহিলা-পুরুষ নিয়মিত সাজদা করছে । (নাউযুবিল্লাহ) আমরা যদি একটু কমোনসেন্স খাটাই যে এই টাকা আমি কাকে দিচ্ছি? কেন দিচ্ছি? বাবা তো এই টাকা পাচ্ছেন না বা এই টাকা দিয়ে তিনি কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মসজিদ, ইয়াতিমখানা, স্কুল, কলেজ বা হাসপাতাল ইত্যাদি কোন জনকল্যাণমুলক কাজও করছেন না । যিনি কবরে শুয়ে আছেন তিনি তো এই কোটি কোটি টাকার খবর জানেনই না! এমনকি এই টাকার অংশ সরকারও পাচ্ছে না!

বায়েজীদ বোস্তামীর শিরকী আকীদা

বায়েজীদ বোস্তামীকে নিয়ে বাজারে নানা রকম মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে, তার মধ্যে তার ওলী হওয়ার আজগুবি গল্পটি আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত । একদিন বায়েজীদের মা গভীর রাতে পানি চাইলেন । বায়েজীদ দেখে বাড়ীতে

পানি নেই। দৌড়ে পানি আনতে চলে গেল। পানি নিয়ে এসে দেখে মা তার ঘুমিয়ে গেছেন। বায়েজীদ চিন্তা করে, এখন কি করি? আমি যদি গ্লাস রেখে ঘুমিয়ে যাই আমার মা যদি আবার রাতের কোন অংশে পানি চান আর আমি যদি নির্ধারিত সময়ে পানি দিতে না পারি তাহলে আমি উপযুক্ত সন্তান হতে পারব না। এই বলে বায়েজীদ গ্লাস হাতে করে মায়ের মাথার পাশে দাড়িয়ে রইল। সকাল হয়ে মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা দেখেন পাশে বায়েজীদ দাঁড়িয়ে আছে। মা জিজ্ঞেস করলেন, বাবা তুমি কেন দাঁড়িয়ে আছ? আম্মা আপনি সন্ধ্যা রাতে পানি চেয়েছিলেন দেখি বাড়ীতে পানি নেই। দূরে পানি আনতে চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি আপনি ঘুমিয়ে গেছেন। আমি চিন্তা করলাম গ্লাস রেখে যদি ঘুমিয়ে যাই আর আপনি যদি রাতে আবার পানি চান উপযুক্ত সময়ে পানি দিতে পারব না। আমি উপযুক্ত সন্তান হতে পারব না। এই জন্য আমি গ্লাস হাতে করে আপনার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মা গ্লাসটা হাতে করে পানিটুকু পান করে নিয়ে বাচ্চাকে শুয়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে লাগলেন- প্রতিপালক আমি বায়েজীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। তুমি বায়েজীদকে কবুল করে নাও। বায়েজীদকে বড় আলেম করে দাও। মায়ের দু'আ কবুল হয়ে গেল। মায়ের দু'আ কবুল হয়ে যদি বায়েজীদ বড় আলেম হতেন তাহলে বায়েজীদ একথা বলতেন না, আল্লাহকে আমি খুঁজলাম আল্লাহকে কোথাও পেলাম না। আল্লাহ কোথায়? কোথাও পেলাম না। অনেক খোজাখুজি করলাম। তারপর দেখি আমি নিজেই আল্লাহ। (নাউযুবিল্লাহ) যাদের নিয়ে এই বাউল ফকিরের দর্শন চালু হয়েছে তাদের মধ্যে বায়েজীদ একজন।

হায়দার বাবার রহস্য এবং শিরক

আমরা দীর্ঘদিন ধরে মুহাম্মাদপুরে দেখে আসছি যে এ লোক শুধু হাটেন, কারো সাথে কোন কথা বলেন না। তার পেছনে পেছনে দল বেধে কিছু মহিলা-পুরুষও হাটেন। অনেকের ধারণা এই লোক দরবেশ, আল্লাহর ওলী, তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে! সে কারো সাথে কথা বলে না কিন্তু কারো দিকে যদি দৃষ্টি দেয় তাহলে তার নাকি ভাগ্য খুলে যায়! এখন প্রশ্ন কে এই হায়দার বাবা? কী তার পরিচয়? কেউ তাকে থাকার যায়গা দিলে সেখানে তিনি থাকেন না, যিনি গোসল করেন না, ওযূ করেন না, চুল-দারি-নখ কাটেন না, দাঁত মাজেন না, রাস্তার পাশেই প্রাকৃতিক ডাকে সারা দিয়ে বসে যান, পায়খানা-প্রশ্রাব করে পানি নেন

না, নামায পড়েন না, রোযা রাখেন না, দ্বীন ইসলামের কোন ফরয, ওয়াযিব, সুন্নাত, নফল কোনটাই পালন করেন না! সে কেমন ওলী?

একজন মানুষকে সর্বপ্রথমে মুসলিম হওয়ার জন্য ইসলামের ফরয হুকুমগুলো পালন করতে হবে। যাহোক, সম্মানিত পাঠক, আমাদের এই লিখা পড়ে কেউ রেগে যাবেন না বা আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না। আসুন আমরা বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করি। আমরা যারা আমেরিকা-ক্যানডায় থাকি তারা এই চিত্র প্রায়ই দেখি। এখানেও এই শ্রেণীর লোক আছেন যারা সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, ওযূ-গোসল করে না, হাত-মুখ ধোয় না, দাঁত ব্রাস করে না, রাস্তার পাশেই প্রাকৃতিক ডাকে সারা দিয়ে বসে যান, পায়খানা-প্রশ্রাব করে পানি নেয় না, কোন বাড়ি-ঘর নেই, যেখানে রাত সেখানেই কাত। সরকার প্রায়ই এদেরকে ধরে নিয়ে শেলটারে দিয়ে আসে, সেখানে ভাল খাবার দেয়, ঘুমানোর ভাল বিছানা দেয়, কিন্তু সেখানে তারা থাকেন না, সুযোগ পেলেই সেখান থেকে চলে আসেন। এই দেশে এদেরকে বলে ভবঘুরে বা হোমলেস, মেডিক্যাল সায়েন্স গবেষণা করে দেখেছে যে এরা মানসিকভাবে অসুস্থ অর্থাৎ মানসিক প্রতিবন্ধি।

এখানে আকীদার শিক্ষা ঃ ইসলামে আকীদার বিষয়টি খুব সুক্ষ্ম। এবার খুব গভীরে আকীদার বিষয়টি বাস্তবে দেখা যাক। এই বিষয় নিয়ে মুহাম্মাদপুরে বসবাসরত আমাদের খুব ঘনিষ্ট এক বড় ভায়ের সাথে কথা হচ্ছিল, মুহাম্মাদপুরে প্রায় সকলেরই বিশ্বাস হায়দার বাবা একজন আল্লাহর ওলী, তিনিও তাই বিশ্বাস করতেন। ফিরোজ ভাই প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে বুঝলেন এবং ওলীর বিষয়টাও বুঝলেন, সব মানলেন যে তার মধ্যে কোন পাওয়ার আছে এটা মনে করলে শিরক হবে কিন্তু তারপরও তিনি হায়দার বাবার বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চান না, তিনি ভয় পাচ্ছেন যে, যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায়! (নাউযুবিল্লাহ) এখানেই আকীদার সুক্ষ্ম পরিচয়, সব মানি কিন্তু তারপরও মনের মধ্যে একটা ভয়।

চুলের জট, চটের বস্তা, শিকল-এর রহস্য এবং শিরক

আমরা যদি কারো মাথায় চুলের জট দেখি তাকে দরবেশ মনে করি। এদেরকে সাধারণত হাইকোর্টের মাযার, মিরপুর শাহ আলীর মাযার, বায়জিদ বোস্তামীর মাযার, শাহ জালালের মাযার, খান জাহান আলীর মাযার, বার আউলিয়ার মাযার এবং অন্যান্য মাযারগুলোতে দেখা যায়। এরা অনেক সময় চটের বস্তা, তালি দেয়া কাপড় পরে থাকে আবার লোহার শিকল গায়ে জড়িয়ে রাখে। এরা

সাধারণত মানুষের সাথে তুই-তোকারি করে কথা বলে। হঠাৎ সামনে এসে বলবে 'দে... তা না হইলে ক্ষতি হইয়া যাবে....'। এরা চোখ বড় বড় করে তাকায়, এদের চুল-দাঁড়ি-মোছ থাকে লম্বা এবং উস্‌কো-খুস্‌কো। এদের রহস্য কী? এরা কারা? আসলে এরাও এক প্রকারের মানসিক অসুস্থ, তবে জাতে মাতাল তালে ঠিক অর্থাৎ ফ্রড। এরা টাকা-পয়সা চিনে, মেয়ে মানুষ চিনে, গাজা-চরস ইত্যাদি মাদক দ্রব্য চিনে। অনেক মাজারের পাশেই রাতভর চলে এদের আড্ডা এবং অনৈতিক কর্মকান্ড। এরা মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এই রকম অভিনয় করে মানুষকে বোকা বানিয়ে তাদের থেকে স্বার্থ হাসিল করে। ইসলামে এই জাতীয় ওলীর কোন সন্ধানও নেই স্থানও নেই।

মাথায় চুলের জটের রহস্য হচ্ছে, এর সাথে অলৌকিতার সম্পর্ক নেই, এটা মানুষের চুলের প্রকৃতগত ধরন। আমরা যারা আমেরিকা-ক্যানাডায় থাকি তারা উঠতে বসতে এখানে বিদেশীদের মাথায় চুলে ঝট দেখি। এটা আবহাওয়ার কারণে হয়। এই চুলের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা বাংলাদেশে এই দৃশ্য দেখি না বলে হঠাৎ দুই একটা দেখলে তাকে স্পেশাল কিছু মনে হয়, তাকে দরবেশ মনে করি, মনে করি সে স্বপ্নে এটা পেয়েছে।

উয়াইস করনীর দাঁত ভাঙ্গার গল্প এবং শিরক

উসাইর ইবনু জাবির (রা.) থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে তার প্রকৃত নাম উয়াইস ইবনু আমির, তিনি ইয়ামানে বসবাস করতেন, তিনি নাবী ﷺ -কে কোনদিন দেখেননি এবং নাবী ﷺ -ও তাকে কোনদিন দেখেননি, তিনি ছিলেন তাবিঈ। রসূল ﷺ তার সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বানী করেছিলেন কারণ তিনি তার মার খুব অনুগত ছিলেন এবং তার সেবাযত্ন করতেন, এজন্য আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওমর (রা.)-র যুগে তিনি কুফা যাওয়ার পথে মদীনায় আসেন এবং ওমর (রা.) তার থেকে দু'আ নেন। ওমর (রা.) উয়াইস করনীর থেকে দু'আ নিয়েছেন এতো বিরাট ঘটনা, এই সুযোগ পেয়ে গেল সূফী লোকেরা, তাকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল নানারকম গল্প। বাজারে কিছু কিছু বইয়ে এবং বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে এই উয়াইস করনীর নানারকম উদ্ভট গল্প-কাহিনী এবং তার ক্ষমতার কথা শোনা যায় যা ইসলামে দৃষ্টিতে খুবই আপত্তিকর। বাজারে প্রচলিত অনেক গল্পের মধ্যে একটি হলো উয়াইস করনী আল্লাহর রসূল ﷺ -কে এতো ভালবাসতেন যে, ওহুদের যুদ্ধে আল্লাহর রসূল ﷺ যখন দাঁত হারালেন সেই খবর পেয়ে উয়াইস করনী কোন দাঁত ভেঙ্গেছিল সেটা বুঝতে না

পেরে পাথর দিয়ে তার নিজের সব দাঁতগুলো এক এক করে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। এখন প্রশ্ন তিনি তো সাহাবী ছিলেন না যেহেতু তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ -কে দেখেনি। ইসলামে আল্লাহর রসূল ﷺ -এর পরে যাদের স্থান হাজার হাজার সাহাবী আল্লাহর রসূল ﷺ -এর সাথে ওহুদের যুদ্ধ করেছেন তারা তো কেউ এই খবর শুনে দাঁত ভাঙ্গেননি। তারা তো আল্লাহর রসূল ﷺ -কে আরো বেশী ভালবাসতেন। আল্লাহর রসূল ﷺ যদি ওহুদের যুদ্ধে মারা যেতেন তাহলে কি উয়াইস করনী রসূল ﷺ -এর ভালবাসায় নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করে ফেলতেন? আমরা জানি এগুলো ইসলামের কোন কাজ নয়, ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, এগুলো মুখরোচক গল্প।

ফানাফিল্লাহর রহস্য এবং শিরক

বাংলাদেশের বিখ্যাত পীরদের অজিফাতে রয়েছে যাতে বর্ণনা আছে কিভাবে এই অজিফা পড়ে আল্লাহতে পরিণত হওয়া যায়। তা এখানে তুলে ধরা হলো ঃ ফানাফিল্লাহ অর্থ আল্লাহতে বিলুপ্তি। ফানা একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা। যে অবস্থায় সূফী সাধক আধ্যাত্মিক উন্নতির এক চরম পর্যায়ে আরোহণ করে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের সাথে নিজের সর্বস্ব বিলীন করে দেন। ফানার পর্যায়ে সাধকের ব্যক্তিগত সত্ত্বা বলে আর কিছুই থাকে না। যেহেতু তার সমস্ত অযুত অস্তিত্বই তখন আল্লাহতে বিলীন এই অবস্থায় সাধকের ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারই প্রতিফলন মাত্র। যে সাধক এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় তার আর সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, ওযূ, গোসল, পড়নের কাপড় ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। (নাউযুবিল্লাহ)

মনসুর হাল্লাযের আল্লাহ দাবী এবং শিরক

ইতিহাসে মনসুর হাল্লায এক বিতর্কিত নাম যিনি নিজেকে 'আনাল হক্ব' বলে দাবি করেছিলেন এর অর্থ 'আমি আল্লাহ'। হলুল শব্দ থেকে এটা এসেছে, তার মানে তিনি আল্লাহর ভিতর ঢুকে পরেছেন। তার পুরো নাম আবু মুগিদ আল হোসাইন ইবনে মনসুর আল হাল্লায। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২২৪ হিযরী (৮৫৭ খ্রষ্টাব্দে) দক্ষিন পারস্যে। সুতার ব্যবসায়ীকে হাল্লায বলে, তার বাবার সুতার ব্যবসা ছিল সেখান থেকে তার নামের সাথে হাল্লায যুক্ত হয়েছে। ১৮ বছর বয়সে তিনি ইরাকের বসরা যান এবং যুনায়েদ বুগদাদীর এক সাথীর শিষ্য হন। নিজেকে আল্লাহ দাবী করার কারণে তৎকালীন সকল ওলামা তার বিরুদ্ধে

ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং তৎকালীন সরকার তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন (২৮শে মার্চ ৯১৩ ইং)। সূফীরা এই মনসুর হাল্লাযকে বিশেষ আধ্যাত্মিক চোখে দেখে থাকেন এবং তাকে অনুসরণ করে থাকেন। এই মনসুর হাল্লাযকে নিয়ে বাজারে প্রচুর কারামত সম্মলিত গল্প প্রচলিত আছে যার কোন ভিত্তি নেই।

খিজীর (আ.)-এর ঘটনা

আল্লাহ মানব জাতীর জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে আল-কুরআনে খিজীর (আ.) এবং মূসা (আ.)-কে নিয়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই সূরায় এসেছে যে আল্লাহ খিজীর (আ.)-কে দিয়ে তিনটি ঘটনা ঘটান যার ভবিষ্যত ফলাফল মূসা (আ.) বুঝতে পারেননি। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চাননি যে কে বড় আর কে ছোট, এখানে মূল বিষয় বস্তুও এটা নয়। কিন্তু সূফী-সাধকরা এই ঘটনাকে মোর ঘুড়িয়ে নিয়ে গেছেন আধ্যাত্মিকতার জগতে। তারা বলতে চান যে মূসা (আ.) আল্লাহর নাবী ও রসূল হয়েও খিজীর (আ.)-এর রহস্যের ভেদ বুঝতে পারেননি। তারা বলতে চান যে খিজীর (আ.) ছিলেন একজন অধ্যাত্মিক জগতের ওলী যিনি নাবী ও রসূলদের চাইতেও উর্ধে! (নাউযুবিল্লাহ) মনের রাখতে হবে যে এই ধরনের বিশ্বাস বা আকীদা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুল।

আল্লাহর ওলী হওয়ার মডেল আরেকজনের গল্প ঃ ইবরাহীম ইবনে আদহাম! তিনি রাজা ছিলেন, রাজ প্রাসাদে বসেই যিকির, মোরাকাবা, ধ্যান ইত্যাদি করতেন। একদিন রাজ প্রাসাদে শুয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ শব্দ শুনলেন যে ছাদের উপর কে যেন হাটাহাটি করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'এই ছাদে কে?' ছাদ থেকে নাকি গায়েবী আওয়াজ আসলো আমি খিজির। 'তো হুজুর আপনি ছাদের উপর কী করেন?' উত্তরে খিজির বলছেন আমি উট খুঁজি। 'সে কি কথা ছাদের উপর কি উট পাওয়া যায় নাকি, আপনি কি পাগল হয়েছেন?' উত্তরে খিজির (আ.) বলছেন তুমিও কি পাগল নাকি? রাজ প্রাসাদে শুয়ে থেকে কি আল্লাহ পাওয়া যায়? রাজা চিন্তা করলেন তাই তো, রাজ প্রাসাদে শুয়ে কি আল্লাহ পাওয়া যায় নাকি। তাই তিনি রাজত্ব ছেড়ে জঙ্গলে চলে গেলেন এবং আল্লাহর ওলী হয়ে গেলেন! কী আশ্চর্য আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য কি জঙ্গলে যেতে হবে? আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রা.) তো রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন কিন্তু তাদেরতো জঙ্গলে যেতে হয়নি। এগুলো বিকৃত ইসলাম।

আল্লাহ কুরআনে কয়েকজন ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করেছেন মানব জাতিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য কিন্তু তারা নাবী ছিলেন না। ইনাদের কারো কারো নামে সূরার

নামকরণও করা হয়েছে। যেমন ইমরান (আ.), মারিয়াম (আ.), লুকমান (আ.), খিজির (আ.) প্রমুখ। খিজির (আ.)-এর শিক্ষণীয় ঘটনা মূসা (আ.)-এর বর্ণনার মধ্যে পাই এবং সূরা লুকমানে আমরা লুকমান (আ.)-এর শিক্ষণীয় ঘটনা পাই যা তিনি তার ছেলেকে উপদেশস্বরূপ দিয়েছিলেন। তেমনি রসূল ﷺ মায়ের মর্যাদা বুঝানোর জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে উয়াইস করনী (রহ.)-র কথা বলেছিলেন যা সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে। এই তিনজনের সাথে বাতেনী ইলম বা মারেফতের কোন সম্পর্ক নেই। মনে রাখতে হবে আল্লাহর পর নাবী-রসূলদের স্থান এবং নাবী-রসূলদের পর সাহাবাদের স্থান। আল্লাহ কাকে কিভাবে সম্মানিত করেছেন তা তিনিই ভাল জানেন, এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। এক্ষেত্রে যে যার স্থানে সম্মানিত, কাউকে দিয়ে কারো তুলনা করা যাবে না।

পীরের গোসল শরীফের মাধ্যমে শিরক

কোন কোন পীরের খানকায় 'গোসল শরীফ' চালু হয়েছে। মুরীদরা (মহিলা-পুরুষ উভয়) পীরকে গোসল করায় এবং শরীর ধোয়া সেই পানি তারা নিয়্যত করে খায় মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য, আবার অনেকে বোতলে ভরে নিয়ে যায় অন্যের জন্য। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরনের বাস্তব ঘটনা ইউটিউবে রয়েছে। একজন সুস্থ মানুষ কি এই ধরনের চিন্তা করতে পারে? এ কোন ধরনের আধ্যাত্মিকতা? এ কোন ধরনের বিকৃতি ইসলামের নামে?

লেংটা বাবা ও শিরকী কর্ম-কান্ড

বাংলাদেশের কোথাও কোথাও আছে "পাগলা বাবার দরবার, লেংটা বাবার দরবার"। এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড় সেই সকল দরবারে। এখন কথা হলো একজন পাগল (যার ব্রেইন কাজ করছে না) সে কিভাবে আল্লাহর ওলী হয়? তার উপরতো সলাতই ফরয না, অন্যান্য দায়িত্ব পালন তো দূরের কথা। আবার একজন লেংটা মানুষ কিভাবে আল্লাহর ওলী হয়? সেতো সতর ঢাকার ফরয হুকুমই অমান্য করছে! সে উলঙ্গ হয়ে কিভাবে মানুষের কাছে দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাবে? কুরআনে, হাদীসে বা ইসলামের ইতিহাসে এ পর্যন্ত কোন নাবী, রসূল, কোন সাহাবী বা কোন ইমামের কথা শুনা যায় না যে নাকি পাগল ছিলেন বা লেংটা ছিলেন!

এবার এই লেংটা বাবার রহস্য জানা যাক। এটা নাকি মারিফত এবং হাকিকতে বিষয়। এর ভেদ বুঝা বড় দায়, এর রহস্য ঔ লেংটা বাবা আর আল্লাহ জানেন। এই ভেদের একটি তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে আর তা হলো লেংটা বাবার লেংটির মধ্যে নাকি তিনটি জিনিস (অঙ্গ) থাকে। হিন্দু ধর্মে ঐ তিনটি অঙ্গের পরিচয় হলো ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু ও শীব এবং ইসলাম ধর্মে ঐ তিনটি অঙ্গের পরিচয় হলো আদম, মুহাম্মাদ ও আল্লাহ। (নাউযুবিল্লাহ)

ক্রাইম ওয়াচের মাধ্যমে চট্রগ্রামের একটি সত্য ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। ঠিক উপরে বর্ণিত এমন এক লেংটা পাগল চট্রগ্রামের কোথাও ছিল, সেখানে লোকজন যেত এবং তাকে নজরানাস্বরূপ টাকা-পয়সা দিত। একদিন প্রভাবশালি এক চক্র ঐ লেংটা পাগলাকে অপহরণ করে তুলে নিয়ে এসে তাকে তালা বন্ধ করে রাখে এবং ভক্তরা ঐ তালাবন্ধ অবস্থায়ই তার কাছে আসতে থাকে অলৌকিক সাহায্য নেয়ার জন্য এবং নজরানাস্বরূপ প্রচুর টাকা-পয়সা দিতে থাকে। এভাবে ঐ প্রভাবশালি চক্র লেংটা পাগলাকে দিয়ে অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন ঐ লেংটা পাগলা বাবার যদি অলৌকিক ক্ষমতাই থাকতো তাহলে তো তাকে কেউ জোর করে অপহরণ করে আনতে পারে না, তাকে তালাবন্ধ করে রাখতে পারে না, তাকে ব্যবহার করে অবৈধ ব্যবসা করতে পারে না। এই শিরকীয় ঘটনা শিক্ষণীয় হিসেবে ইউটিউবে দেখা যেতে পারে।

মাথা ঠেকানোর শিরক

সিজদা বা মাথা ঠেকানোর প্রবণতা প্রধানতঃ মুশরিক সমাজে পরিলক্ষিত হলেও মু'মিন কখনও মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা ঠেকাতে পারে না কারণ তা পরিষ্কার শিরক বা তাওহীদ বিরোধী। সলাত আদায় করার সময় একজন মু'মিন শুধু আল্লাহর কাছে তার মাথা ঠেকায়। কবর, তথাকথিত মাযার এমনকি দেশের মাটি ইত্যাদির প্রতি মাথা ঠেকানো হলো শিরক। খুবই জনপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীতের একটি লাইন,

> ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা
> তোমাতে বিশ্ব মায়ের আচল পাতা
> তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছো মোর প্রাণের মনে।

নোট ঃ এই রবীন্দ্র সঙ্গীতটি আমাদের দেশে আমরা দেশাত্মবোধক গান হিসেবে গেয়ে থাকি। এই গানের ব্যাকগ্রাউন্ড হলো, হিন্দুদের কালী দেবী হচ্ছে 'বিশ্ব মা'

এই গানে বলা হচ্ছে কালী দেবী আমার দেশের মাটিতে তার আচল পেতে রেখেছে আর আমরা তার আচলের উপর মাথা ঠেকাচ্ছি। তাই এই গান মুসলিমদের জন্য সুস্পষ্ট শিরক। কারণ মুসলিম শুধু মাথা ঠেকায় মহান আল্লাহর সামনে। যেমন আরো একটি দেশাত্মকবোধক গানের মধ্যে রয়েছে শিরক ঃ

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী
ওগো মা.... তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে... ওগো মা..... ।

যদি এই গানগুলো কোন হিন্দু গায় কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে গাইলেই হবে শিরক। এই গানগুলো নিয়ে কোনভাবেই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা যাবে না যে, এখানে দেশাত্মবোধের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হচ্ছে না বা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হচ্ছে না। এখানে কারো বিরুদ্ধে কিছুই বলা হচ্ছে না বরং মুসলিমদেরকে শিরকের ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে।

'সুস্থতা ও সৌভাগ্য লাভ' এ বিশ্বাস নিয়ে তামা, দস্তা, লোহার চুড়ি এবং আংটি পরা শিরক

ইমরান ইবনে হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত আছে, রসূল ﷺ একটি লোকের বাহুতে দস্তার বালা দেখে তাকে বললেন, "দুর্ভাগ্য তোমার উপর। এটা কী?" লোকটি উত্তর দিল যে এটি আল-ওয়াহিনাহ নামের একটি অসুখ হতে রক্ষা পাবার জন্য। রসূল ﷺ তখন বললেন, "এটা ফেলে দাও, কারণ এটা শুধু তোমার অসুস্থতা বৃদ্ধি করবে এবং যদি তুমি এটা পড়া অবস্থায় মারা যাও, তুমি কখনও কৃতকার্য হবে না।" (আহমাদ, ইবনে মাযাহ)

এভাবে অসুস্থতা এড়ানো যায় অথবা সারানো যায় এই বিশ্বাসে তামা, দস্তা বা লোহার চুড়ি, বালা এবং আংটি পড়া কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হারাম (নিষিদ্ধ) সামগ্রীর মাধ্যমে অসুস্থতার চিকিৎসা ইসলামে নিষেধ, যে সম্বন্ধে রসূল ﷺ বলেছিলেন, "একজন আর একজনের অসুস্থতায় চিকিৎসা কর, কিন্তু নিষিদ্ধ সামগ্রী দিয়ে রোগের চিকিৎসা করো না।" (আবু দাউদ, বাইহাকী)

অষ্টধাতুর আংটি পড়াও শিরক।

তাবিজ ও কবজ বাঁধার শিরক

'তাবিজ'-এর পরিচয় ঃ অসুখ-বিসুখ, চোখ লাগা, বদনযর, জাদু, জিন-শয়তানের আছর, স্বামীর ভালোবাসা অর্জন ইত্যাদি কোনো সম্ভাব্য বা ঘটিত অকল্যাণ দূর করতে অথবা কোনো কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে পূতিঁ, কাঠ, হাড়, সূতা, কাগজ ইত্যাদি দেহে, গৃহে, গাড়ীতে বা অন্য কিছুতে ঝুলানোকে 'তাবিজ' বলে। এই অর্থে যিক্‌র-আযকার ও দু'আ-দুরূদ চামড়া, কাগজ, ফ্রেম বা অন্য কিছুতে লিখে ঝুলালে তাও তাবিজের আওতায় পড়বে। বাসা-বাড়ীর গেটে বা কোনো স্থানের সম্মুখভাগে ঘোড়ার পায়ের নাল ঝুলানোও তাবিজের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে গাড়ীর পেছনে বা সামনে জুতা, সেন্ডেল, কুকুর, বিড়াল, পতুল ঝুলানো বা গাড়ীর লুকিং গ্লাসে নীল পূঁতি, তাসবীহ ইত্যাদি ঝুলানোও তাবিজের অন্তর্ভুক্ত। এসব জিনিস রোগীর বা সাধারণ কোনো ব্যক্তির বালিশ বা বিছানার নীচে অথবা অন্য কোথাও বিশেষ নিয়্যতে রাখলে তাও তাবিজ বলে গণ্য হবে।

তাবিজ ব্যবহারকারী যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত এসব জিনিসের নিজস্ব শক্তি রয়েছে, তাহলে সে বড় শিরককারী হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি সে বিশ্বাস করে যে, সবকিছু আল্লাহর হাতে; কিন্তু এগুলি মাধ্যম মাত্র এবং এগুলির নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, তাহলে সে ছোট শিরককারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে ইসলামে অনোনুমোদিত কোন কিছুকে (মানুষ বা বস্তু) উসিলা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে তার অন্তর ঝুঁকে পড়েছে। তার অন্তর যদি এসব জিনিসের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সে এগুলির মাধ্যমে কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূরীকরণের আশা করে, তাহলে তার এই আমল বড় শিরকের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হবে।

রসূল ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো, সে শির্ক করল। (আহমাদ, হাকেম)

ক্বায়েস ইবনে সাকান আল-আসাদী (রা.) বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর দেহে লাল তাবিজ দেখতে পেয়ে তা ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহর পরিবার শিরকমুক্ত"। তিনি আরো বললেন, আমরা রসূল ﷺ -এর কাছ থেকে এই হাদীসটি মুখস্থ করেছি, নিশ্চয়ই (নিষিদ্ধ) ঝাড়ফুঁক, তাবিজ এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী বিশেষ তাবিজ (তিওয়ালা) শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (মুস্তাদরাক হাকেম)

আমাদের সমাজের লোকদের মাঝে তাবিজ-কবজ বাঁধার এবং এক শ্রেণীর বড় লোকদের মাঝে, বিশেষ করে বিদেশ সফর কালে 'ইমামে জামেন' বাঁধার একটা ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে। এরা মনে করে যে এতে করে বিপদ কেটে যাবে কিংবা বিপদ আসতেই পারবে না। কিন্তু কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এসব যে ইসলামের তাওহিদী আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মুসলিমদের মাঝে এটা যে একটা সম্পূর্ণ বিদ'আত ও শিরকী কাজ তা আমরা জানিনা।

উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোনো তাবিজ-কবজ ঝুলাবে, আল্লাহ তাকে কোনো ফায়দা দেবেন না। আর যে কোনো কবজ ঝুলাবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন না।" এবং "যে লোক কোনো তাবিজ-কবজ বাঁধবে, সে শিরক করলো।" (সহীহ বুখারী)

পরপর উল্লেখ করা এ হাদীস থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোনো ক্ষতি–লোকসান বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কিংবা কোনো স্বার্থ-উদ্দেশ্য লাভের আশায় তাবিজ-কবজ বাঁধা সুস্পষ্ট শিরক। সাধারণভাবে লোকেরা মনে করে যে এর মধ্যেতো আল্লাহর কালাম রয়েছে, আর এটা বিশেষ হুজুর দিয়েছেন, রোগ-বালাই ভাল না হয়ে যায় কোথায়। নিজের অজান্তে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজের মধ্যে মনে করা হচ্ছে ক্ষমতা। আর এটাই শিরক।

কুরআনীয় তাবিজ-কবজ শিরক

রসূল ﷺ কুরআনের আয়াত নিজের শরীরে রেখেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে হাদীসের কোথাও কোন দলিল নেই। কুরআনীয় তাবিজ-কবজ শরীরে রাখা এবং রসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত শয়তান এড়ানো এবং বান ও যাদু ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। সুন্নাহ হল শয়তান নিকটবর্তী হলে সূরা ফালাক ও নাস এবং সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত আয়াতুল-কুরসী পাঠ করা। (সহীহ বুখারী)। কুরআন হতে সৌভাগ্য লাভের একমাত্র নির্দেশিত উপায় হল কুরআন বুঝে পড়া এবং তা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করা।

কুরআন থেকে তাবিজ বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন ঃ (১) কাগজে কুরআনের আয়াত লিখে তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করা। (২) কুরআন মাজীদকে খুব ছোট আকারে প্রিন্ট করে তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করা। (৩) কেউ কেউ কুরআন মাজীদকে দেহে না ঝুলিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ায়। (৪) কেউ কেউ আবার

কুরআনের আয়াতকে স্বর্ণ বা রৌপ্য খণ্ডে লিখে তা তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করে। তাবিজ কুরআন দিয়ে হলেও তা ব্যবহার করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, উক্ববাহ ইবনে আমের, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আসওয়াদ, আলক্বামাহ, ইবরাহীম নাখাঈ (রহেমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ এমতের পক্ষাবলম্বন করেছেন।

কুরআনকে তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করলে কুরআনের অবমাননা করা হয়। ব্যবহারকারী এই তাবিজ নিয়ে টয়লেট, নাপাক স্থান ইত্যাদিতে গিয়ে থাকে, যেসব স্থানে কুরআন নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। আর ব্যবহারকারী যদি বাচ্চা হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

উক্ববা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা.) বলেন, রসূল ﷺ -এর কাছে একটি দল আসলে তিনি তাঁদের ৯ জনের বায়'আত গ্রহণ করলেন, কিন্তু একজনের বায়'আত গ্রহণ করলেন না। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি ৯ জনের বায়'আত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এই ব্যক্তির বায়'আত গ্রহণ করলেন না? তিনি বললেন, তার দেহে তাবিজ আছে। অতঃপর তিনি তাঁর হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেললেন। এরপর তার বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 'যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো, সে শিরক করল'। (মুসনাদে আহমাদ, ১৫৬/৪; সিলসিলাহ ছহীহাহ, হা/৪৯২)

তিনি অন্যত্র বলেন, 'নিশ্চয়ই (নিষিদ্ধ) ঝাড়ফুঁক, তাবিজ এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী বিশেষ তাবিজ (তিওয়ালা) শিরকের অন্তর্ভুক্ত'। (মুস্তাদরাক হাকেম)

আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে, তাকে তার দিকে ঠেলে দেয়া হবে'। (আলবানী, সহীহুত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৩৪৫৬)

এসব হাদীসে সাধারণভাবে সব ধরনের তাবিজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন্‌টি কুরআন থেকে এবং কোন্‌টি কুরআন থেকে নয়, তার কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আজ তাবিজ ব্যবসায়ীরা তাবিজে কুরআনের আয়াত ও সূরা লিখে তার নীচে জাদুমন্ত্রের অদ্ভুত সব দাগ টানে এবং নানা ধরনের সংখ্যা লিখে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা থেকে মানুষের অন্তরকে ফিরিয়ে এনে তারা তাদের লিখিত জাদুমন্ত্রের উপর ভরসা করতে উৎসাহ দেয়। কেননা তাবিজ যেমন বালা-

মুছীবত দূরীকরণের বৈধ কোনো মাধ্যম নয়, তেমনি তা কোনো ওষুধ হিসাবেও গণ্য নয়। (মা'আরেজুল ক্ববূল, ২/৫১০-৫১২)।

কুরআনের মধ্যে তাবিজের নক্শা ও শিরক

আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বংলাদেশের একটি কুরআনের প্রথমেই কয়েকপাতা রয়েছে বিভিন্ন রকমের নকশা। যেমন, সূরা ফাতিহার নকশা, সূরা বাকারার নকশা, সূরা নিসার নকশা, সূরা মায়িদার নকশা, সূরা আন-আমের নকশা, সূরা তওবার নকশা, সূরা ইউনুসের নকশা, সূরা মারিয়ামের নকশা, সূরা আম্বিয়ার নকশা, সূরা আর-রহমানের নকশা, সূরা ওয়াকিয়ার নকশা, সূরা ইখলাসের নকশা, সূরা ফালাক-নাসের নকশা। এই ধরনের নকশা শিরক। এই কুরআনটি বাংলাদেশের বিখ্যাত একটি প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত এবং বাংলাদেশের কয়েকটি বড় বড় মাদ্রাসার সাতজন মুহাদ্দেছ, মুফতী, নাযেমে তালীমাত, নাযেমে মুহতামেম ও মুদাররেসগণ এই কুরআনটি সম্পাদনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কুরআন থেকে দুটি নক্সা নিম্নে দেয়া হলো।

সূরা আর-রহমানের তদবীর ঃ এই সূরার নক্শা গলায় বাঁধিলে যাবতীয় মক্সুদ পূর্ণ হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

সূরা আন-আমের তদবীর ঃ এই সূরার নক্শা গলায় বাঁধিলে সম্মান ও নিরপত্তা লাভ হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

٣٠٣٠٣	٣٠٣٠٦	٣٠٣٠٩	٣٠٣٩٦
٣٠٣٠٨	٣٠٣٩٧	٣٠٣٠٢	٣٠٣٠٧
٣٠٣٩٨	٣٠٣١١	٣٠٣٠٤	٣٠٣٠١
٣٠٣٠٥	٣٠٣٠٠	٣٠٣٩٩	٣٠٣١٠

সূরা আর-রহমানের নক্শা

٢٣٣٨٣٢	٢٣٣٨٣٥	٢٣٣٨٣٨	٢٣٣٨٢٤
٢٣٣٨٣٧	٢٣٣٨٢٥	٢٣٣٨٣١	٢٣٣٨٣٦
٢٣٣٨٢٦	٢٣٣٨٤٠	٢٣٣٨٣٣	٢٣٣٨٣٠
٢٣٣٨٣٤	٢٣٣٨٢٩	٢٣٣٨٢٧	٢٣٣٨٣٩

সূরা আন-আমের নক্শা

সোলায়মানী তাবিজের কিতাব থেকে শিরক

এই বইটিও সম্পাদান করেছেন বাংলাদেশের একটি বড় মাদ্রাসার আলেম। এই বইয়ে রয়েছে নানারকম শিরকীয় তদবীর । যেমন, মহব্বত সৃষ্টির তদবীর, মন্ত্রী নারাজের তদবীর, স্বামী-স্ত্রীর মহব্বতের তদবীর, শত্রু দমনের তদবীর, পলাতক ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনার তদবীর, চোর চিনিবার তদবীর। (নাউযুবিল্লাহ) পাঠকদের কৌতুহলের জন্য একটি তাবিজের নক্শা দেয়া হলো।

জ্বীন বোতলে ভরার তদবীর ঃ একটি বোতল লইয়া নিম্নের আয়াতটি পড়িবে এবং লিখিয়া উহা বোতলের মুখে বাধিঁবে, আর নকশাটি লিখিয়া বোতলে ঢুকাইয়া যখন বোতল ভারী হইয়া যাইবে তখন বুঝিবে যে জ্বীন আসিয়া গিয়াছে।

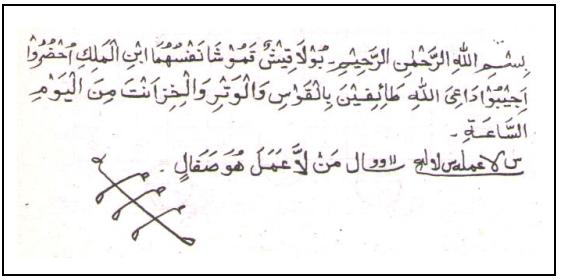

শিরকীয় ঝাড়-ফুঁক থেকে সাবধানতা

'আউফ ইবনে মালিক আল-আশজা'ঈ (রা.) বলেন, জাহিলী যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। ইসলাম পরবর্তী যুগে রসূল ﷺ -কে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? তিনি বললেন, 'তোমাদের ঝাড়-ফুঁকে পঠিত বিষয়গুলিকে আমার কাছে পেশ কর। ঝাড়-ফুঁকে যদি শিরকের সংমিশ্রণ না থাকে, তবে তাতে কোনো দোষ নেই'। (সহীহ মুসলিম, হা/২২০০)

ঝাড়-ফুঁকের প্রকারভেদঃ ঝাড়-ফুঁক সাধারণতঃ চার রকমের হয়ে থাকে -

১. **শিরকী ও কুফরী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক ঃ** এই প্রকারের ঝাড়-ফুঁক কুফর এবং শিরক বলে গণ্য।

২. **অর্থ বোধগম্য নয় এমন কিছু শব্দের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক ঃ** এই প্রকারের ঝাড়-ফুঁক শিরকের মাধ্যম এবং হারাম।

৩. **আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো (ফিরিশতা, নাবী, পীর) নামের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক ঃ** এই প্রকার ঝাড়-ফুঁকও বৈধ নয়।

৪. **আল্লাহর নাম বা তাঁর কালাম অথবা রসূল ﷺ প্রদর্শিত হাদীসের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক ঃ** শুধুমাত্র এই প্রকার ঝাড়-ফুঁক শরী'আতসম্মত।

শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁকের শর্ত: ঝাড়-ফুঁক শরী'আত সম্মত হতে হলে তাতে বেশ কিছু শর্ত থাকা জরূরী। যেমন ঃ

(১) ঝাড়-ফুঁক আরবী ভাষায় অথবা যে কোনো বোধগম্য ভাষায় হতে হবে।
(২) ঝাড়-ফুঁকে যা পড়া হবে, তা শরী'আতে অনুমোদিত হতে হবে।
(৩) ঝাড়-ফুঁকের যে নিজস্ব কোনো প্রভাব এবং ক্ষমতা নেই, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।
(৪) ঝাড়-ফুঁকের ফলাফল যা হবে তা একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে আসবে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।

শরী'আতসম্মত ঝাড়-ফুঁকের পদ্ধতি ঃ কুরআন-হাদীসের বহু দলীল প্রমাণ করে যে, নিজের জন্য নিজের ঝাড়-ফুঁক সবচেয়ে বেশী উপকারী, যদিও মানুষ এর বিপরীতটা মনে করে এবং ঝাড়-ফুঁক প্রদানকারীকে খুঁজে বেড়ায়। এক্ষেত্রে তারা এমনকি মূর্খ, ভেলকিবাজ বা জাদুকরের কাছে যেতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। শার'ঈ ঝাড়-ফুঁক চোখ লাগা, জাদু এবং নানাবিধ মানসিক ও শারীরিক অসুখ-বিসুখ দূরীকরণে ফলপ্রসূ। চিকিৎসা বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি চিকিৎসা জগৎ, সেহেতু এখানেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলনের গুরুত্ব কম নয়। অতএব, ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতি যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপকারী প্রমাণিত হয় এবং তাতে শরী'আত পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকে, তবে তা বৈধ। যাহোক, বিভিন্নভাবে ঝাড়-ফুঁক করা যেতে পারে। যেমন ঃ

আয়িশা (রা.) বলেন, রসূল ﷺ যখন অসুস্থতা অনুভব করতেন, তখন সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস পড়ে নিজের গায়ে ফুঁ দিতেন এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন। (সহীহ বুখারী, হা/৫৭৫১; সহীহ মুসলিম, হা/২১৯২)

ভাগ্য গণনা করা শিরক

প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধে অপবিত্র বিশ্বাস জড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভাগ্য গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। যারা ভাগ্য গণনায় লিপ্ত তাদের এই নিষিদ্ধ প্রথা পরিত্যাগ করার উপদেশ প্রদান ব্যতীত তাদের সঙ্গে যে কোন ধরনের সম্পৃক্ততার ইসলাম বিরোধিতা করে।

গণক বা জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া ঃ যে কোন প্রকারের গণক-দর্শন সম্বন্ধে রসূল ﷺ পরিস্কারভাবে নীতি নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। রসূল ﷺ -এর স্ত্রী হাফসা (রা.) হতে সাফিয়া বর্ণনা করেন যে রসূল ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ গণকের কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে চল্লিশ দিন ও রাত্রি পর্যন্ত তার সলাত (নামায) গৃহীত হবে না।" (সহীহ মুসলিম)।

শুধুমাত্র গণকের কাছে যাবার এবং তাকে কৌতুহল বশতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কারণেই এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তি। মুয়াবিয়াহ ইবনে আল-হাকাম আস-সালামীর দ্বারা এই নিষিদ্ধকরণ আরও সমর্থিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহর রসূল ﷺ! নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কাছে যায়।" রসূল ﷺ উত্তর দিলেন, "তাদের কাছে যাবে না।" (সহীহ মুসলিম)

গণকের উপর বিশ্বাস ঃ গণক অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের খবর জানে এই বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ গণকের কাছে যায় সে কুফর (অবিশ্বাস) করে। আবু হুরায়রা এবং আল-হাসান উভয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যে রসূল ﷺ বলেছেন, "যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর যা নাজিল হয়েছিল তা অবিশ্বাস করলো।" (আহমদ, বায়হাকী, আবু দাউদ)।

রাশিচক্রে বিশ্বাস করা শিরক

জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুধু হারামই নয় একজন জ্যোতিষবিদের কাছে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই কেনা অথবা একজনের কোষ্ঠী যাচাইও নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা এই বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে গণ্য করা হয়। ফলস্বরূপ, যে তার রাশিচক্র খোঁজে বা গণকের কাছে হাত দেখায় বা ভাগ্য ফেরানোর জন্য পাথর নেয় সে রসূল ﷺ -এর এই হাদীসের অধীনে পড়েঃ

"যে গণকের কাছে যায় এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তার চল্লিশ দিন ও রাত্রির সলাত গ্রহণযোগ্য হবে না।" (সহীহ মুসলিম)

আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিনের রাশিচক্র দেয়া হয় যেমন, 'আপনার দিনটি কেমন যাবে'? আবার বছরের শুরুতে রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সারা বছরটি কেমন যাবে। এছাড়া পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় "পাথরে ভাগ্য ফিরে", আবার অনেকে বিজ্ঞাপন দেয় যে নিঃসন্তানদের

সন্তান দান" ইত্যাদি। এই ধরনের বিজ্ঞাপন আল্লাহর সাথে শিরকের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ, যা আমরা মুসলিম হয়ে দেখি এবং কেউ কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের কাছে যাই ভাগ্য ফিরানোর জন্য, সন্তানের জন্য! যা সুস্পষ্ট শিরক। এমনকি কৌতুহল বশতঃও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাশিচক্র পড়া যাবে না। গণকের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাস করলে ৪০ দিন তার ইবাদত কবুল হবে না।

মানত মানায় শিরক

মানত বলা হয় এরূপ কাজকে যে, কোনো কিছু যাতে হয় (চাকুরি লাভ, পরীক্ষায় সাফল্য) সেজন্য কোন ভালো কাজ করার নিয়ত করা অথবা নিজের জন্য ওয়াজিব করে নেয়া যা আসলে নিজের ওপর ওয়াজিব নয়। যেমন বলা হয় ঃ আমি আল্লাহর জন্যে একাজ করার মানত করেছি। কুরআনে এ মানত করার কথা বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল-বাকারার ২৭০ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"*তোমরা যা কিছু খরচ করো বা মানত মানো, আল্লাহ তার সব কিছুই জানেন। আর যালিমদের জন্যে সাহায্যকারী কেউ নেই।*"

তাফসীর মাযহারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা লিখা হয়েছে এভাবে ঃ মানত হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর জন্যে করবে বলে কোনো কাজ নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নেবে শর্তাধীন কিংবা বিনা শর্তে। এ আয়াত ও তাফসীরের উদ্ধৃতি স্পষ্ট বলে দেয় যে, মানত হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্যে। যে মানত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যে, কুরআনের ঘোষণানুযায়ী কেবল তাই জায়িয; যে মানত খালিসভাবে আল্লাহর জন্যে নয়, তা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

মানত সাধারণত দু'প্রকারের হয়। যে মানত আল্লাহর আনুগত্যের কোনো কাজের হবে, তা আল্লাহর জন্যে বটে এবং তাই পূরণ করতে হবে। আর যে মানত আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের মাধ্যমে হবে, তা হবে শয়তানের উদ্দেশ্যে। তা পূরণ করার কোনো দায়িত্ব নেই। কর্তব্যও নয়।

কথায় কথায় মানত করার রোগ দেখা যায় বেশিরভাগ লোকদের মধ্যে এবং মানত করার ইসলামী পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে লোকেরা এক্ষেত্রে নানা

প্রকার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, রসূলে করীম ﷺ এই কাজকে কিছু মাত্র উৎসাহিত করেননি, বরং তিনি একে সম্পূর্ণ অর্থহীন কাজ বলে ঘোষণা করেছেন।

যদি মানত মানতেই হয়, তবে যেন সলাত-সিয়াম, আল্লাহর ঘরের হাজ্জ ইত্যাদি ধরনের কোনো কাজের মানত মানা হয়। কেননা তাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই বান্দার সামনে আসে না-- আসার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ধন-সম্পদের যে মানত মানা হয় তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কারো প্রতিই মন বেশি ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

মানত তাকদীরকে পরিবর্তন করে না

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী করীম ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন। এই মর্মে তিনি বলেন, মানত কোন জিনিসকে দূর করতে পারে না। এ দ্বারা শুধু কৃপণের মাল ব্যয় হয়। (সহীহ বুখারী)

আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নাবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মানত মানব সন্তানকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা তাকদীরে নির্ধারিত নেই সে যে মানতটি করে তাও তাকদীরে লিখিত আছে, যাতে কৃপণের মাল ব্যয় হয়। (সহীহ বুখারী)

গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, সিনেমা এবং বাঙালী কালচারের মধ্যে নানারকম শিরক

আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমাদের সন্তানদের ব্রেইনে বাঙালি কালচার আর ফ্যাশনের নামে আল্লাহ-বিরোধী বিশ্বাস ঢুকছে? যেমন, বৈশাখী মেলার নামে অনেক কাজকর্মই হয়ে থাকে যা মুসলিমদের জন্য সুস্পষ্ট শিরক।

আমরা কি কখনো গভীরভাবে খেয়াল করেছি যে আমি এবং আমার সন্তানেরা কী ধরনের বই বা গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ছি? এবং এই ধরনের গল্প-উপন্যাস বা কবিতার মাধ্যমে স্লো-পয়জনে আমরা নানারকম শিরকে আক্রান্ত হচ্ছি?

আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমি এবং আমার সন্তানেরা সাধারণত কী ধরনের গান শুনে থাকি? রবীন্দ্র সঙ্গীত বলি, আর নজরুল সঙ্গিত বলি, আর পল্লীগীতি বলি, আর মারফতি বলি, আর দেশাত্মবোধক বলি, আর লালনগীতি

বলি, আর ব্যান্ড সঙ্গীত বলি এই ধরনের গানের অনেক কথাতেই রয়েছে শিরক! মনে রাখতে হবে যে শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না ।

আমি কি কখনো চিন্তা করেছি যে আমি এবং আমার পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত কী ধরনের নাটক-সিনেমা (অখাদ্য-কুখাদ্য) দেখছি? এই ধরনের নাটক-সিনেমা, হিন্দি সিরিয়াল, হিন্দি মুভি আমাদেরকে সঠিক কুরআনের পথ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । অনেক হিন্দি মুভির মধ্যেই থাকে হিন্দুদের পুজা যা আমি দেখছি এবং শিরকের প্রশ্রয় দিচ্ছি । আবার হিন্দি মুভি যখন শুরু হয় তখন দেব-দেবীর নামে শুরু হয় । আসুন একটিবার গভীরভাবে ভেবে দেখি আমার মুসলিম ঘরে আমি এই টেকনোলজির মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে হিন্দুদের মূর্তি পুজার আশ্রয় দিচ্ছি তার মানে নিজেদের মুসলিম ঘরেই আজ পুজা হচ্ছে ।

আমাদের সন্তানেরা রক সঙ্গীত খুব ভালবাসে । আমি কি জানি আজকালকার রক সঙ্গীত (Rock music)-এর অনেক গায়ক-গায়িকারাই রীতিমতো ইবলিস শয়তানের পূজা করে থাকে? এবং তাদের গানের কথাগুলো হচ্ছে ঐ শয়তানের ইবাদত? যেমন ঃ এ ধরনের একটি গানের লাইন "হে আমার প্রভু শয়তান ... আমাকে টানতে টানতে হেলে (জাহান্নামে) নিয়ে যাও ....." । সন্তানের পিতা-মাতা হিসেবে আমি কি একটিবার চিন্তা করে দেখেছি যে আমার সন্তানেরা কি ধরনের ইংলিশ গান শুনছে? তাদের কানের মধ্যে যে সারাক্ষণ আইপ্যাডের হেডফোন লাগানো থাকে তাতে তারা কী শুনছে আর কী অর্জন করছে? নিম্নে কয়েকটি পরিচিত গানের উদাহরণ দেয়া হলো যার কথার মাধ্যমে আমরা অজান্তেই শিরক করে যাচ্ছি, যেমন ঃ

আমার <u>পুজার ফুল</u> ভালবাসা হয়ে গেছে তুমি যেন ভুল বুঝনা
মালা গেথে রেখেছি পরাবো তোমায় তুমি যেন ছিড়ে ফেল না ।

নোট ঃ কিশোর কুমার এবং বিখ্যাত শিল্পিদের এই ধরনের গান আমাদের মুসলিমদের মুখে মুখে । আমরা মুসলিমরা হয়তো না বুঝেই এই গান গাচ্ছি বা শুনছি । কিন্তু এই সকল গান অন্য ধর্মের লোকদের জন্য কোন আপত্তি নেই কিন্তু মুসলিমদের জন্য গাওয়া বা শোনা হারাম এবং সুস্পষ্ট শিরক ।

প্রেমের মরা জলে ডুবে না ...
প্রেম করেছে <u>ইউসুফ নাবী</u>...
<u>তার প্রেমে</u> জোলেখা বিবি গো..... ।

নোট ঃ এটিও আমাদের মুসলিম সমাজে একটি বিখ্যাত গান। এই তথ্য মহাকবি ফেরদৌসের রচিত ইউসুফ-জুলেখার প্রেম কাহিনী থেকে নেয়া। এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধরনের মিথ্যাচার প্রচার করা মারাত্মক গুনাহর কাজ। আমরা জানি ইউসুফ (আ.) একজন নাবী ছিলেন। ইউসুফ (আ.)-এর বিস্তারিত জীবনী কুরআনে সূরা ইউসুফের মধ্যে রয়েছে। সেখানে কোথাও নেই যে তিনি কারো সাথে প্রেম করেছেন। একজন নাবী সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার আমরা মুসলিমরা অনায়েসেই মেনে নিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছি!

বৃহস্পতি এখন আমার তুঙ্গে
শনির দশা শেষ হয়েছে কবে
চন্দ্র এসে ভর করেছে. এবার নাকি..... ।

নোট ঃ কুসংস্কারের মাধ্যমে আমাদের সমাজে শিরক এমনভাবে ঢুকে আছে যে তা গানে গানে প্রচলিত। উপরের এই গানে বৃহস্পতি, শনি, চন্দ্র নানারকম উসিলা দিয়ে গান গাওয়া হচ্ছে, এগুলো গণকদের বিষয়, তাই শিরক!

পহেলা বৈশাখ ও শিরকের সঠিক ধারণা

আমরা বলে থাকি পহেলা বৈশাখ হচ্ছে বাঙালী কালচারাল অনুষ্ঠান, এটি একটি অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা বাঙালী জাতি হিসেবেই পহেলা বৈশাখ পালন করে থাকি, এতে অসুবিধাটা কোথায়? অবশ্যই ধর্মের জায়গায় ধর্ম, আর জাতির জায়গায় জাতি।

সর্বপ্রথম দেখতে হবে আমার পরিচয় কী? আমার পরিচয় যদি হয় মুসলিম এবং জাতিগতভাবে একজন মুসলিম হতে পারে বাঙালী, ইংরেজ, চাইনিজ অথবা আফ্রিকান। এই সকল জাতি তার জাতিগত কালচারাল অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে কিন্তু অবশ্যই একজন মুসলিম হিসেবে যেন তা ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কারণ আকীদা হচ্ছে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তাই আমি যেই জাতির মুসলিম-ই হই না কেন একজন ঈমানদার মুসলিম হিসেবে আগে আমাকে ইসলামী আকীদাগত বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব ভাল করে পড়াশোনা করে জেনে নিতে হবে যে একজন মুসলিম কী করতে পারবে আর কী করতে পারবে না। কোন ভাবেই যেন হালালের সাথে হারামের সংমিশ্রণ হয়ে না যায়।

যেমন চাইনিজদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে 'চাইনিজ নিউ ইয়ার'। এই সময় তাদের সাতদিন সরকারী ছুটি থাকে এবং এই সাতদিন ধরে চলে তাদের নানারকম কালচারাল অনুষ্ঠান, বিগত পূর্বপুরুষদের পূজা করা এই অনুষ্ঠানের একটি অংশ। চাইনিজদের মধ্যেও অনেক মুসলিম রয়েছে। তারা কি তাদের জাতির ঐ সাতদিন ব্যাপি 'চাইনিজ নিউ ইয়ার' উৎসব পালন করে? অবশ্যই মুসলিম চাইনিজরা তা পালন করে না। কারণ ঐ সাতদিন ব্যাপী যে কালচারাল অনুষ্ঠান হয় তা ইসলামী আকীদা অর্থাৎ ঈমানের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

পহেলা বৈশাখ উদযাপন বা নববর্ষ বরণের যে ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া, তার কোনো একটি বিষয়েও আপত্তি নেই, আপত্তি থাকার কোনো কারণও নেই। মঙ্গল শোভা যাত্রা হোক, শঙ্খধ্বনি হোক, পান্তাভাতের নৈবদ্য সাজিয়ে অতিথিরূপী নারায়ণ সেবা হোক, উল্কি অঙ্কন, চন্দন বা সিন্দুর টিপ পরিধান হোক, নৃত্য সঙ্গীত, মৃদঙ্গ করতাল ঢোলবাদ্য, উলুধ্বনি, মঙ্গলপ্রদীপ, প্রকৃতিপূজা যাই-ই হোক, কোনো কিছুতেই অনুমাত্র আপত্তি নেই। বরং হিন্দু সম্প্রদায় তাদের মতো করে নির্বিঘ্নে আলপনা এঁকে ঘট-সাজিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে পহেলা বৈশাখকে নানা আচারে উপাচারে মুখরিত করে তুলতে পারে এতে কোন আপত্তি নেই। এমনকি তাদের কাছে প্রকৃতিপূজা যেহেতু সিদ্ধ; তারা মনে করলে, মঙ্গলদাত্রী বৈশাখী দেবীপ্রতিমা নির্মাণ করে পূজা-অর্চনাও করতে পারে। ইসলামের আপত্তি শুধু একটি ক্ষেত্রে, আর তা হলো এই বৈশাখী উৎসবে যে যে বিষয়গুলো ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক সেই বিষয়গুলো যদি কোন মুসলিম পালন করে তাহলে তা হবে তার জন্য শিরক। এখন যদি কোন মুসলিম শিরক করতে চায় সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। তাই বলে পহেলা বৈশাখকে গালাগালি করা যাবে না এবং অন্য ধর্মের লোকদেরকেও কিছু বলা যাবে না। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ অমুসলিম রয়েছে, তারা যদি এই উৎসব পালন করে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই বাঁধা দেয়া যাবে না যেমনি বাঁধা দেয়া যাবে না কোন হিন্দুকে মন্দিরে যেতে বা বাঁধা দেয়া যাবে না কোন খ্রষ্টানকে গীর্জায় যেতে, এটা তাদের ধর্মীয় অধিকার।

বাংলাদেশে অনেক মুসলিম গুনাহর কাজ হওয়া সত্ত্বেও, ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শবেবরাত পালন করে, ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করে, মাযারে গিয়ে শিরক করে। বিষয়টা কিছুটা ঐ রকম। ইসলামে মুসলিমদের জন্য আনন্দ উৎসব হচ্ছে বছরে দুটি ১) ঈদুল ফিতর ও ২) ঈদুল আযহা। এর বাইরে যতো উৎসব পালন করবে তা হবে বিদ'আত। এখন মুসলিমরা যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করতে

চায় তাহলে এর জন্য সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। আমাদের কাজ হবে সবাইকে সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দেয়াটা, কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ না ছড়ানো।

দেয়ালে কারো ছবি টাঙানো এবং ঘরে মূর্তি রাখা শিরক

আমরা অনেকে ঘরের দেয়ালে নানারকম ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে ঝুলিয়ে রাখি। যেমন ঃ বিয়ের ছবি, পিতা-মাতার ছবি, পারিবারিক ছবি, রবীন্দ্র-নজরুল, নেতা-নেত্রীর ছবি, পীরের ছবি, বিভিন্ন স্টারদের ছবি বা পশু-পাখির ছবি ইত্যাদি। আবার অনেকে আর্ট-কালচারের নামে শোপীচ হিসেবে ঘরে নানারকম মূর্তিও রাখি। মনে রাখতে হবে ঘরে যে কোন ধরনের মূর্তি এবং কোন প্রাণীর ছবিই রাখা নিষেধ। কারণ যে ঘরে ছবি এবং মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আমি কি চাই না আমার ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করুক? তাই বাইরে থেকে বাসায় ফিরে খালি ঘরেও সালাম দিতে হয় ফিরিশতাদেরকে এবং তারাও আমাদের সালামের জবাব দিয়ে থাকেন।

প্রাণীর ছবি আঁকা এবং ভাস্কর্য বানানো শিরক

ইসলামে যেমন ঘরে কোন প্রাণীর ছবি এবং মূর্তি রাখা নিষেধ তেমনি মুসলিমদের কোন প্রাণীর ছবি আঁকা এবং ভাষ্কর্য (মূর্তি) বানানো নিষেধ কারণ এই কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই কাজ শিরক হবে কেন? এখানে আল্লাহর সাথে কোথায় সংঘর্ষ হলো? আমরা জানি মহান আল্লাহই সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা। যার প্রাণ আমরা দিতে পারবো না সেই সকল জিনিসের সাদৃশ্য রূপ (ছবি বা মূর্তি) কিছুই আঁকা বা বানানো যাবে না। যেমন প্রাণী বাদে গাছ-পালা, নদী-নালা, প্রকৃতি ইত্যাদির দৃশ্য আকা যাবে এতে কোন আপত্তি নেই। আমাদের মনে হতে পারে মূর্তি শুধু মাটি দিয়ে যা তৈরী করা হয় তাই। আসলে এই আধুনিক যুগে অনেক কিছু দিয়েই মূর্তি হতে পারে যেমন, প্লাষ্টিকের পুতুল, কাপড়ের পুতুল, ফোম/তুলার পুতুল ইত্যাদি। আমাদের বাবা-মায়েদের মনে রাখতে হবে, বাচ্চাদের পুতুলও মূর্তি তুল্য। কোন কোন স্কলারের অভিমত যে একেবারে ছোট বাচ্চারা পুতুল দিয়ে খেলতে পারে কারণ মা আয়িশা (রা.) ছোটবেলায় পুতুল দিয়ে খেলা করেছেন কিন্তু রসূল ﷺ এই বিষয়ে তাকে মানা করেননি। তবে বাচ্চাদের পুতুল না দিতে পারলেই ভাল অথবা যতো কম দিয়ে পারা যায়।

জ্বীন জাতীর রহস্য এবং শিরক

জ্বীন সম্পর্কে আমরা অনেকেই পরিষ্কার ধারণা রাখি না। জ্বীন সম্পর্কে আমাদের মধ্যে নানারকম বিভ্রান্তিমুলক তথ্য প্রচলিত আছে। কুরআনে সূরা জ্বীনসহ আরো কয়েকটি সূরায় জ্বীনদের সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। জ্বীন মানব জাতীর মতো আর একটি জাতী। তারা আগুনের তৈরী, তাদের খাদ্য হচ্ছে হাড্ডি ও কয়লা। তারা দ্রুত চলাফেরা করতে পারে, অদৃশ্য হতে পারে, বিভিন্ন রূপধারণ করতে পারে এবং জ্বীনরা দীর্ঘ দিন বাঁচে অর্থাৎ তাদের আয়ু দেড়-দুই হাজার বছর হয়। তবে জ্বীন জাতী এবং মানব জাতীর মধ্যে মানব জাতী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের অনেকের ধারণা ইবলিস শয়তান ফিরিশতা। আসলে এই ধারণা ঠিক নয়, ইবলিশ শয়তান হচ্ছে অভিশপ্ত জ্বীন। সে আল্লাহর নিকট থেকে কিছু ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছে যার কারণে সে মানুষকে প্ররোচনা দিতে পারে। তবে জ্বীন গায়েব জানে না, এর প্রমাণ হচ্ছে সূরা নাহল। সোলায়মান (আ.) যখন লাঠিতে ভর দিয়ে মারা গিয়েছিলেন তখন জ্বীনরা তা বুঝতে পারেনি। জ্বীনরা মানুষকে ধোকা দেয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে উর্ধ আকাশে যখন কোন সিদ্ধান্ত হয় এবং ফিরিশতাদের মধ্যে কথোপকথোন হয় তা জ্বীনরা কান পেতে শুনার চেষ্টা করে এবং তার আংশিক শুনে এসে তার সাথে আরো কিছু বানিয়ে গনক বা পীর-ফকিরদের নিকট বলে। এই ভ্রান্তিমূলক তথ্য নিয়ে পীর-ফকিররা কেরামতি দেখায়, মুরীদদের বোকা বানায়, নিজেকে জাহির করে যে সে গায়েব জানে। জ্বীনদের দিয়ে কেউ কেউ কেরামতি দেখায় ঠিকই কিন্তু বেশীভাগে ক্ষেত্রেই তা ভুয়া। অনেকে জ্বীনদের নিকট সাহায্য চায় যা শিরক।

কেউ কেউ নাকি জ্বীনের মুরীদ হয়, জ্বীন তাদের পীর। মানুষ এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী শিরক করে দুষ্ট জ্বীনের প্ররোচনায় পরে। আর ইবলিস শয়তান যেহেতু নিজেই জ্বীন, মানুষকে শিরকে লিপ্ত করানোই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় সফলতা। তবে জ্বীনদের মধ্যে ভাল জ্বীনও রয়েছে, যেমন রসূল ﷺ তায়েফ থেকে ফেরার পথে কিছু জ্বীন তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

পালা গানের মাধ্যমে শিরকের প্রচার

বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে হাজার-হাজার শিল্পী আছে যারা পালা-গান করে। এর মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা উভয় রয়েছে। এলাকার প্রভাবশালি বা মাতব্বর শ্রেণীর লোকেরা স্টেজ করে এই পালা গানের আয়োজন করে এবং হাজার হাজার

দর্শকদের সামনে সারা রাত ধরে এই শিরকী অনুষ্ঠান চলে। এই পালা গানে দুইজন প্রতিদ্বন্দি শিল্পী থাকে, একজন গানে গানে প্রশ্ন করে আরেক জন গানে গানে তার উত্তর দেন। এদের গানের কথাগুলো নাকি মারেফতি, এর ভেদ বুঝা বড় দায়, এগুলো নাকি ইসলামের গোপন ইলম, শরিয়তের আলেমরা এগুলো জানেন না এবং এই জ্ঞানও তাদের নেই। এগুলো জানে এক শ্রেণীর গুরু ও তাদের শিশ্যরা যারা আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে আল্লাহতে বিলিন হয়ে গেছে। তাদের শরিয়ত পালন করতে হয় না, তাই তারা নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পালন করে না। এই ধরনের দুই একটি গানের উদাহরণ দেখা যাক ঃ

বিস্‌মিল্লাহর বিজ দশ খন্ড হলো, বল গুরু আমায় বলো
কোন খন্ডতে আছেন আল্লাহ, কোন খন্ডতে আমার রসূলুল্লাহ
কোন খন্ডতে গুরু তুমি, কোন খন্ডতে শিশ্য হলো?
দয়াল কোন খন্ডে আদম-হাওয়া, দয়াল কোন খন্ডে আসা-যাওয়া.
দয়াল কোন খন্ডে তোমায় পাওয়া।

আইছি ল্যাংটা..... যাইমু ল্যাংটা
ল্যাংটা যে হযরত সুলেমান.....।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শিরকী প্রতারণা

বিসমিল্লাহীর রহমানির রহিম - বর্তমান জামানার শ্রেষ্ঠ আম্বিয়া, জ্বীন-পরী সাধিকা মা ..... এর সান্নিধ্যে অশান্ত জীবনকে পরিপূর্ণ করুন, হতাশ হবেন না। আমার ২ যুগের নিরলশ আধ্যাত্মিক সাধনায় কষ্টার্জিত কুদরতি শক্তির অলৌকিক ক্ষমতাবল, ইন্দ্রজাল, এলহাম, বশিকরণ বিদ্যা ও জালালী তদবীরের মাধ্যমে ৩-৫ দিনের মধ্যে জ্বীনের তত্ত্বাবধানে যে কোন সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকি ইনশাআল্লাহ।

নোট ঃ "পাথরে ভাগ্য ফিরে বা মুসকিলে আসান" এই ধরনের হেডিংয়ে পত্রিকায় আমরা বিজ্ঞাপন প্রায় দেখি। উপরের প্যারাগ্রাফটি একটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন। এখানে কথায় ও কাজে শিরক করা হচ্ছে, এই মহিলা যে কাজ করছে তাকে ইসলামের দৃষ্টিতে বলে কুফর যা হারাম। সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে আমরা কুফরীর সাহায্য নিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত এবং অন্যদেরকেও সতর্ক করা উচিত।

পাকিস্তানী পীর এবং বিদেশী শিরক

আমাদের দেশের মানুষদের বিদেশী জিনিসের প্রতি একটি সফ্‌ট কর্নার আছে, যেমন বিদেশী কসমেটিক্স, বিদেশী কাপড়, বিদেশী ঔষুধ ইত্যাদি। আবার আমরা যেমন উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যংকক, সিংগাপুর, মালইশিয়া যাই। তেমনি অনেকে বিদেশী পীর ধরেন, তার মধ্যে পাকিস্তানী পীরেরা বেশী নাম করা, তারা নাকি খুব কামেল। বাংলাদেশে মাঝে মাধ্যেই পাকিস্তান থেকে পীরেরা আসেন এবং বিভিন্ন জায়গায় মাহফিল করেন। যারা তার মুরীদ তারাও এক প্রকার গর্ভবোধ করেন! কী আশ্চর্যের বিষয় সমস্ত পীরের জন্ম হয়েছে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর বাংলাদেশে।

আফ্রিকাতেও কিছু আধ্যাত্মিক দরবেশদের আস্তানা আছে, তাদের কাজ-কারবার আমাদের পীরদের থেকে কিছুটা ভিন্ন তবে উদ্দেশ্য এক মানুষকে বোকা বানানো, মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়া, মুরীদদেরকে পুজি করে ব্যবসা করা। আফ্রিকান পীরেরা ব্ল্যাক ম্যাজিক করে যা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও রয়েছে, যেমন, কলকাতা ও আসামে। অনৈসলামী কর্ম-কান্ডে পাকিস্তানের অবস্থা খুবই খারাপ। শিরক ও বিদ'আত পালনের দিক থেকে পাকিস্তান অনেক দূর এগিয়ে আছে যা কল্পনাও করা যাবে না, পুরো দেশটাই মনে হয় শিরকে ডুবে আছে। তাদের দেশে ধার্মিক লোক যেমনি বেশী তেমনি বিদ'আতী লোকও বেশী। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন।

নানারকম ভুল ধারণার মাধ্যমে শিরক

ভুল ধারণা ১ ঃ অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারে যে কবুতরগুলো দেখা যায় তা শাহজালাল সাহেবের। তাই অন্ধভক্তরা সেখানে গিয়ে কবুতরকে গম খাওয়ায় এই নিয়্যতে যে তার বিনিময়ে তিনি যে আশা নিয়ে সেখানে গেছেন তা কবুল হবে।

ভুল ধারণা ২ ঃ অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারে পুকুরে যে গজারমাছগুলো দেখা যায় তা আসলে জ্বীন এবং শাহজালাল সাহেব তাদেরকে মাছ বানিয়ে রেখেছেন। তাই অন্ধভক্তরা সেখানে গিয়ে মাছগুলোকে খাওয়ায় এই নিয়্যতে যে তার বিনিময়ে তিনি যে আশা নিয়ে সেখানে গেছেন তা কবুল হবে।

ভুল ধারণা ৩ ঃ অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.)-এর মাজারে পুকুরে যে কচ্ছপগুলো আছে তাও আসলে জ্বীন এবং বায়েজীদ বোস্তামী সাহেব তাদেরকে কচ্ছপ বানিয়ে রেখেছিলেন। তাই অন্ধভক্তরা সেখানে গিয়ে কচ্ছপগুলোকে গুড়া মাছ খাওয়াতো এই নিয়্যতে যে তার বিনিময়ে তিনি যে আশা নিয়ে সেখানে গেছেন তা কবুল হবে।

ভুল ধারণা ৪ ঃ অনেকে ব্যবসার লঞ্চ বা ট্রাক কিনে তার নাম রাখে ওলিদের নামে। তাদের ধারণা যে ওলিদের নামে নাম রাখলে হয়তো লঞ্চ ডুববে না বা ট্রাক এক্সিডেন্ট করবে না। যেমন বাংলাদেশে অনেক লঞ্চের নাম দেখা যায় শাহজালাল (রহ.) বা আমানতশাহ (রহ.), আবার ট্রাকের গায়ে দেখা যায় লিখা বাবার দোয়া ইত্যাদি। এই ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে শিরক।

ভুল ধারণা ৫ ঃ অনেকে নিজেদের ব্যবহৃত গাড়ির লুকিং গ্লাসে (রিয়ার ভিউ আয়নায়) তসবিহ ঝুলায়, আয়াতুল কুরছি ঝুলায়, চার কুল ঝুলায় এই বিশ্বাসে যে গাড়ি এক্সিডেন্ট করবে না। এই ধরনের বিশ্বাসও সম্পূর্ণরূপে শিরক।

ভুল ধারণা ৬ ঃ অনেকে বাসার দরজায় সূরা ইয়াসিন, চার কুল, বা আয়াতুল কুরছি লাগায় বা ঝুলায় এই ভরসায় যে এর কারণে বাড়ি বন্ধক থাকবে, দুষ্ট জ্বীন আসতে পারবে না বা কোন ক্ষতিকর কিছু বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। এই ধরনের বিশ্বাসও সম্পূর্ণরূপে শিরক।

কথা এবং চিন্তার মধ্যে শিরক

সিনারিও ১ ঃ ধরি আমি গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছি এবং রাতে হঠাৎ আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে খুব ঝড়-তুফান হয়ে গেল এবং পরের দিন আমি আমার পাশের গ্রামের এক ভায়ের সাথে আলাপ করছি যে, "কাল রাতে তুফানের বাতাসের বেগ এতই প্রবল ছিল যে ঘরের দুই পাশের টানাগুলো না থাকলে বড় বিপদই হয়ে যেত"।

সিনারিও ২ ঃ আবার যেমন, আমরা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি, পথে ছিনতাইকারী ধরল এবং কিন্তু পুলিশ চলে আসাতে ছিনতাইকারীরা আমাদেরকে ছেড়ে দিল। এবার আমি পরের দিন পাশের বাড়ির ভাবীকে বলছি, "গতকাল পুলিশ না আসলে বড়ই বিপদ হয়ে যেত, কাল ওদের জন্যই বেঁচে গেলাম"।

সিনারিও ৩ ঃ যেমন, আমরা কয়েক বন্ধু বাসে করে অন্য কোন শহরে যাচ্ছি। পথে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল এবং রাস্তা ছিল খুবই পিচ্ছিল এবং সরু, যার কারণে দুটি গাড়ি পাশাপাশি ক্রস করাটাও ছিল খুবই রিস্ক। আমরা যাওয়ার পথে দুটি এক্সিডেন্টও দেখলাম। সারাটা রাস্তা আমরা দু'আ-দুরূদ পড়তে পড়তে এক সময় গন্তব্যে এসে পৌঁছলাম। যা হোক, পরের দিন নাস্তার টেবিলে সকলে মিলে গল্প করছি যে, "ড্রাইভার বেটা খুবই পাকা ছিল সে না হলে বাঁচারই উপায় ছিল না"।

দেখা যায় এই ধরনের কথাবার্তা আমরা প্রায়ই বলে থাকি এবং চিন্তা করে বলি না যে কি বলছি। উপরের প্রতিটি সিনারিওতে আমরা কথার মাধ্যমে শিরক করে ফেলেছি। যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা, এখানে অন্য কারো কৃতিত্ব নেই। আমি হয়তো তর্কের খাতিরে বলবো আল্লাহ তো আছেনই তারপরও এটা একটা উছিলা। তাই এব্যাপারে কোন তর্ক নয়, কথা এবং চিন্তার মধ্যে কোন প্রকার ফাঁক থাকতে পারবে না, আর এটাই তাওহীদের মূল থিওরী।

শিশুর কপালে কালো টিপের রহস্য

আমাদের দেশে অনেক নবজাতক শিশুর মা বা নানী-দাদীরা শিশুর কপালে ১-২ বছর পর্যন্ত কালো টিপ দিয়ে থাকেন। এই বিষয়টি ইসলামী আকীদাগত দিক দিয়ে একটু ভেবে দেখা যাক।

- যদি শিশুর কপালে টিপ দেয়া হয় সৌন্দর্যের জন্য তাহলে কোন অসুবিধা নেই এবং এর সাথে শিরকের কোন সম্পর্ক নেই।
- যদি কেউ মনে করে যে কারো বদ নজর লাগতে পারে এবং এই কালো টিপ তাকে বদ নজর থেকে রক্ষা করবে তাহলে সেটা হবে শিরক।
- যদি কেউ মনে করে যে এই টিপ শিশুকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে তাহলে সেটাও হবে শিরক।
- যদি কেউ মনে করে এই টিপ না দিলে বাচ্চার অমঙ্গল বা ক্ষতি হতে পারে তাহলেও হবে শিরক।
- যদি কেউ মনে করে জিন-ভুত হতে শিশু রক্ষা পাবে তাহলে প্রথমে হবে শিরক এবং পরে হবে বিদ'আত।

শিরক হচ্ছে ঃ সৃষ্টার কোন ক্ষমতা তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দিলে সেটা হবে শিরক, যদিও তা সামান্য পরিমান হয়। উপরের সিনারিওগুলোতে কপালের টিপকে ক্ষতি থেকে রক্ষার ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে বা উসিলা বানানো হচ্ছে, তাই এই কাজটি শিরক। বিদ'আত হচ্ছে ঃ কোন বিষয়ে কুরআন-হাদীসে সমাধান থাকা সত্বেও তা বাদ দিয়ে নতুন কোন সমাধান বের করে তা পালন করা।

সৃষ্টির অনিষ্ট হতে শিশুদের রক্ষার দু'আ ঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ হাসান (রা.) এবং হোসাইন (রা.) এর জন্য এই বলে আশ্রয় নিতেন - "আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর নিকটা পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতিকর চক্ষু (বদ নজর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শয়নকালে (আয়াতুল কুরসী) পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হিফাযতের জন্য একজন ফিরিশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হতে না পারে। (সহীহ বুখারী)

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে ঘিরে নানারকম শিরক

যদি কেউ রসূল ﷺ -এর নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে অথবা প্রার্থনাকারীর পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য করতে অনুরোধ করে তাহলে তারাও শিরক করে। তাওহীদ আল-ইবাদাহ হলো শুধুমাত্র এক আল্লাহর কাছে সরাসরি প্রার্থনা করা যাবে, অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা বা অন্য কারো মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যাবে না। রসূল ﷺ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ "দু'আই, ইবাদত" (আবু দাউদ)। মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

"আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো না যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৬)

"আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর তারা তো তোমাদের মতোই বান্দা"। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৯৪)

অতিরিক্ত সতর্কতা

- অনেকে মনে করেন যে, রসূল ﷺ আল্লাহর নূরে তৈরী। অর্থাৎ তিনি আল্লাহরই একটা অংশ। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ভুল

এবং শিরক। রসূল ﷺ যে আল্লাহর নূরে তৈরী এই ধরনের দলিল কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই।

- রসূল ﷺ ভূমিষ্ট হবার সময় হাওয়া, আছিয়া ও মারিয়াম (আ.) উপস্থিত ছিলেন এই ধারণা ভুল এবং এই তথ্যের কোন কুরআন-হাদীসের দলিল নেই।

- আবার অনেকে মনে করেন রসূল ﷺ কে সৃষ্টি না করলে এই পৃথিবী বা এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি হতো না। এই বিশ্বাস সম্পুর্ণরূপে ভুল এবং এর কোন কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল নেই।

- সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ﷺ -এর নূর তৈরী করা হয়েছে! আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার আগে এবং সকলকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ রসূল ﷺ -কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে প্রথমে ময়ূর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এই ধরনের কথাবার্তা সম্পূর্ণ ভুল। এরও কোন কুরআন-হাদীসের দলিল নেই।

পরামর্শ ঃ জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় রসূল ﷺ -এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে গুনাহর কাজ করে ফেলছি। তাই একটা ফরমুলা সবসময় মনে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে যেখানেই অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত কিছু দেখবো সেখানেই একটু চিন্তা করবো এবং authentic দলিলের সাথে মিলিয়ে দেখবো যে এই ধরনের কিছু কুরআন-সুন্নাহতে আদৌ আছে কিনা। এই ব্যপারটা শুধু রসূল ﷺ -এর ক্ষেত্রে নয় যে কোন ওলির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু শুনলে অবশ্যই এর source জানার চেষ্টা করবো এবং সবাইকে সতর্ক করে দিবো।

মিলাদের মধ্যে শিরক

মিলাদের মধ্যে রসূল ﷺ -এর উপস্থিতি ঃ মিলাদের মধ্যে একসময় দাঁড়িয়ে 'ইয়া নাবী সালামালাইকা, ইয়া হাবিব সালামালাইকা, ইয়া রসূল সালামালাইকা' বলে সুরে টান দেয়া হয়, এর কারণ তখন মনে করা হয় যে রসূল ﷺ রূহানীভাবে ঐ মিলাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, আর সেই কারণেই তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো হয় (নাউযুবিল্লাহ)। আবার অনেক জায়গায় মিলাদের মধ্যে একটা খালি চেয়ারও রাখা হয়, যার কারণ হচ্ছে মিলাদ পড়তে পড়তে এক সময় রসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত হবেন এবং সেই চেয়ারে তিনি বসবেন (নাউযুবিল্লাহ)।

এছাড়া মিলাদের মধ্যে সুরে সুরে বানিয়ে বানিয়ে যে কথাগুলো বলা হয় তার মধ্যে অতিরঞ্জিত করতে গিয়ে অনেক শিরকী কথা-বার্তা এসে যায়। যেমন ঃ

তুমি যে নূরেরও ছবি, তুমি যে নিখিলের রবি।
তুমি না এলে দুনিয়ায়, হত না এ ধরার সবি।
ইয়া নাবী সালা মুআলাইকা,
ইয়া হাবীব সালা মুআলাইকা।'
মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখো সালাম .....।

রসূল ﷺ -এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে শিরক

ইতিহাস এবং তাফসীর পড়লে দেখা যায় যে ঈসা (আ.)-কে এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়ার তিনশত বছর পরে তৎকালীন কিছু ভক্ত মনে করল ঈসাতো মিরাকল-অলৌকিক, তারপর মনে করা শুরু করলো যে তিনি তো বাবা ছাড়া জন্ম, তারপর মনে করা শুরু করলো তিনি তো আল্লাহর নূরে তৈরী, তারপর অতিভক্তরা মনে করতে লাগলো যে তিনি তো আল্লাহরই একটা অংশ, তারপর ঈসা আলাইহিস সালামের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে করতে আস্তে আস্তে তাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছে। (নাউযুবিল্লাহ)। প্রথম দিকে তৎকালীন খ্রষ্টান পাদ্রীরা এই বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিরোধীতা করেছে, কিন্তু তারা দেখলো যে দিন দিন ভক্তদের দল ভারি হচ্ছে এবং এক সময় পাদ্রী এবং ভক্তদের মধ্যে তুমুল বিরোধও বাঁধে, কিন্তু ভক্তদের দল এতো ভারি যে পাদ্রীরা পেরে উঠে না এবং গীর্জা এবং পাদ্রীরাও তো ভক্তদের টাকায় চলে। এক সময় তারা এটা মেনে নেয় এবং সকলেই একই বিশ্বাসে চলে আসে এবং শয়তানের মিশন সাকসেসফুল হয়ে যায়।

ঠিক একইভাবে আমাদের মুসলিম সমাজে শয়তানের প্ররোচনায় পরে লক্ষ লক্ষ মুসলিম ঐ একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে মুহাম্মাদ ﷺ -কে আল্লাহরই একটা অংশ বানিয়ে ফেলেছে। তারা বলতে চায় আল্লাহর নূরে মুহাম্মাদ সৃষ্টি, তার মানে তিনি আল্লাহরই একটা অংশ। যেমন বাজারে গল্প প্রচলিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন মিরাজের রাতে উর্ধ আকাশে গিয়েছিলেন তখন একটা পর্যায় গিয়ে জিবরাঈল (আ.) আর যেতে পারেননি। তখন আল্লাহর রসূল একাই গিয়েছিলেন। অতি উৎসাহীরা বলেন যে, যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ আল্লাহর নূরে তৈরী সেহেতু আল্লাহর কাছে একমাত্র তিনিই যেতে পেরেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)

তাই রসূল ﷺ -কে নিয়ে কোন রকম বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বাস্তবে দেখা গেছে রসূল ﷺ -কে নিয়ে এতোসব দুরূদ বানানো হয়েছে যে সেখানে বাড়াবাড়ি করতে করতে সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং লাইনে লাইনে শিরক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। মিলাদের মধ্যে এবং নানারকম মারিফতি গানের শুরের টানে টানে শিরক মিশ্রিত করা হয়েছে। যে ভালবাসায় শিরক হয়ে যাচ্ছে সেই ধরনের অতি ভালবাসা আল্লাহরও প্রয়োজন নেই এবং আল্লাহর রসূলেরও প্রয়োজন নেই। যেমন রসূল ﷺ -কে নিয়ে শিরক মিশ্রিত কিছু মারিফতি গান ঃ

হাজবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ, মাফি ক্বালবি গাইরুল্লাহ
নূর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ, লাই লাহা ইল্লাল্লাহ
রহমাতাল্লিল আলামিন, সাইয়ে দিল মুরসালিন.... ।

মেরাজে যায় আল্লাহর হাবীব নূরে সাল্লে আলা
ইয়া রসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
মীমের পর্দা উঠাইয়া, আহাম্মদি রূপ ধরিয়া
আরশতে গিয়া বসলেন নাবী কামলেওয়ালা .... ।

অতীতে অনেক জাতি তাদের নাবীদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। খ্রীষ্টানরা ঈসা (আ.)-কে অতি ভালবাসা দেখাতে গিয়ে তাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছে (না'উযুবিল্লাহ)। তাই রসূল ﷺ তার উম্মতদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার প্রশংসা করতে গিয়ে তোমরা কখনো বাড়াবাড়ি করো না যেমন বাড়াবাড়ি (অতিরঞ্জিত) করেছে খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে নিয়ে। আমি আল্লাহর 'আবদ (দাস/Slave) মাত্র, সুতরাং আমাকে তোমরা আল্লাহর দাস এবং বার্তাবাহক (Slave and Messenger) হিসেবেই সম্মান করবে। (সহীহ বুখারী)

ভারতে হযরত বাল শাহ-র মাযার

ভারতের কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে নাকি রসূল ﷺ -এর চুল পাওয়া গেছে, আর তাঁর নামে সেখানে হয়েছে 'হযরত বাল শাহ-র' মাযার। কী আশ্চর্য আল্লাহর রসূল ﷺ সৌদিআরবের বাইরে কোথাও যাননি আর উনার চুল এসে গেল সুদূর ভারতে। আর তা নিয়ে বিদ'আতিরা বানিয়ে ফেলেছেন মাযার, চলছে নানারকম শিরকী কাজ-কারবার এবং ব্যবসা। (নাউযুবিল্লাহ) এছাড়া আল্লাহর রসূল ﷺ -এর চুল কোথাও থাকলেই বা কেন তা মাযার হবে?

আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে মিথ্যা কথা

একবার নাকি আল্লাহর রসূল ﷺ জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন তোমার বয়স কত? তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন আমার তো মনে নেই, কিন্তু আমি সপ্তম আকাশে একটি তারা উদিত হতে দেখতাম, এই তারকা-টা ৭০ হাজার বছর উদিত হয়ে থাকতো আবার ৭০ হাজার বছর ডুবে থাকতো, এভাবে করে আমি ৭৫ হাজার বার দেখেছি। তখন আল্লাহর রসূল বলেছেন জিবরাঈল তুমি কি জান ঐ তারকা-টা কে? তখন জিবরাঈল (আ.) বলেছেন না আমি তো জানি না। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঐ তারকা-টা হচ্ছে আমি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহর রসূল ﷺ যখন মিরাজের রাতে আরশে আজীমে গিয়েছিলেন তখন আল্লাহর রসূল ﷺ জুতা খুলতে গিয়েছিলেন তখন আল্লাহ নাকি বলেছেন, না না তুমি জুতা খুলো না, আজকে তোমার জুতার ধুলায় আমার আরশ ধন্য হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

রসূল ﷺ কর্তৃক জাবির (রা.)-এর মৃত সন্তানদের জীবিত করার ঘটনা প্রচলিত আছে তা মিথ্যা। হাদীসে এর কোন দলিল নেই।

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর নামে কোন যিকর করা যাবে না

রসূল ﷺ -এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর সাথে যেন কোন বিষয়ে সাংঘর্ষিক হয়ে না যায়। নাতে রসূল (গান) পরিবেশনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন গানের কথার মধ্যে শিরক চলে না আসে। বাজারে এমন অনেক নাতে রসূল আছে যেখানে রসূল ﷺ -এর অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করে ফেলা হয়েছে। এছাড়া বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে এমন অনেক শিরক মিশ্রিত নাথ ও কাউয়ালী রয়েছে যা স্পষ্ট শিরক। রসূল ﷺ -এর নামে কোন প্রকার যিকর করা যাবে না, যিকর হবে শুধু আল্লাহর নামে। যেমন পরিচিত কয়েকটি নজরুল সংগীতে আব্দুল আলিমের গানে এবং ইসলামী গানে গানে যিকর করা হচ্ছে ঃ

নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন সেই তো দু'জাহানের ধনী।

মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে।

তাওহীদের ই মুর্শিদ আমার মুহাম্মাদের নাম, মুর্শিদ মুহাম্মাদের নাম
ঐ নাম জপলেই বুঝতে পারি খোদায়ী কালাম, মুর্শিদ মুহাম্মাদের নাম ।

ও মদীনার বুলবুলি তোমার নামে ফুল তুলি..... ।

অতিরিক্ত প্রশংসায় যা বলা যাবে না এবং কেন

নূরে মুহাম্মাদ, নূর নাবী মুহাম্মাদ, নূরে মদীনা, হুজুর পাক, নাবী পাক (হলি প্রফেট), মাওলানা মুহাম্মাদ, হযরত মুহাম্মাদ । রসূল ﷺ -এর নামের সাথে নিম্নের বিশেষণগুলো যুক্ত করে আমাদের সমাজে নানারকম কথা চালু আছে । এখানেও অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ -কে নিয়ে শিরক এবং বিদ'আত সংযুক্ত করে ফেলেছে । তাই এই বিষয়ে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । যেমন যতো যায়গায় 'নূর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি আল্লাহর সাথে যুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ বলতে চাচ্ছে নাবী মুহাম্মাদ আল্লাহর নূরে তৈরী । (যদিও সহীহ আকীদার তথ্য হচ্ছে আল্লাহ নিজেও নূরের তৈরী না) । অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে শুধু রসূল ﷺ -এর নামের সাথে নয় অতিরিক্ত করতে করতে মদীনা শহরের সাথেও নূর সংযুক্ত করা হয়েছে । নাবীর নামের থাকে 'পাক' বলা (হলি) এই আকীদা খৃষ্টানদের থেকে এসেছে তাই আমাদের নাবীর সাথে পাক শব্দটি লাগানো ঠিক নয় । রসূল ﷺ -কে 'মাওলা' বলা যাবে না কারণ মহান আল্লাহ একমাত্র আমাদের 'মাওলা' যা সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতে রয়েছে ।

'হযরত' শব্দটি ফার্সি এর অর্থ মিষ্টার । আমরা যদি গোটা কুরআন দেখি আল্লাহ তার রসূলকে কোথাও 'হযরত' বলে ডাকেননি, আবার রসূল ﷺ এর হাজার হাজার হাদীস যদি দেখি সেখানে মুহাম্মাদ ﷺ এর নামের আগে কোথাও সাহাবারা 'হযরত' বলেননি । এছাড়া সকল সাহাবাদের জীবনী যদি পড়ি সেখানেও কোন সাহাবার নামের আগে 'হযরত' উপাধি নেই । বর্তমানের যতো এরাবিয়ান স্কলার আছেন কারে নামের আগে 'হযরত' নেই । এই স্পেশাল উপাধি ইরান ছাড়া ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রচলিত । এই অঞ্চলে হাজার হাজার পীর-বুজুর্গসহ বিভিন্ন হুজুরদের নামে আগে রয়েছে 'হযরত' আবার রসূল ﷺ -এর নামের আগেও রয়েছে 'হযরত' । আমরা জানি রসূল ﷺ -কে সবচেয়ে বেশী সম্মান করতেন এবং ভালবাসতেন সাহাবীরা, তাই তারাই যেহেতু তাঁকে সম্মান দেখাতে গিয়ে 'হযরত' উপাধি ব্যবহার করেননি তাই আমাদেরও উচিত হবে না অতিরিক্ত করা । উত্তম হচ্ছে কুরআন ও

হাদীসের ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকা। আমাদের এই উপমহাদেশে অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে একইভাবে রসূল ﷺ -এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে 'মুবারক' লাগানো হয়। যেমন ঃ চুল মুবারক, দাড়ি মুবারক, চেহারা মুবারক, দন্ত মুবারক ইত্যাদি, এগুলোও ঠিক নয়।

'ইয়া নাবী বা ইয়া রসূল' বলা যাবে না

'ইয়া' আরবী শব্দ, এর অর্থ 'হে'। আরবী ভাষায় ইয়া বলে তাকেই সম্মোধন করা হয় যিনি কথা বলার সময় সামনে উপস্থিত থাকেন। যেহেতু নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন এবং আমাদের সামনে উপস্থিত নেই সেহেতু ইয়া নাবী বা ইয়া রসূল বলা যাবে না। আমরা যদি রসূল ﷺ এর হাদীসগুলো দেখি (অরিজিনাল এরাবিক টেক্সট) তাহলে দেখতে পাওয়া যায় যে রসূল ﷺ এর জীবিত আবস্থায় সাহাবাগণ রসূল ﷺ -কে ইয়া বলে সম্মোধন করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর আর ইয়া বলে কোন কথা বলেননি।

'ইয়া হাবীব' বলা যাবে না

'ইয়া'-র বিষয়টিতো আমরা উপরে পরিষ্কার হলাম। আরবীতে হাবীব অর্থ বন্ধু। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে কোথাও হাবীব (বন্ধু) বলে ডাকেননি। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ যে আল্লাহর বন্ধু এর দলিল কুরআন ও সহীহ হাদীসে কোথাও নেই। তাই রসূল ﷺ -কে আল্লাহর হাবীব বলা আকীদা বিরোধী। হ্যাঁ, কুরআনে দলিল আছে যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ.)-কে হাবীব (বন্ধু) বলেছেন। এবং আল্লাহ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে আল্লাহর বান্দা বলেছেন (বনী ইসরাঈল)।

বালাগাল উলা বি কামালিহির রহস্য !

এটি ইরানের কবি শেখ সাদীর একটি কবিতা, এই কবিতায় কামালিহি অর্থাৎ কামালিয়াত আপত্তিকর শব্দ। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রসূল ﷺ -এর ক্ষেত্রে হতে পারে না। তাই এই কবিতা পড়া শিরক এবং বিদ'আত দু'টোই। এই কবিতা নিয়ে হুজুরদের মুখে আরো গল্প আছে যেমন ঃ শেখ সাদী এই কবিতার প্রথম তিন লাইন '১) বালাগাল উলা বি কামালিহি ২) কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি ৩) হাসুনাত জামিও হি সলিহি। এই পর্যন্ত লিখেছেন তার পরবর্তী লাইন আর মিলাতে পারছেন না। এক সময় তিনি ঘুমিয়ে গেলেন এবং ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন যে রসূল ﷺ এসে তাকে বলে দিচ্ছেন যে পরবর্তী লাইন লিখো ৪) সল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। (নাউযুবিল্লাহ) এগুলো

মিথ্যা কথা, আল্লাহর রসূল ﷺ কখনোই স্বপ্নে কবিতার লাইন মিলাননি। কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ বলেছেন মুহাম্মাদ কবি নন।

সবুজ টুপি, সবুজ পাগড়ী, সবুজ চাদরের রহস্য !

আমরা অনেক জায়গায়ই দেখি কিছু লোক সবুজ টুপি, সবুজ পাগড়ী, সবুজ চাদর ইত্যাদি পরে নানারকম ইসলামের নামে অনুষ্ঠান করে, মিছিল করে, র‍্যালি করে। কিন্তু এই সবুজ রং ব্যবহার করার অর্থ কী? আবার দেখা যায় বিভিন্ন মসজিদের গম্বুজের রং করা হয় সবুজ, এর অর্থ কী? উত্তর ঃ ইনাদের দাবী তারা হচ্ছেন আশেকে রসূল, তারা রসূল ﷺ এর ভালবাসায় দিশেহারা। আমরা জানি একসময় সৌদি আরব শাসন করতো তুরস্ক, তুর্কিদের মধ্যে অনেক বিদ'আতি আকীদা ছিল। তারা মসজিদকে নানারকম নকশা দিয়ে কারুকার্য করে, মসজিদের মিম্বর-মিহরাব অতীরঞ্জন করে, মসজিদের দেয়ালে কুরআনের আয়াত লিখে। মক্কার মসজিদে হারামে এবং মদীনায় মসজিদে নববীতে তারা বিশ রাক'আত তারাবীহর সলাত চালু করেছে যা আজো আছে। মসজিদের নববীর একটি গম্বুজ তারা সবুজ রংয়ের করেছে যা আজোও বিদ্যমান। সেই সবুজ দেখে আশেকে রসূলরা সর্বত্র সবুজ রং ব্যবহার করেন। ইসলামে আল্লাহর রসূল কোথাও সবুজ রং ব্যবহার করতে বলেননি এবং সহীহ হাদিসেও এর কোন দলিল নেই। তাই কেউ যদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে বা ইসলামের অংশ হিসেবে সবুজ রং ব্যবহার করে থাকে তাহলে তা হবে বিদ'আত।

রসূল ﷺ -এর জুতার নকশা বানিয়ে শিরক

রসূল ﷺ -এর জুতার নকশা বানানো হয়েছে এবং এর নাম দেয়া হয়েছে 'নায়াল শরীফ'। কিছু কিছু ভিত্তিহীন বইয়ে এই জুতার নকশার ফযীলতসহ বর্ণনা রয়েছে। আবার কিছু কিছু প্রকাশক তাদের প্রকাশিত কুরআনের প্রথম দিকে এই নকশা ছেপে দিয়েছে এবং এর নানারকম ফযীলত বর্ণনা করেছে। এছাড়া এই নকশা রয়েছে তাবলীগ জামাতের মূল গ্রন্থ ফাজায়েলে আমাল বইয়ের শুরুতেই (নাউযুবিল্লাহ)। অনেকে বরকতের আশায় এই নকশা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বরকতের আশায় ঘরে রাখে। এসবই সুস্পষ্ট শিরক। কৌতুহল পাঠকের জানার জন্য নিম্নে তাদের বানানো একটি জুতার নকশা দেয়া হলো। জুতার নকশা প্রিন্টেড ফাজায়েলে আমালের এই কপিটি আমাদের সংগ্রহে আছে, সেটারই কাভার পেইজ স্ক্যান করে এখানে দেয়া হয়েছে।

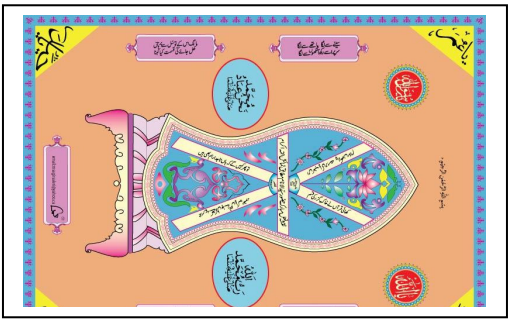

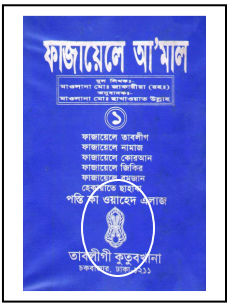

রসূল ﷺ -এর চুল, দাড়ি, পাগড়ী, খড়ম, তরবারী!

রসূল ﷺ -এর চুল, দাড়ি, পাগড়ী, পায়ের খড়ম, তরবারী ইত্যাদি তুরস্কের যাদুঘরে রয়েছে। এগুলো সত্যিই রসূল ﷺ -এর কিনা এর কোন ভিত্তি নেই। তাই এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভাল।

রসূল ﷺ -এর পায়খানা-প্রস্রাব নাকি পাক?

পীর-মুরীদরা বলেন রসূল ﷺ -এর পায়খানা-প্রস্রাব পাক! (নাউযুবিল্লাহ) ভক্তিস্বরূপ বলা হয় 'পায়খানা মুবারক, প্রস্রাব মুবারক, থুথু মুবারক'। রসূল ﷺ থুথু ফেললে সাহাবারা নাকি তা চেটে খাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করতেন! এই ধরনের কোন দলিল হাদীসের কোথাও নেই, রসূল ﷺ এবং সাহাবীদের জীবনীতেও কোথাও নেই। একবার নাকি রসূল ﷺ -এর জ্বর হয়েছে, তিনি প্রস্রাব করার জন্য বাইরে যেতে পারেননি এবং ঘরের মধ্যেই একটি মগের ভিতর প্রস্রাব করেছেন। মা আয়িশা ঐ মগটি ঘরের এক পাশে রেখে দিয়েছেন। একজন সাহাবী নাকি রসূল ﷺ -এর সাথে দেখা করতে এসেছেন তখন তিনি ঐ রেখে দেয়া এক মগ প্রস্রাব সিফা মনে করে তৃপ্তিসহকারে পান করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরনের মিথ্যা গল্প আমাদের দেশে ওয়াজে হাজার হাজার মানুষের সামনে করা হয় এবং টিভিতেও প্রচার করা হয়।

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ একজন মাটির তৈরী মরণশীল মানুষ ছিলেন, তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না, তিনি মারা গেছেন

মুসলিমদের মাঝে বিরাট এক গোষ্ঠি এই মতবাদে বিশ্বাসী যে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মারা যাননি, তিনি আজো বেঁচে আছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধরনের কথা সবই ভিত্তিহীন। মিলাদ মাহফিলে মওলভীরা উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয়ই

খোলামেলাভাবে তাদের বক্তৃতায় বলে থাকেন। একথা সাধারণত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের লোকদের মুখে বেশী শোনা যায়। যদিও কুরআন ও সহীহ হাদীসে এর স্বপক্ষে কোনই দলিল নেই।

রসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষ ছিলেন, আর মানুষ মরণশীল, সে অমর নয় কখনো। কুরআনে আল্লাহ তাঁর মুখ দিয়েই বলিয়েছেন ঃ *বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবে আমার উপর [আল্লাহর তরফ থেকে] অহী নাযিল হয় যে তোমাদের ইলাহ একমাত্র একজন*। [সূরা কাহ্‌ফ (১৮) আয়াত ১১০] আরো দেখি সূরা ইসরা (১৭) এর ৯৩ নম্বর আয়াত এবং সূরা ফুসসিলাত (৪১) এর ৬ নম্বর আয়াত। সুতরাং যারা বলে বেড়ায় যে মুহাম্মাদ ﷺ মানুষ ছিলেন না, তিনি মরেননি, তারা আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বানাবার চেষ্টা করছে (নাউযুবিল্লাহ)।

আল্লাহর ফিরিশতাগণ নূরের তৈরী, জিনেরা আগুনের তৈরী এবং মানুষেরা মাটির তৈরী -- এসব হচ্ছে আল্লাহর কুরআনের মাঝে প্রচারিত সত্য। মুহাম্মাদ ﷺ নূরের তৈরী ফিরিশতা ছিলেন না। সূরা আন'আম (৬) এর আয়াত ৫০ যেখানে তিনি নাবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, বল, ...*"আমি তোমাদের একথাও বলি না যে আমি একজন ফিরিশতা"* .....। আল্লাহ এই আয়াতে মুহাম্মাদ ﷺ যে নূরের তৈরী ছিলেন না সেকথা আমাদের জন্যে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

কুরআনের সূরা যুমার (৩৯)-এর ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ -কে উদ্দেশ করে জানাচ্ছেন ঃ *তুমিও মরবে এবং ওরাও (কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরাও) মরবে*। নাবী ﷺ ১৪দিন জ্বরাক্রান্ত থাকার পর ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন (হিজরী ১১ সনের ১২ই রবিউল আওয়াল) সোমবার প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় ইন্তিকাল করেন। এ সময় বয়স ছিল ৬৩ বছর ৪ দিন।

রসূল ﷺ -এর ইন্তিকালে সাহাবাগণের হৃদয়ে খুবই কষ্ট অনুভব করলেন। এমনকি 'উমার (রা.)-ও রসূল ﷺ -এর ইন্তিকালকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছিলেন না। ইন্তিকালের সংবাদ শুনে আবূ বাকর (রা.) ঘরে প্রবেশ করে মুখমণ্ডল হতে চাদর সরিয়ে কপালে চুমু দিয়ে বলেন, আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হোক! আপনার জন্য যে মৃত্যু অবধারিত ছিল তা আজ ঘটে গেছে। আল্লাহ আপনাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুদান করবেন না। এবার চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে বাহিরে এসে জনতার মাঝে দাঁড়ালেন; বললেন, 'তোমাদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি রসূল ﷺ -এর পূজা করত সে যেন জেনে রাখে যে, মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত সে যেন

জেনে রাখে যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।' আবু বকর (রা.) নিম্মের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, সবাই তা মুখস্থ করলেন।

"মুহাম্মাদ কেবল রসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ তাআলা অচিরেই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

দশজন দশজন করে সাহাবা রসূল ﷺ -এর ঘরে প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে জানাযার সলাত আদায় করেন। এ সলাতে কেউ ইমাম হননি। সর্বপ্রথমে সলাত আদায় করেন বনু হাশিম গোত্রের লোকেরা। এরপর আদায় করেন মুহাজির এরপর আনসাররা, এরপর অন্যান্য পুরুষ, এরপর মহিলা এবং সবশেষে শিশুরা। ১৩ই রবিউল আওয়াল মঙ্গলবার রাতে আয়িশা (রা.)-র ঘরে মুহাম্মাদ ﷺ -কে দাফন করা হয়। রসূল ﷺ যে বিছানায় ইন্তিকাল করেন সেই বিছানার নীচে কবর খনন করা হয়।

সূরা আলে ইমরান (৩) এর ১৪৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ *মুহাম্মাদ একজন রসূল মাত্র; তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?*

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে একজন রসূল হওয়ার পাশাপাশি মুহাম্মাদ ﷺ একজন মরণশীল মানুষও ছিলেন। আল্লাহ নিজেই সেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অথচ সেইসব লোকেরা স্বয়ং আল্লাহকেই চ্যালেঞ্জ করছে। সূরা আম্বিয়া (২১) এর ৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ -কে জানাচ্ছেন ঃ *আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা [কাফির-মুশরিক-মুনাফিক] কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?*

এই আয়াতে আল্লাহর বাণী অতি স্পষ্ট যে মুহাম্মাদ ﷺ -কে তিনি অমরত্ব দিয়ে এই জগতে পাঠাননি। অতএব অন্যান্য মানুষের মত তিনিও স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন একথায় বিশ্বাসের (আকীদার) অভাব কেন? এই জগতে প্রাণীর (মানুষসহ) জন্ম যেমন হচ্ছে তেমনি মৃত্যুও ঘটছে। প্রাণ আছে যার তার মৃত্যু আল্লাহ অবধারিত করেই তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেকথা কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েও দিয়েছেন। *"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে অর্থাৎ মরবে"* এই সাবধান বাণী মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে তিনবার উল্লেখ করেছেন -- ৩ ঃ ১৮৫; ২১ ঃ ৩৫ এবং ২৯ ঃ ৫৭।

মুহাম্মাদ ﷺ একজন মানুষ ছিলেন, তিনি উপরে উল্লিখিত আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়মের বহির্ভূত কোন সৃষ্টি ছিলেন না। তাই যখন আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন সেই নির্ধারিত মেয়াদ শেষে নাবীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এর মাঝে অস্বাভাবিকতার কোন স্থান নেই। এখানে রহস্য ও জটিলতা সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। কুরআনের স্পষ্ট ফায়সালা রয়েছে যে আল্লাহর সব সৃষ্টি অবশেষে তাঁরই নিকট ফিরে যাবে পৃথিবীতে তাদের কৃত সব কর্মকান্ডের হিসাব দিতে। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন - আমরা আল্লাহরই এবং আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।* (সূরা বাকারা ঃ ১৫৬)

সূরা হুদ (১১)-এর ৪ নম্বর আয়াতে জানিয়ে রেখেছেন ঃ "*আল্লাহরই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।*"

সূরা ইউনুস (১০)-এর ৪ নম্বর আয়াতেও আছে ঃ "*তাঁরই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।*"

কুরআন ও সহীহ হাদীসের এই শিক্ষাতে আমরা ঈমান এনেছি যে আল্লাহ একদিন তাঁর সকল সৃষ্টি ধ্বংস করবেন, তার আগেই আমরা মরে কবরস্থ হয়ে যাব, সব মৃতের আলমে বারযাখের জীবন শুরু হয়ে যাবে, একদিন কিয়ামত হবে, হাশর হবে, আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার সব আমলের বিচার হবে, তারপর জান্নাত অথবা জাহান্নামে আমাদের স্থান হবে। ঈমান ও আকীদায় আমরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ কারণ আমরা মুসলিম, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন, তিনিও বর্তমানে লোকচক্ষুর আড়ালে আলমে বারযাখে জীবন কাটাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন ঃ তিনি যদি মারা না গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি বর্তমানে আছেন কোথায়? কোন অবস্থায় আছেন?

দেখেশুনে মনে হয় এটা যেন ১২ ইমামে বিশ্বাসী ইস্না আশারা' শিয়াদের মত। এই শিয়াদের বিশ্বাস (আকীদা) এই যে ওদের দ্বাদশ (12^{th}) ইমাম মুহাম্মাদ মাহদি বিন আল-আস্কারী মরেননি, বরং তিনি ৮৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন, কিয়ামতের পূর্বে তিনি আবার আবির্ভূত হবেন। তাঁর পরিচয় হচ্ছে "আল-মুন্তাযার" অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সেই ইমাম যার জন্যে শিয়াগণ ইন্তেযার করছেন। এই ইমাম আল-মুন্তাযার-ই হচ্ছেন Official Head of the state of modern IRAN. তবে কি নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর অনুসারী সুন্নী মুসলিমদের একটি দল তিনি মরেননি এই কথায় বিশ্বাস করে 'ইসনা আশারা' শিয়াদের আকীদা গ্রহণ করেছেন?

এবার হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহীহ হাদীসে এই ভ্রান্ত ধারণার সমর্থনে কোথাও কোন বক্তব্য নেই। তবে Abu Ammar Yasir Qadhi তাঁর Du'a : The Weapon of the Believer গ্রন্থের ২২৬-২২৭ পৃষ্ঠায় Some Weak Hadith Regarding Du'a অধ্যায়ে একটি জাল বা fabricated হাদীসের উল্লেখ করেছেন যার বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হলো।

"আদম যখন [নিষিদ্ধ ফলটা খেয়ে] গুনাহগার হয়ে গেলেন তখন তিনি প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মাদের নামের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি তুমি আমাকে মাফ করে দাও।" আল্লাহ বললেন, "হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে কি করে জানলে? আমি তো এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি।" আদম বললেন, হে আল্লাহ! তুমি যখন তোমার হাত দিয়ে আমাকে সৃষ্টি করেছিলে এবং তৎপর তুমি আমার ভেতরে তোমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলে, তখন আমি মাথা উঠিয়ে তোমার আরশের পিলার (থাম)গুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে সেখানে লেখা রয়েছে ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদ রসূল আল্লাহ।" আমি জেনে গেলাম যে তোমার সৃষ্টির মাঝে তোমার প্রিয়তম না হলে তোমার নামের সংগে তার নামটা তুমি যুক্ত করতে না। "আল্লাহ তখন বললেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। মুহাম্মাদ আমার সৃষ্টির মাঝে আমার সর্বাধিক প্রিয়। সুতরাং তুমি তার দোহাই দিয়ে দু'আ (প্রার্থনা) কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। যদি মুহাম্মাদকে সৃষ্টির বাসনা না থাকতো, তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।"

এই হাদীসটার বর্ণনাকারী আল-হাকিম (২/৬১৫) কিন্তু আল-যাহাবী মন্তব্য করেছেন যে, "এটা একটা জাল বা fabricated হাদীস।" এই একই অভিমত পোষণ করেছেন ইবনে হাজর, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর ও অন্যান্যরা (আলবানীর al-Daifah গ্রন্থের ২৫ নম্বর আইটেম।)

হাদীসটির বর্ণনা ভংগীটা বিচার করলেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এই হাদীসের বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যের বিরোধী। মানুষের সৃষ্টির কারণ হলো এরা যেন [একমাত্র] আল্লাহরই ইবাদত করে [আল্লাহই একথা তাঁর কুরআনে বলেছেন]। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা, কিন্তু উক্ত হাদীসে যে অতিরঞ্জন রয়েছে, তা ইসলামের অংশ নয়। এই হাদীসটিকে ঐসব ব্যক্তিরাই ব্যবহার করে যারা নাবীর মর্যাদাকে তাওয়াস্‌সসুল (ওসিলা) হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু বানোয়াট বা জাল হাদীসের উপর নির্ভর করে তা দ্বীনের আমল করা যায় না!"

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে সরলমনা মু'মিনদের বিপথগামী আকীদার শিকার বানানোর উদ্দেশ্যেই এই জাল হাদীসটি তৈরী করা হয়েছে এবং এক শ্রেণীর আলেমরা এটাকে প্রচার করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছেন। এই ধরনের অপ প্রচারণা ও ভ্রান্ত আকীদার বিষয়ে আমাদের সদাসতর্ক থাকা উচিত। তা না হলে সহীহ ঈমান নিয়ে মৃত্যু হবে না, কঠিন শাস্তি পেতে হবে আখিরাতে।

শিরক এর উপর বাস্তব অভিজ্ঞতা

শিরকের বাস্তব উদাহরণ ঃ আমার এক মুরব্বী আত্মীয় কোন একটা কাজের সফলতা অর্জনের জন্য আমাকে নিয়ে গেলেন এক বিশিষ্ট ওলীর দরবারে। আমরা ভোরে রওনা হলাম এবং নদী-বিল পার হয়ে ১২টার দিকে গিয়ে পৌঁছলাম ওলীর বাড়ীতে। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু অংশ শিরকের শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা হলো।

ওলী-র বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম তিনি বাড়ীর বারান্দায় বসে আছেন। তার শরীরে কাপড় আংশিক অর্থাৎ শরীয়তের ফরয হুকুম 'সতর' পরোপুরি ঢাকা নেই। আমার সাথের মুরব্বী ওলীর কাছে গিয়েই পা ছুয়ে সালাম করলেন এবং ওলীর পা-খানি তার কোলের মধ্যে নিয়ে রীতিমতো টিপা শুরু করলেন, এভাবে বেশ কিছুক্ষণ তা করলেন। তারপর তার স্ত্রী আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন এবং নিজে সামনে থেকে আমাদের দুপুরের খাবার খাওয়ালেন। কিন্তু মিসেস ওলী আমাদের সামনে দিয়েই ঘোরাঘুরি করছেন এবং পরপুরুষের সামনে শরীয়তের ফরয হুকুম অনুযায়ী যে পর্দা করার কথা তার কোন নমুনাই তার মধ্যে দেখা যায়নি। সকলের সামনে দিয়ে যোহরের সলাতের ওয়াক্ত পার হয়ে গেল কিন্তু ওলী সাহেব, মিসেস ওলী এবং বাড়ীর কাউকেই যোহরের ফরয সলাত আদায় করতে দেখলাম না এবং আমাদেরকেও কেউ সলাতের তাগিদ দিলেন না। ওলী সাহেবের বাড়ীতে কোন প্রকার ইসলামী পরিবেশ দেখলাম না এবং মহিলাদের মধ্যে পর্দার কোন বালাইও দেখলাম না, রান্নাঘর থেকে শুরু করে আমরা বাড়ীর যে কোন জায়গায়ই যেতে পারছি। এক সময় ওলী সাহেব একটি চেয়ারে বাড়ির উঠানে বসলেন এবং তার নিয়মিত অভ্যাস অনুযায়ী আজেবাজে ভাষায় নোংড়া গালি-গালাজ শুরু করলেন। মিসেস ওলী আমাদেরকে জানালেন এই গালি-গালাজগুলি নাকি তার দু'আ। আর এই গালি-গালাজ শুনার জন্যই মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এখানে ছুটে আসে। তবে তিনি যার দিকে তাকিয়ে গালি-গালাজ করেন তার নাকি ভাগ্য খুলে যায়। বছরে

একবার তার বাড়ীতে ওরশ হয় এবং ওলীর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় লক্ষ লক্ষ লোক জড়ো হয়, সারা রাত গান-বাজনা হয় এবং কয়েক দিনব্যাপি এই অনুষ্ঠান চলে।

বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ

১. আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে একজন মানুষের কাছে গিয়েছি কিছু পাওয়ার জন্য যা সুস্পষ্টভাবে সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক। (আস্তাগফিরুল্লাহ)
২. ওলী সাহেব আল্লাহর ফরয হুকুম "সতর ঢাকা" অমান্য করে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে মানুষের সামনে বসে আছেন। (নাউযুবিল্লাহ)
৩. ওলী নিজেও সলাত আদায় করলেন না এবং আমরাসহ বাড়ীর অন্যরাও যোহরের ফরয সলাত আদায় করলাম না। (নাউযুবিল্লাহ)
৪. বাড়ীর মহিলারা আল্লাহর ফরয হুকুম পর্দা তাও পালন করছেন না। (নাউযুবিল্লাহ)
৫. ওলী সাহেব অসভ্য ভাষায় গালাগালি করছেন এবং সেটা সবাই দু'আ হিসেবে বিশ্বাস করছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

ইউটিউবে বিভিন্ন পীরের শিরকী ওয়াজ থেকে সাবধানতা

এখন ইউটিউব খুললেই শতশত পীরদের ওয়াজ দেখা যায়। একেক পীরের একেক রকম আকীদা, কারো চেয়ে কেউ কম নয়। এমন সুর করে, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে ওয়াজ করছেন, দর্শক-শ্রোতার আকীদার উপর সঠিক জ্ঞান না থাকলে সে তাই বিশ্বাস করে পালন করতে চাইবে, মনে হবে ঠিকই তো বলছেন। মাঝে মধ্যে তারা বুখারী-মুসলিম এর রেফারেন্সও দেন, কিন্তু হাদীস খুললে দেখা যাবে অন্য অর্থ। তাই এই বিষয়ে আমাদেরকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই সকল ওয়াজ না শুনাই ভাল, কারণ এদের বক্তব্য বেশীরভাগই কুরআন ও সহীহ হাদীস নির্ভরশীল নয়। যার কারণে যা ইসলামে নেই তাই তারা শুরু করে বক্তব্যে বলে যাচ্ছেন যা শুনতে খুবই আকর্ষণীয়।

তালাশ, ক্রাইম ওয়াচ ও একুশের চোখে শিরকের শিক্ষা

বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে দেশবাসির জন্য নিয়মিত অপরাধ চিত্র তুলে ধরে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে বিষয় ভিত্তিকভাবে রয়েছে, যা থেকে বাংলাদেশের ভন্ড পীর, ওলী, মাযার, ফকির, ভন্ড আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদির সচিত্র

পরিচয় পাওয়া যায়। কোন পীরের কত পাওয়ার তা এই অনুষ্ঠানগুলোতে তুলে ধরা হয়। কে কীভাবে ইসলামের নামে মানুষকে বোকা বানিয়ে অপরাধ করছে, টাকা বানাচ্ছে এবং নানা অনৈতিক কর্মকান্ড করছে তা ভিডিওসহ তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এদের মুরীদ হয়ে প্রতারিত হচ্ছে কিন্তু তারা তা বুঝছে না এবং বুঝার চেষ্টাও করছে না। এমন হয় মাঝে মধ্যে ভক্তরা টিভি রিপোর্টারদের উপর ক্ষেপে আসে মারতে, টিভি ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই ধরনের মাযারের মধ্যে রয়েছে ঃ পানি পাগলির মাযার, বিড়ি বাবা, তেল বাবা ইত্যাদি ইত্যাদি। ঢাকার একজন বিখ্যাত পীর হাজার হাজার ভক্তদের সামনে বলছেন, তিনিই মুহাম্মাদ, পূর্ণিমার চাদের মধ্যে তাকেই দেখা যায়। আবার বলছেন রসূল ﷺ -এর মেয়ে ফাতিমা (রা.) নাকি তার স্ত্রী এবং তার মুরীদরা আরশে আজিমে গিয়ে আল্লাহর চেয়ারে তাদের পীর মুরশিদকেই দেখবে। (নাউযুবিল্লাহ) পীর বাবার এই ধরনের কথা শুনে তার সামনের হাজার হাজার ভক্তরা বলছে আলহামদুলিল্লাহ। তিনি নিজেকে একবার মুহাম্মাদ বলছেন, আবার নিজেকে ফাতিমার হাসবেন্ড বলছেন, আবার তিনিই নিজেকে আল্লাহ বলছেন। ভন্ড পীর দিয়ে ইউটিউবে সার্চ দিলেই এই ঘটনা দেখা যাবে।

লাল শালু উপন্যাসের মাধ্যমে শিরকের শিক্ষা

আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়তাম তখন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচিত লাল শালু নামক একটি উপন্যাস ছিল আমাদের পাঠ্য। এই উপন্যাস অবলম্বনে একটি শিক্ষণীয় মুভিও আছে ইউটিউবে। এখানে পীর-মাযার এবং মুসলিম সমাজের অজ্ঞতার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কীভাবে পীরের জন্ম হয়, কীভাবে মাযারের জন্ম হয়, তারপর কীভাবে মাযারের খাদেমরা লাভবান হতে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই উপন্যাস থেকে শিক্ষণীয় হিসেবে একটু তুলে ধরা যাক। যেমন এক লোক তার নিজ এলাকায় দারিদ্রতা ও অভাবের তাড়নায় থাকতে না পেরে বাংলাদেশের অন্যত্র কোন এক দূরের গ্রামে চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে জংগলের মধ্যে একটি পুরানো কবর খুজে বের করে। তারপর ঐ গ্রামবাসীর নিকট তার স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে এটি বিশিষ্ট কামেল পীরের কবর যার নাম হযরত মওলানা পীরে মোদাচ্ছের। এরপর গ্রামবাসীর সহায়তায় ঐ কবরের আশেপাশের জংগল পরিষ্কার করে কবরের উপর লাল গিলাপ চড়ানো হয়, তার মাযারের উপর লাল চাদিয়া টানানো হয়, লম্বা বাসের মাথায় লাল পতাকা উড়ানো হয়। ঐ মাযারের নাম হয় মোদাচ্ছের

পীরের মাযার। মাযারের পাশেই তৈরী হয় ঐ স্বপ্নে পাওয়া মাযারের খাদেমের বাড়ি। এরপর থেকে দলে দলে মহিলা-পুরুষ আসতে থাকে মাযারে। মাযারের চার দিকে তাওয়াফ করে। কেউ একজন নিয়ত করে মাযারের পাশের একটি গাছে সুতা বাঁধে, তারপর থেকে নিয়ত করে ঐ গাছে মানুষ সুতা বাঁধতে থাকে, সুতা বাঁধতে বাঁধতে এক সময় গাছ মোটা হয়ে যায়। এরপর দূর-দূরান্ত থেকে প্যারালাইজ্ড রোগী, বোবা, ল্যংড়া-খোড়া, অন্ধ বিভিন্ন রোগের রোগী আসতে থাকে। তার সাথে আসতে থাকে চাল-ডাল, গাছের ফল-তরকারী, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল। দলে দলে মানুষ মাযারের লাল চাদরের উপর ছিটিয়ে দিতে থাকে নগদ টাকা-পয়সা। মাযারের নামে বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয় টিনের দান বাক্স। এভাবে মাযারের খাদেমের বাড়িতে আরো নতুন নতুন ঘর উঠতে থাকে, জায়গা-জমি বাড়তে থাকে। এক সময় খাদেম বিয়ে করে, তারপর আরেকটি বিয়ে করে। দিনের পর দিন মাযারের ব্যবসা বাড়তে থাকে। হ্যায় আফসোস, মানুষ অন্ধভাবে মাযারের কাছে চাইতে থাকে এবং শিরকের সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ)

কুসংস্কারে বিশ্বাস করা এবং শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলা শিরক

কোন্ বিষয়ে মানুষের ভাল হবে কী মন্দ হবে, কী করলে মানুষের মঙ্গল হবে আর কী করলে অঙ্গল হবে, এছাড়া কোন কিছু দিয়ে ভাগ্যকে পরিবর্তন করা বা কোন কিছু দিয়ে মঙ্গল ডেকে আনা, বা মানুষের ভবিষ্যত নিয়ে কোন প্রকারের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব কাউকে দেয়া হয়নি। যদি কেউ এই সকল বিষয়ের দায়িত্ব নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয় বা নিজের সিদ্ধান্তে দিয়ে থাকে তাহলে তা মহান আল্লাহর ক্ষমতার সাথে দ্বন্দ বাঁধে, নিম্নের কুসংস্কারের লিষ্ট অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই আল্লাহর দায়-দায়িত্ব এবং ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হচ্ছে, অর্থাৎ স্রষ্টার ক্ষমতা তার সৃষ্টি নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিচ্ছে, আর এখানেই হচ্ছে সুস্পষ্ট শিরক।

তাই আমাদের সমাজে কুসংস্কারগুলো হচ্ছে মানুষের মনগড়া বানানো, এই ধরনের কোন বিষয় ইসলামে নেই। তাই বেশীরভাগ কুসংস্কারই শিরকের অন্ত র্ভুক্ত। নিম্নের এই কুসংস্কারের লিষ্টের মধ্যে কিছু বিদ'আতও রয়েছে। ইসলাম শুভ-অশুভ এই প্রথাগুলি বাতিল করেছে কারণ এগুলি তাওহীদ আল-আসমা-

সিফাত এর ভিত ক্ষয় করে ফেলে এবং মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তিতে বিশ্বাস করতে শিখায়। কারণ এই প্রথাগুলি ঃ

১) একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করে এবং

২) ভাল-মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিষের উপর অর্পণ করে।

সুতরাং তাওহীদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ সংকেত বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরকের শ্রেণীভুক্ত। সূরা আল-হাদীদ এর ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।"

স্বামীর অমঙ্গল সংক্রান্ত কুসংস্কার

১. স্ত্রীর হাতে বালা বা চুড়ি না পড়লে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
২. স্ত্রী চুড়ি ছাড়া খালি হাতে স্বামীকে ভাত বেড়ে দিলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
৩. স্ত্রীর নাকে নাক ফুল না থাকলে স্বামী বেঁচে না থাকার প্রমাণ।
৪. স্ত্রী নাক ফুল না পরলে তার নিঃশ্বাসে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
৫. স্ত্রী স্বামীর নাম মুখে বললে অমঙ্গল হয়।
৬. স্বামীর আগে স্ত্রী খেলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
৭. স্বামীর উপর স্ত্রীর পা রাখলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।

নারীদের নিয়ে কুসংস্কার

৮. কিছু কিছু মেয়েলোক রাক্ষসগণ (অলক্ষুণে) ইত্যাদিতে বিশ্বাস করা।
৯. টেরা চোখের মেয়েলোক লক্ষী বা অলক্ষী এরকম মনে করা।
১০. ঘর থেকে বের হয়ে বিধবা নারী চোখে পড়লে যাত্রা অশুভ হবে।
১১. বিধবা নারীকে সাদা কাপড় পরিধান করতে হবে।
১২. মহিলাদের মাসিক অবস্থায় তার হাতের কিছু খাওয়া যাবে না।
১৩. মহিলারা মাসিক অবস্থায় ঘর ঝাড়ু দিতে পারে না।
১৪. স্ত্রী ফরয গোসল না করে ভাত রান্না করতে পারে না।
১৫. স্ত্রী ফরয গোসল না করে হাড়ি থেকে ভাত বারতে পারে না।

১৬. স্ত্রী ফরয গোসল না করে ক্ষেত থেকে বেগুন পেরে আনতে পারে না।
১৭. আশ্বিন মাসে নারী বিধবা হলে আর কোন দিন বিয়ে হবে না।
১৮. প্রেগন্যান্ট অবস্থায় কিছু কাটা-কাটি বা জবেহ করা যাবে না।
১৯. প্রেগন্যান্ট অবস্থায় জোড়া কলা খেলে জোড়া সন্তান জন্ম নিবে।
২০. নতুন স্ত্রী কোন ভাল কাজ করলে শুভ লক্ষণ।
২১. বিয়ে বাড়িতে আগুন লাগলে নতুন স্ত্রী অপয়া বলে বিশ্বাস করা।
২২. খাটো মেয়ে মানুষ বিয়ে করা ভালো না, অলক্ষী।
২৩. অপবিত্র অবস্থায় ঘর ঝাড়ু দেয়া যায় না।
২৪. অপবিত্র অবস্থায় মাটিতে পা রাখলে মাটি অভিশাপ দেয়।

রাত সংক্রান্ত কুসংস্কার

২৫. রাতে বাঁশ কাটা যায় না।
২৬. রাতে গাছের পাতা ছেঁড়া যায় না।
২৭. রাতে গাছের ফল পারা যায় না।
২৮. রাতের বেলা কোন কিছু লেন-দেন করা যায় না।
২৯. রাতের বেলা কাউকে সুই-সূতা দেয়া যায় না।
৩০. রাতের বেলা কাউকে চুন ধার দিলে চুন না বলে দই বলতে হয়।
৩১. রাতে নখ, চুল ইত্যাদি কাটতে নেই।
৩২. রাতে কান চুলকাতে নেই।
৩৩. রাতে ঘরের ময়লা পানি বাইরে ফেলা যায় না।
৩৪. রাতে কাউকে পেঁয়াজ-রসুন ধার দেয়া যায় না।
৩৫. রাতে দোকানে বাকী বিক্রয় করা যায় না।
৩৬. রাতে কাউকে ঘরের জিনিস ধার দেয়া যায় না।

দিন সংক্রান্ত কুসংস্কার

৩৭. শনির দশা অর্থাৎ শনিবার অলক্ষুণে, এই দিনে কোন কাজ শুরু না করা।
৩৮. শনিবার জমির দলিল রেজিষ্ট্রি না করা।
৩৯. শনিবার দোকান উদ্ভাবন না করা।
৪০. শনিবার নতুন বউকে মায়ের বাড়িতে যেতে না দেয়া।
৪১. ভর দুপুরে কাকের কা কা ডাক শুনে বিপদ সংকেত মনে করা।
৪২. রবিবার ও বৃহস্পতিবার বাঁশ ঝাড় না কাটা।
৪৩. সকালে ঘর ঝাড়ু দেয়ার পূর্বে কাউকে কোন কিছু দেয়া যায় না।

৪৪. মঙ্গলবার কোন আত্মীয় মারা গেলে উক্ত বারেই তিনজন আত্মীয় মরে যাবে এমন ধারণা করা।
৪৫. সকাল বেলা দোকান খুলে যাত্রা (নগদ বিক্রি) না করে কাউকে বাকী দেয়া যায় না। তাহলে সারা দিন বাকীই যাবে।
৪৬. জন্মের দিন চুল বা নখ কাটা যায় না।

লক্ষ্মী সংক্রান্ত কুসংস্কার

৪৭. আমার এই ছোট সন্তানটি লক্ষ্মী।
৪৮. আমার বউমা লক্ষ্মী।
৪৯. আমার জামাই লক্ষ্মী।
৫০. আমার স্বামী লক্ষ্মী।
৫১. আমার পোষা কুকুরটি লক্ষ্মী।
৫২. আমার গাভিটি লক্ষ্মী।
৫৩. আমরা গাড়িটি লক্ষ্মী।
৫৪. দোকানের প্রথম কাষ্টমার লক্ষ্মী।
৫৫. 'অলক্ষুণে কথা' এই মন্তব্য শিরক।

ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কুসংস্কার

৫৬. শিশুর নজর লাগবে বলে কপালে পায়ে কাজলের ফোটা দেয়া।
৫৭. বাচ্চারা যদি ঘর ঝাড় দেয় তাহলে মেহমান আসবে বলে মনে করা।
৫৮. বাচ্চাদের গায়ে লাঠি বা ঝাড়ুর ছোঁয়া লাগলে জ্বর আসবে বলে মনে করা এবং পায়ে পানি ছিটিয়ে দেয়া।
৫৯. বাচ্চাদের টপকিয়ে বা ডিঙিয়ে গেলে সে আর লম্বা হবে না মনে করা।
৬০. ছোট বাচ্চার হাতে লোহা পরিধান করানো। জন্মের পর বিছানার নিচে মামার চামড়ার জুতার টুকরা, লোহা ও শুকনো মরিচ ইত্যাদি রাখা।

পশু-পাখি সংক্রান্ত কুসংস্কার

৬১. ভর দুপুরে কাক কাঁ কাঁ করে ডাকলে বিপদ আসবে।
৬২. শুঁকুন ডাকলে মানুষ মারা যাবে।
৬৩. পেঁচা ডাকলে বিপদ আসবে।
৬৪. দাঁত উঠতে বিলম্ব হলে সাত ঘরের চাউল উঠিয়ে তা রান্না করে কাককে খাওয়াতে হবে এবং নিজেকেও খেতে হবে।
৬৫. শুকরের নাম মুখে নিলে ৪০দিন মুখ নাপাক থাকে।

৬৬. বাছুরের গলায় জুতার টুকরা ঝুলালে কারো কু দৃষ্টি থেকে বাঁচা যায় ।
৬৭. পাখি ডাকলে বলা হয় ইষ্টি কুটুম (আত্মীয়) আসবে ।
৬৮. কাল বিড়াল বা এক পাওয়ালা পশু-পাখি দেখলে অশুভ মনে করা ।
৬৯. বিড়াল মারলে আড়াই কেজি লবণ দিতে হবে ।
৭০. গলায় কাটা বিঁধলে বিড়ালের পা ধরে মাপ চাইতে হবে ।
৭১. ভাই-বোন মিলে মুরগী জবেহ করা যাবে না ।
৭২. ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হবে ।
৭৩. মুরগীর মাথা খেলে মা-বাবার মৃত্যু দেখবে না ।
৭৪. গরুকে লাথি মারা যায় না ।

বিয়ে নিয়ে কুসংস্কার

৭৫. চৈত্র মাসে বিয়ে করা যাবে না এই মাস অশুভ ।
৭৬. মহরম মাসে বিয়ে-শাদী নিষেধ, এই মাস শোকের মাস ।
৭৭. শনিবারে বিয়ে করা যাবে না, শনিবার অশুভ ।
৭৮. বিয়ের দিন ধান-ঘাস দিয়ে বধুবরণ এবং দুধের উপর দিয়ে বরকনে হাটা ।
৭৯. বিয়ের কাবিনে 'এক টাকা' সংযুক্ত করা । যেমন 'এক লক্ষ এক টাকা' ।
৮০. নতুন স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে প্রথম পর্যায়ে আড়াই দিন অবস্থান করতে হবে ।
৮১. চন্দ্র বর্ষের কোন মাসে বা কোন দিনে অথবা বর/কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্ব পুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিবাহ শাদী হওয়া ।
৮২. বিয়েতে বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহদি, হলুদ, ধান-দূর্বা ঘাস, কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নেয়া ।
৮৩. বিয়েতে মাটির চাটিতে তেল নিয়ে আগুন জ্বালানো ।
৮৪. স্ত্রী ও বরের কপালে হলুদ লাগায়, মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো চাটি বর-কনের মুখের সামনে ধরা ও আগুনের ধুঁয়া দেয়া ।
৮৫. বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিড়িতে বসিয়ে বা সিল-পাটায় দাড় করিয়ে দই-ভাত খাওয়ান ।
৮৬. বাসর রাতে বিড়াল মারতে হয়, নইলে স্বামীর কপালে দুঃখ আছে ।
৮৭. জন্মের মাসে বিয়ে করা যাবে না ।
৮৮. এক গালে চড় খেল বিয়ে হবে না ।

খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কুসংস্কার

৮৯. ভাত প্লেটে নেয়ার সময় একবার নিতে নেই, এতে অমঙ্গল হয় ।

৯০. এক লোকমা খেলে পানিতে ডুবে মারা যাবে।
৯১. পাতিলের মধ্যে খাবার খেলে মেয়ে সন্তান জন্ম নিবে।
৯২. পোড়া খাবার খেলে সাতার শিখবে।
৯৩. পিপড়া বা জল পোকা খেলে সাতার শিখবে।
৯৪. পাতিলের মধ্যে খাবার থাকা অবস্থায় তা খেলে পেট বড় হয়ে যাবে।
৯৫. খাওয়ার সময় গলায় আটকে গেলে বা ঢেকুর আসলে অন্য কেউ তাকে মনে করেছে এইটা মনে করা।
৯৬. ভাত খাওয়ার সময় হাচি আসলে বলা হয় পোড়া কপালে।
৯৭. খাবার পর যদি কেউ গা মোচড় দেয়, তবে বলা হয় খাবার না কি কুকুরের পেটে চলে যায়।

ব্যবসা সংক্রান্ত কুসংস্কার

৯৮. বরকতের আশায় ব্যবসার ক্যাশ বাক্সে হলুদের টুকরা এবং কড়ি রাখা।
৯৯. বরকতের আশায় দোকান খোলার শুরুতে সোনা-রূপার পানি ছিটানো বা তুলসি পাতার পানি ছিটানো এবং আগরবাতি জ্বালানো।
১০০. সকালে দোকান খুলে স্পীকারে কুরআন তিলাওয়াত বাজানো।
১০১. ব্যবসার শুরুতে প্রথম কাষ্টমারের কাছে বিক্রি করতেই হবে এটা মনে করা।
১০২. দোকানের প্রথম কাষ্টমার ফেরত দিতে নেই।
১০৩. প্রথম কাষ্টমারের নিকট বাকী বিক্রি করতে নেই।
১০৪. বরকতের আশায় ব্যবসার শুরুতে মিলাদ দেয়া অথবা কোন মাজারে যাওয়া।
১০৫. কেউ গাড়ি কিনলে বা গাড়ির ব্যবসা শুরু করলে ঐ গাড়িটি পীরের দরবারে নিয়ে যাওয়া অথবা কোন মাজারে নিয়ে যাওয়া।

যাত্রা সংক্রান্ত কুসংস্কার

১০৬. ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় কেউ হাঁচি দিলে সাথে সাথে বের না হওয়া, একটু বসে পরে বের হওয়া।
১০৭. ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় পায়ের সাথে হোঁচট খেলে সাথে সাথে বের না হওয়া, একটু বসে তার পরে বের হওয়া।
১০৮. বাইরে যাওয়ার সময় ঝাঁড়ু দেখলে অশুভ মনে করা।
১০৯. এক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা পাবার আশায় গাড়ির লুকিং গ্লাসে কুরআনের আয়াত, কাবা ঘরের ছবি, তসবি ঝুলানো ইত্যাদি।
১১০. কোন ব্যক্তি বাড়ি হতে বের হওয়ার সময় তার সামনে খালি কলস পড়লে বা কেউ খালি কলস নিয়ে সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে যাত্রা অশুভ হয়।

১১১. বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় কেউ পেছন থেকে ডাকলে অমঙ্গল হয় ।
১১২. দরজার সামনে জুতা উল্টিয়ে থাকলে অমঙ্গল হয় ।
১১৩. সকাল বেলা বাসি ঘর ঝাড়ু না দিয়ে বের হলে অমঙ্গল হয় ।
১১৪. কেউ ঘর থেকে বের হলে পিছন দিকে ফিরে তাকানো নিষেধ । তাতে নাকি যাত্রা ভঙ্গ হয় বা অশুভ হয় ।
১১৫. সকাল বেলা গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না বলে যাত্রা অশুভ মনে করা ।

ভাঙ্গা জিনিস নিয়ে কুসংস্কার

১১৬. ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে অমঙ্গল হয় ।
১১৭. ভাঙ্গা চিরুনী দিয়ে মাথা আচরালে অমঙ্গল হয় ।
১১৮. ভাঙ্গা প্লেটে খাবার খেলে অমঙ্গল হয় ।
১১৯. ভাঙ্গা গ্লাসে পানি খেলে অমঙ্গল হয় ।
১২০. ভাঙ্গা কুলায় চাল ঝাড়লে অমঙ্গল হয় ।
১২১. কান্দা ভাঙ্গা পাতিলে রান্না করলে অমঙ্গল হয় ।

অশুভ ও অমঙ্গল নিয়ে কুসংস্কার

১২২. তেল পড়ে গেলে বা লবনের বাটি উল্টে পড়া অশুভ সংকেত মনে করা ।
১২৩. ১৩ সংখ্যাকে অশুভ বা Unlucky thirteen মনে করা শিরক ।
১২৪. ৭ সংখ্যাকে শুভ বা Lucky seven মনে করা শিরক ।
১২৫. এক শালিক দেখলে অমঙ্গল হয় ।
১২৬. দুই শালিক দেখলে শুভ মনে করা হয় ।
১২৭. কাপড় পরা অবস্থায় সেলাই করলে অমঙ্গল হয় ।
১২৮. দা, কাচি বা ছুরি ডিঙ্গিয়ে গেলে অমঙ্গল হয় ।
১২৯. শিল পাটা ডিঙ্গিয়ে গেলে অমঙ্গল হয় ।
১৩০. ভাতে হাড়ী ডিঙ্গিয়ে গেলে অমঙ্গল হয় ।
১৩১. ধান/চাল ঝাড়ার কুলায় পা লাগলে অমঙ্গল হয় ।
১৩২. ধানের উপর দিয়ে জুতা পায়ে হেটে গেলে অমঙ্গল হয় ।
১৩৩. হঠাৎ বাম চোখ কাঁপলে দুঃখ আসে ।
১৩৪. কাচা মরিচ হাতে দিতে নেই এতে অমঙ্গল হয় ।
১৩৫. রুমাল, ছাতা, হাত ঘড়ি ইত্যাদি কাউকে ধার স্বরূপ দিলে অমঙ্গল হয় ।
১৩৬. গেঞ্জি ও গামছা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতে নেই এতে অমঙ্গল হয় ।
১৩৭. তিন রাস্তার মোড়ে বসতে নেই এতে অমঙ্গল হয় ।
১৩৮. গোছলের পর শরীরে তেল মাখার পূর্বে কোন কিছু খেলে অমঙ্গল হয় ।

১৩৯. খালি ঘরে সন্ধ্যার সময় বাতি দিতে হয় । না হলে ঘরে বিপদ আসে ।
১৪০. নতুন কাপড় পরিধান করার পর পিছনে তাকাতে নেই এতে অমঙ্গল হয় ।
১৪১. ঘরের চৌকাঠে বসা যাবে না এতে অমঙ্গল হয় ।
১৪২. কুরআন মাজীদ হাত থেকে পড়ে গেলে আড়াই কেজি চাল দিতে হবে তা না হলে অমঙ্গল হয় ।
১৪৩. পরনের কাপড় দিয়ে মুখ মুছলে অমঙ্গল হয় ।
১৪৪. তুলসী গাছ উপরে ফেললে বা ছিড়ে ফেললে অমঙ্গল হয় ।
১৪৫. আমার মনে কু ডাক ডাকছে, মনে হয় কোন অমঙ্গল হবে ।

রসূল ﷺ -কে নিয়ে শিরক

১৪৬. রসূল ﷺ আল্লাহর নূরে তৈরী ।
১৪৭. রসূল ﷺ -এর ছায়া ছিল না ।
১৪৮. রসূল ﷺ -এর অন্যান্য মানুষের মতো স্বাভাবিক জন্ম হয়নি ।
১৪৯. রসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেননি, তিনি হায়াতুন্নাবী ।
১৫০. রসূল ﷺ তার উম্মতদের কথা শুনতে পান ।
১৫১. রসূল ﷺ -কে সৃষ্টি করা হয়েছে সকল সৃষ্টির পূর্বে ।
১৫২. রসূল ﷺ -এর নামের উছিলায় আদম (আ.)-কে ক্ষমা করা হয়েছে ।
১৫৩. রসূল ﷺ -এর উছিলায় এই দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে ।
১৫৪. রসূল ﷺ -কে সৃষ্টি করা না হলে এই পৃথিবী সৃষ্টি করা হতো না ।
১৫৫. রসূল ﷺ হাযির নাযির ।

বিবিধ কুসংস্কার

১৫৬. কারো কথা স্মরণের সাথে সাথে সে উপস্থিত হলে দীর্ঘ হায়াত আছে বলা ।
১৫৭. মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে অবশ্যই বৃষ্টি আসবে বলা ।
১৫৮. ঘুম থেকে উঠে অমুকের মুখ না দেখা ।
১৫৯. বাজী ধরা ।
১৬০. ভয় পেলে লবন পানি খাওয়ানো বা বুকের মধ্যে থুতু দেয়া ।
১৬১. পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম না খাওয়া, খেলে পরীক্ষায় ডিম পাবে ।
১৬২. ঘরের ভিতরে প্রবেশ কৃত রোদে অর্ধেক শরীর রেখে না বসা । (অর্থাৎ শরীরের কিছু অংশ রৌদ্রে আর কিছু অংশ বাহিরে) তাহলে জ্বর হয় ।
১৬৩. ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা আসে এবং বাম হাতের তালু চুলকালে বিপদ আসে ।
১৬৪. নতুন কাপড় পরিধান করার পূর্বে আগুনে ছেক দিয়ে পড়তে হয় ।

১৬৫. হাত থেকে প্লেট পড়ে গেলে মেহমান আসবে ।
১৬৬. তিনজন একই সাথে চলা যাবে না ।
১৬৭. হঠাৎ টিকটিকির আওয়াজ শুনা যায়, তখন একজন অন্যজনকে বলে উঠা "তোমার কথা সত্য, কারণ, টিকটিকি ঠিক ঠিক করছে" ।
১৬৮. একজন অন্য জনের মাথায় টোকা খেলে দ্বিতীয় বার টোকা দিতে হয়, একবার টোকা খাওয়া যাবে না । নতুবা মাথায় ব্যথা হবে/শিং উঠবে ।
১৬৯. কোন ফসলের জমিতে বা ফল গাছে যাতে নযর না লাগে সে জন্য মাটির পাতিল সাদা-কালো রং করে ঝুলিয়ে রাখতে হয় ।
১৭০. নখ চুল কেটে মাটিতে দাফন করতে হয়, কেননা বলা হয় কিয়ামতের দিন এগুলো খুঁজে বের করতে হবে ।
১৭১. হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলে বাসায় অতিথি আসে ।
১৭২. ঘরের ভিতর প্রজাপতি আসলে টাকা আসে ।
১৭৩. কাছে লোহা জাতীয় কিছু থাকলে ভুতে বা জিনে ধরে না ।
১৭৪. লাকি জামা, লাকি প্যান্ট পড়লে, নতুন মাঠে খেলা পড়লে প্রিয় দল জিতে ।
১৭৫. কাউকে রুমাল দিলে তার সাথে ঝগড়া হয় ।
১৭৬. সিগারেট খেলে জান্নাতে লাইলি-মজনুর বিয়ে দেখা যাবে না ।
১৭৭. ঘরে ও বারান্দায় ছবি লটকানো শিরক ।
১৭৮. সোপিচের নামে মূর্তি সাদৃশ্য প্রাণী আকৃতি বস্তু সাজানো শিরক ।
১৭৯. ভাগ্য সম্পর্কে জানার জন্য জ্যোতিষীকে হাত দেখানো ।
১৮০. জ্যোতিষী বা কারো ভবিষ্যৎ বাণী বিশ্বাস করা ।
১৮১. সকালে ঘুম থেকে উঠে অপবিত্র অবস্থায় ঘরের দরজা খোলা যায় না ।
১৮২. হাত থেকে গ্লাস পরে গেলে মেহমান আসতে পারে ।
১৮৩. কুরআন শরিফের শুরুর দিকে তাবিজ ছাপানো ।
১৮৪. কাশ্‌ফ এবং ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশ লাভ হতে পারে বলে মনে করা ।
১৮৫. শিখা অর্ণিবানে শ্রদ্ধা (কোন আগুনের সামনে শ্রদ্ধা) নিবেদন ।
১৮৬. আল্লাহ কারো কথা শুনতে বাধ্য এ ধারণা পোষণ করা ।
১৮৭. আমাবস্য ও পূর্ণিমা নিয়ে রয়েছে নানারকম কুসংস্কার ।

আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে কসম খাওয়া শিরক

১৮৮. দুই চোখের কসম খাওয়া শিরক ।
১৮৯. মায়ের নামে কসম খাওয়া শিরক ।
১৯০. বাবার নামে কসম খাওয়া শিরক ।

১৯১. সন্তানের মাথায় হাত রেখে কসম খাওয়া শিরক।
১৯২. ভাত হাতে নিয়ে কসম খাওয়া শিরক।
১৯৩. কুরআন ছুয়ে কসম খাওয়া শিরক।
১৯৪. বিদ্যা (বই) ছুয়ে কসম খাওয়া শিরক।
১৯৫. মাটি ছুয়ে কসম খাওয়া শিরক।
১৯৬. মসজিদে ঢুকে কসম খাওয়া শিরক।
১৯৭. রক্ত ছুয়ে কসম খাওয়া শিরক।

ভাগ্য পরীক্ষা করা শিরক

১৯৮. টিয়া পাখির মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করা শিরক।
১৯৯. মাটিতে হাত চালিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা শিরক।
২০০. হাতের রেখা দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা শিরক।
২০১. পাথর দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন শিরক।
২০২. রাশি দেখে ভাগ্য পরীক্ষা করা শিরক।
২০৩. পাথরে ভাগ্য পরিবর্তন হয় এই ধরনের বিশ্বাস থাকা শিরক।
২০৪. পাথরে নানারকম বিপদ কেটে যায়, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা। এবং গায়ে সেসব পাথরের আংটি অথবা মাদুলি ধারণ করা শিরক।
২০৫. অষ্টধাতুর আংটি পরা যাবে না।

কুরআন নিয়ে শিরক

২০৬. কুরআন গলায় ঝুলালে শিরক হবে।
২০৭. কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ বানালে শিরক হবে।
২০৮. কুরআনের নক্সা দিয়ে তাবিজ বানালে শিরক হবে।

মন্তব্যের মাধ্যমে শিরক

২০৯. ড্রাইভার ভাল তাই এক্সিডেন্ট হলো না, এই মন্তব্য করলে শিরক হবে।
২১০. মাঝি ভাল তাই নৌকা ডুবলো না, এই মন্তব্য করলে শিরক হবে।
২১১. ঘরের খুটি শক্ত বলে ঝড়ে ঘর উড়ে গেল না, এই মন্তব্য করলে শিরক হবে।
২১২. ডাক্তার ভাল বলে বাচ্চা বেঁচে গেল, এই মন্তব্য করলে শিরক হবে।
২১৩. রসূল ﷺ -এর কবর আল্লাহর আরশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
২১৪. নাবীদের হায়াত ও মাউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
২১৫. মানুষের চেয়ে ফিরিশতা শ্রেষ্ঠ বা ওমুকে ফিরিশতার মতো ছিলেন।
২১৬. যতো কল্লা ততো আল্লাহ।

২১৭. মু'মিনদের হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর আরশ।
২১৮. অন্তর হলো আল্লাহর ঘর।
২১৯. যে দিকে তাকাও সেদিকে আল্লাহ।
২২০. আল্লাহ সব জায়গায় আছেন।
২২১. মানুষ যদি উপকৃত হয় তাহলে সার্থক মনে করবো।
২২২. মহাভারত অশুদ্ধ হবে।
২২৩. মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।
২২৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করছেন।
২২৫. জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস।
২২৬. আগে আল্লাহ বাদে আপনি। অথবা উপরে আল্লাহ নিচে আপনি।
২২৭. কাউকে বলা "ভাল থাকেন"।
২২৮. শক্তি বাড়ানোর জন্য 'ইয়া আলী' বলা।
২২৯. 'বিনা হুকুমে গাছের পাতা নড়ে না' এমন বলা।
২৩০. আল্লাহ রসূলের দু'আতে ভাল আছি।
২৩১. কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না।
২৩২. 'আপনার দু'আয় ভাল আছি' এমন বলা।
২৩৩. জীবন রক্ষাকারী ঔষধ।
২৩৪. পবিত্র বা উত্তম চরিত্র বুঝাতে 'ধোয়া তুলসীপাতা' বলা।
২৩৫. কুরআনকে 'ঐশী বাণী' বা 'দৈব বাণী' বলা।
২৩৬. বুজর্গণের বুজর্গীকে 'ঐশী শক্তি' বলা।
২৩৭. কোন কাজের শুরুতে ভাল হলে তাকে 'বিসমিল্লায় গলদ' বলা।
২৩৮. মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বলা।
২৩৯. রসূল ﷺ -কে হায়াতুন্নবী বলা।
২৪০. মায়ের দান বা দয়াল বাবার দান।
২৪১. বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের 'অলি আল্লাহ' বলা।
২৪২. কারো বা কোন কিছু দ্বারা বারবার বাঁধাগ্রস্ত হলে 'কুফা' বলা।
২৪৩. নিজেকে গালি দেয়া 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ' বা 'আমার কপালটাই মন্দ'।

কিছু আপত্তিকর শব্দ

খোদা, শাহানশাহ, শাহজাহান, অগ্নিকন্যা, অগ্নিপুরুষ, অর্ঘ্য, আচার্য, আপামর, উৎসর্গ, উপাস্য, একেশ্বরবাদ, এলাহিকান্ড, কীর্তণ, জয়ন্ত্রী জলালী, তীর্থযাত্রী, তীর্থ যাত্রা, তিলোত্তমা, তুঘলকি কান্ড, প্রজন্ম, প্রয়াত, বেদী, ভেস্ত ইত্যাদি।

৪

সুন্নাত ও বিদ'আত

সুন্নাহ কী?

সুন্নাত বা সুন্নাহ হলো সেই মূল আদর্শ যা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রসূলে করীম ﷺ নিজে তাঁর বাস্তব জীবনে অনুসরণ করেছেন; অনুসরণ করার জন্যে দৃষ্টান্ত (গাইডলাইন) হিসেবে দুনিয়ার মানুষের সামনে রেখে গেছেন।

নাবী করীম ﷺ যা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করেছেন, তার উৎস হলো ওহী-- যা আল্লাহর নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন। সেখানে আল্লাহর সকল আদেশ নিষেধেরই প্রতিফলন ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে ঈমানদারদের এই ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের জন্য জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে নাবী! মানুষকে বলুন, যদি সত্যি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর; তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

সুতরাং একমাত্র রসূল ﷺ -এর নির্দেশাবলী অর্থাৎ সুন্নাহ অনুসরণ করে এবং সতর্কতার সঙ্গে দ্বীন ইসলামে সকল নতুন বিষয়ের প্রবর্তন (বিদ'আত) এড়িয়ে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যায়। এ সম্পর্কে রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

"আমার সুন্নাহ এবং সঠিক প্রাপ্ত পথ খোলাফায়ে রাশিদ্বীনের অনুসরণ কর। এটা দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর। এবং ইসলামে নতুন কিছু প্রবর্তন সম্মন্ধে সাবধান হও কারণ সেগুলি সব বিদ'আত (প্রচলিত ধর্মমত-বিরুদ্ধ বিশ্বাস) এবং বিদ'আত

হল ভুল পথ যা জাহান্নামের আগুনের দিকে চালিত করে"। (আবু দাউদ, আত-তিরমিযী)

আমরা রসূল ﷺ -কে কতটুকু ভালবাসি?

তাহলে সুন্নাহ কী? এক কথায় রসূল ﷺ -এর কাজ এবং কথাই হচ্ছে সুন্নাহ। আমরা অনেকেই নিজেকে রসূল ﷺ -এর খাঁটি অনুসারী বলে দাবী করি এবং নিজেকে তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করছি বলে মনে করি। আমরা রসূল ﷺ -এর ভালবাসায় এতোই পাগল যে নিজেদেরকে 'আশেকে রসূল' বলে দাবী করি। কিন্তু আমরা বাস্তবে ভুলে যাই যে রসূল ﷺ -এর সমস্ত কাজকর্মই হচ্ছে সুন্নাহ। নিম্নে রসূল ﷺ -এর সুন্নাহর কিছু বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

সহজ সুন্নাহ

আমরা অনেকে রসূল ﷺ -এর কাজকর্মের মধ্যে যে কাজগুলো 'সহজ' (easy) শুধু সেগুলিকেই বেছে নিয়েছি নিজের জীবনে সুন্নাহ হিসেবে, যেমন ঃ আতর লাগানো, সুরমা লাগানো, পাগড়ী পরা, লম্বা জুব্বা পরা, টাখ্নুর উপর পায়জামা পরা, টুপি পরা, দাড়িতে মেহেদি লাগানো, মিষ্টি খাওয়া, মাটিতে বসে আহার করা, মিসওয়াক করা, ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কঠিন সুন্নাহ

আমরা রসূল ﷺ -কে এতো ভালবাসি যে, যে সুন্নাহগুলো কঠিন সেগুলোর থেকে দূরে থাকি। যেমন ঃ রসূল ﷺ দীর্ঘ ২৩ বছর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য হাড়ভাঙ্গা সংগ্রাম করেছেন, তায়েফের রাস্তায় কাফিরদের পাথরের আঘাতে রক্ত ঝরিয়েছেন, ওহুদের ময়দানে দাঁত হারিয়েছেন, খন্দকের যুদ্ধে এক নাগাড়ে না খেয়ে মদীনার তিন দিকে পরিখা খনন করেছেন। নবুয়াত প্রাপ্তির পর মক্কার প্রথম ১৩ বছর কাফিরদের অমানবিক নির্যাতন সহ্য করেছেন, কাফিরদের বয়কট অবস্থায় পাহাড়ের ঢালে নতুন মুসলিমদের নিয়ে ৩টি বছর কাটিয়েছেন এবং জীবন বাঁচানোর জন্য গাছের পাতা এবং ছাল খেয়েছেন। একসময় কাফিররা রসূল ﷺ -কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর নির্দেশে তিনি জন্মভুমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিযরত করেছেন। তাঁর সারা জীবনে তিনি কোন দিন দুই বেলার বেশী পেট ভরে খেতে পাননি। রসূল ﷺ সাহাবাসহ নবুয়তের ২৩ বছরে ৮৬টি যুদ্ধ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজ থেকে যতো রকম অন্যায় কাজ যেমন ঃ সুদ, ঘুষ, যিনা, মদ, জুয়া, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি,

জুলুম, মিথ্যাচার, অবিচার, রাহাজানী, হত্যা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি দূর করেছিলেন। যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানেই বাঁধা দিয়েছেন। এছাড়া সমাজে পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে সলাত, সিয়াম, যাকাত, মহিলাদের পর্দা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত, চোগলখুরী, রিয়া, লোভ-লালসা ইত্যাদি দূর করেছিলেন। বাবা-মার হক, সন্তানের হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, আত্মীয়ের হক, প্রতিবেশীর হক, ইয়াতিমের হক, অমুসলিমের হক, যুদ্ধ বন্দীদের হক, সরকারের হক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদি রসূল ﷺ -এর বিস্তারিত জীবনী পড়ি তাহলে দেখতে পাই যে সারাটা জীবন তিনি কত কষ্টে কাটিয়েছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এরকম অনেক কাজই তিনি করেছেন যার বর্ণনা কুরআন ও সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়।

আল কুরআন হচ্ছে complete code of life অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এই যে উপরের সুন্নাহগুলো রসূল ﷺ -এর জীবনে দেখা যায় আসলে এগুলো সবই কুরআনের কথা, কুরআনের নির্দেশগুলোই অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য তিনি সারা জীবন এই কাজগুলো করেছেন। আমরা যেন মনে না করি যে এগুলো শুধু তাঁর একার কাজ, তার একার মিশন। তিনি ছিলেন গোটা মানবজাতির জন্য role model. তাঁর দেখিয়ে যাওয়া সমস্ত কাজগুলো অনুসরণ করা প্রতিটি মু'মিনের দায়িত্ব এবং সেটাই তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ।

আসুন এবার নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি 'আশেকে রসূল' বলে নিজেকে নিজে যে দাবী করছি তা কতটুকু যুক্তি সংগত? একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন, আমি একটা কোম্পানীতে চাকুরী নিয়েছি, আমার ম্যানেজার আমাকে আমার কি কি দায়িত্ব তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবার আমি প্রতিদিন বেছে বেছে অতি সহজ কাজগুলো পালন করি আর কঠিন কাজগুলো না করে এড়িয়ে যাই। এবার আপনিই বলুন আমার চাকুরী কতদিন টিকবে? যদিও চাকুরী টিকে থাকে তাহলে আপনিই বলুন আমার ম্যানেজার এবং কোম্পানীর মালিকের কাছে আমি কত দিন প্রিয়পাত্র হিসেবে পরিগণিত হবো বা তারা আমাকে কী চোখে দেখবেন?

সাহাবাদের সুন্নাহ ঃ উপরের এই কাজগুলো আল্লাহর রসূল ﷺ শুধু একা করেননি তিনি তার সঙ্গি-সাথীদের সাথে নিয়ে করেছেন। বদরের যুদ্ধে বাবা ছেলের বিরুদ্ধে, ছেলে বাবার বিরুদ্ধে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, চাচা ভাতিজার বিরুদ্ধে, ভাতিজা চাচার বিরুদ্ধে তরবারী ধরেছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রসূল ﷺ -এর সাথে তারা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। আমরা জানি ওহুদের যুদ্ধে সাহাবারা রসূল ﷺ -কে গোল হয়ে ঘিরে ধরে নিজের দেহ দিয়ে বানিয়েছিলেন

মানব ঢাল, যুদ্ধে তাদের বুকে-পীঠে ঝাকে ঝাকে তীর বিধেছে। এটাকে বলে আশেকে রসূল, এটাকে বলে সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী।

বিশেষ অনুরোধ ঃ উপরে সহজ এবং কঠিন সুন্নাহর যে উদাহরণগুলো দেয়া হয়েছে তা বুঝানোর সুবিধার্থে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। আমরা কেউ কাউকে যেন ভুল না বুঝি, এখানে কোন অবস্থাতেই রসূল ﷺ -এর কোন সুন্নাহকে হেয় বা ছোট করা হয়নি। এবং আমরা যারা শুধু সহজ সুন্নাহগুলো পালন করি তাদেরকেও কোনভাবেই ছোট করা হয়নি। কোন সুন্নাহকে ছোট করে দেখা তো দূরের কথা একজন মু'মিন হিসেবে আমাদের সকলকে অবশ্যই রসূল ﷺ -এর সকল প্রকার সুন্নাহর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তা মানতে হবে। যেখানে প্রকৃত সুন্নাহ establish হবে সেখান থেকে বিদ'আত বিদায় নেবে ইনশাআল্লাহ।

বিদ'আত কী?

বিদ'আতের সংজ্ঞা

যে সব ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল ﷺ নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত ছিলোনা এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দ্যেশে পালন করার নামই বিদ'আত। বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা।

যেমন উদাহরণস্বরূপ ঃ খাওয়ার সময় বলতে হয় 'বিসমিল্লাহ' কিন্তু আমরা যদি ভাল মনে করে আর একটু বাড়িয়ে বলি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' তাহলেই সেটা হবে বিদ'আত। আবার যেমন, প্রত্যেক ফরয সলাতের পর ৩৩বার করে 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর' পড়তে হয় কিন্তু আমি ভাল মনে করে ৩৩বারের জায়গায় যদি ৪০বার করে নিয়মিত পড়ার প্রচলন করি তাহলেই সেটা হবে বিদ'আত। অনেকেই বলেন কাজটা তো ভাল, করলে ক্ষতি কী? আমরা জানি মাগরিবের ফরয সলাত তিন রাক'আত, আমি যদি ভাল মনে করে তিন রাক'আতের জায়গায় ছয় রাক'আত পরি তাহলেই সেটা কী হবে? কাজটা তো ভাল!

আর এভাবে যদি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ভাল মনে করে যে যার মতো পরিবর্তন আনতে থাকে তাহলে আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ -এর মাধ্যমে আমাদের জন্য যে ইসলাম পাঠিয়েছেন একসময় এর অরিজিনাল অস্তিত্ব আর থাকবে না। যেভাবে খৃষ্টান ধর্ম পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ইসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর অতি উৎসাহিরা তাদের ধর্মে ভাল মনে করে এটা-সেটা ঢুকাতে ঢুকাতে প্রকৃত ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলেছে। তাই ইসলামের ক্ষেত্রে আল্লাহ নিজে সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামে যে কোন ধরনের পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ দ্বীন ইসলামে কোন প্রকার পরিবর্তন চলবে না, দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ, কিয়ামত পর্যন্ত আর কিছু নতুন করে সংযোজন করতে হবে না।

বিদ'আতের ব্যাপারে কুরআনের দলিল

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে আমি সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম (মনোনীত করলাম)।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোন কিছুর অভাব। অতএব তা মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সকল দ্বীনি প্রয়োজন পূরণে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এই দ্বীনে বিশ্বাসীদের দিক নির্দেশনা বা গাইডেন্সের জন্য এই দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার প্রয়োজন অতীতেও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এতে মানুষের সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা যেমন রয়েছে তেমনি এতে নেই কোন অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য জিনিস। ফলে দ্বীন থেকে যেমন কোন কিছু বাদ দেয়া যাবেনা, তেমনি এর সাথে কোন কিছু যোগ করাও যাবে না। এ দুটোই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিপরীত এবং সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে দেয়া আল্লাহর ঘোষণার পরিপন্থী। ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা যা নাবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের যামানায় চালু হয়নি, তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তা হবে স্পষ্ট বিদ'আত।

দ্বীন তো আল্লাহর দেয়া এবং রসূলের উপস্থাপিত জিনিস। তাতে যখন কেউ নতুন কিছু যুক্ত করে, তখন তার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ বা রসূলে করীম ﷺ যেন বুঝতেই পারেননি যে দ্বীনে অসংগতি, অস্পষ্টতা, ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে (নাউজুবিল্লাহ)। তাই তথাকথিত নব্য জ্ঞানীরা নিজেদের ইচ্ছামত সব নতুন জিনিস/প্রথা এর মাঝে যুক্ত করে দ্বীনের ত্রুটি দূর করছেন বা এর অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করছেন।

ভেবে দেখি, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ -এর প্রতি কতবড় যুলম অথচ দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধান (complete code of conduct for life) উপহার দিয়েছেন এবং রসূলে করীম ﷺ আমাদের কাছে তা পূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বিদ'আত কিভাবে চালু হয়?

মুসলিম সমাজে বিদ'আত উদ্ভূত ও চালু হওয়ার মূলে চারটি কারণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমটি হলো ঃ কোনো ব্যক্তি নিজের থেকে বিদ'আত উদ্ভাবন করে সমাজে তা চালু করে দেয়। পরে এটা সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়টি হলো ঃ কোনো আলেম ব্যক্তি হয়ত শরীয়তের বিরোধী একটা কাজ করেছেন, করেছেন তা শরীয়তের বিরোধী জানা সত্ত্বেও, কিন্তু তা দেখে অজ্ঞ লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, হুজুর যেহেতু করেছেন, সেহেতু এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে পারে না। এভাবে এক ব্যক্তির কারণে গোটা সমাজেই বিদ'আতের প্রচলন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়টি হলো ঃ সাধারণ মুসলিম অজ্ঞ লোকেরা যখন শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করতে শুরু করে। তখন সমাজের আলেমগণ সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকেন, তার প্রতিবাদও করেন না, সে কাজ করতে নিষেধও করেন না-- বলেন না যে, এ কাজ শরীয়তের বিরোধী, তোমরা এ কাজ কিছুতেই করতে পারবে না। ফলে সাধারণ লোকদের মনে ধারণা জন্মে যে, এ কাজ নিশ্চিয়ই নাজায়িয হবে না, বিদ'আত হবে না। হলে কি আর আলেম সাহেবরা তার প্রতিবাদ করতেন না? এভাবে সমাজে সম্পূর্ণ বিদ'আত বা নাজায়িয কাজ 'শরীয়তসম্মত' কাজরূপে পরিচিত ও প্রচলিত হয়ে পড়ে।

চতুর্থটি হলো ঃ কোনো কাজ হয়ত মূলতঃই ভালো, শরীয়তসম্মত কিংবা সুন্নাত অনুরূপ। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তা সমাজের লোকদের সামনে বলা হয়নি, প্রচার করা হয়নি। তখন সে সম্পর্কে সাধারণের ধারণা হয় যে, এ কাজ নিশ্চয়ই ভালো নয়, ভালো হলে আলেম সাহেবরা কি এতদিন তা বলতেন না! এভাবে একটি শরীয়তসম্মত কাজকে শেষ পর্যন্ত শরীয়ত বিরোধী বলে লোকেরা মনে করতে থাকে আর এ-ও একটি বড় বিদ'আত।

বিদ'আত প্রচলিত হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক কারণ

বিদ'আত প্রচলিত হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। আর তা হলো এই যে, মানুষ স্বভাবতই চিরন্তন শান্তি ও সুখ (জান্নাত) লাভ করার আকাঙ্খী। আর এ কারণে সে বেশী বেশী নেক কাজ করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। দ্বীনের হুকুম-আহকাম যথাযথ পালন করা আপাতদৃষ্টিতে কারো কাছে কঠিন বোধ হলেও সহজসাধ্য সওয়াবের কাজ করার জন্যে লালায়িত হয় খুব বেশী। আর তখনি সে শয়তানের ষড়যন্ত্রে পড়ে যায়। এই লোভ ও শয়তানী ষড়যন্ত্রের কারণে খুব তাড়াহুড়া করে কিছু সহজ সওয়াবের কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। নিজ থেকেই ধরে নেয় যে, এগুলো সব নেক কাজ, সওয়াবের কাজ। তা করলে এত বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে যে, জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি লাভ করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

কিন্তু এ সময়ে যে কাজগুলোকে সওয়াবের কাজ বলে মনে করে নেয়া হয়, সেগুলো শরীয়ত অনুযায়ী কি না ও বাস্তবিকই সওয়াবের কাজ কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবার মতো ইসলামী জ্ঞান বা যোগ্যতাও যেমন থাকে না, তেমনি সে দিকে বিশেষ উৎসাহও দেখানো হয় না। কেননা তাতে করে চিরন্তন সুখ লাভের সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর তাতেই তাদের ভয়। আর এভাবেই সমাজে বিদ'আত প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ'আত সমর্থনে পীর-ওলীর দোহাই

বিদ'আতপন্থীরা সাধারণত নিজেদের উদ্ভাবিত বিদ'আতের সমর্থনে সূফীয়ে কিরাম ও মাশায়েখে তরীকতের দোহাই দিয়ে থাকে। তারা বড় বড় ও সুস্পষ্ট বিদ'আতী কাজকেও বিদ'আত নয় -- বড় সওয়াবের কাজ বলে চালিয়ে দেয়। আর বলে ঃ অমুক ওলী-আল্লাহ, অমুক পীর কিবলা নিজে এ কাজ করেছেন

এবং করতে বলেছেন। আর তাঁর মতো ওলী আল্লাহই যখন এ কাজ করেছেন, করতে বলে গেছেন, তখন তা বিদ'আত হতে পারে না, তা অবশ্যই বড় সওয়াবের কাজ হবে। তা না হলে কি আর তিনি তা করতেন?

বিদ'আতের সমর্থনে এরূপ পীরের দোহাই দেয়ার ফলে সমাজে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একটি প্রতিক্রিয়া এই যে, কোনটি সুন্নাত আর কোনটি বিদ'আত, কোনটি জায়িয আর কোনটি নাজায়িয তা নির্দিষ্টভাবে ও নিঃসন্দেহে জানবার জন্যে কুরআন, হাদীস, সাহাবাদের আমল ও জীবন-চরিত ইত্যাদি কিছুই খুঁজে দেখা হয় না। কেবল দেখা হয় অমুক হুযুর কিবলা এ কাজ করেছেন কিনা, তিনিই যদি করে থাকেন তাহলে তা করতে আর কোনো দ্বিধাবোধ করা হয় না। সেক্ষেত্রে এতটুকুও চিন্তা করা হয় না যে, যার বা যাদের দোহাই দেয়া হচ্ছে সে বা তারা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী কাজ করেছে কিনা; তারা শরীয়তের ভিত্তিতে এ কাজ করেছে না নিজেদের ইচ্ছামতো করেছে।

এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এই দেখা দিয়েছে যে, জনসাধারণ মনে করতে শুরু করেছে, শরীয়ত ও মারেফাত (বা তরীকত) দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শরীয়তে যা নাজায়িয, মারিফাতের দৃষ্টিতে তাই জায়িয। কেননা একদিকে শরীয়তের দলিল দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ এটা বিদ'আত কিন্তু পীরের দোহাই দিয়ে সেটিকেই জায়িয করে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে শরীয়ত আর মারিফাতের দুই পরস্পর বিরোধী হওয়ার ধারণা প্রকট হয়ে উঠে। এরূপ ধারণা দ্বীন-ইসলামের পক্ষে যে কতখানি মারাত্মক, তা বলে শেষ করা কঠিন। শরীয়তের বিপরীত কোন কিছু কোন অবস্থাতেই বা কোন অজুহাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিদ'আতের তিনটি মৌলিক নীতিমালা রয়েছে

১. এমন 'আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াবের আশা করা যা শরীয়ত সিদ্ধ নয়। কেননা শরীয়তের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল- এমন আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াবের আশা করতে হবে যা কুরআনে আল্লাহ নিজে কিংবা সহীহ হাদীসে তাঁর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ অনুমোদন করেছেন। তাহলেই কাজটি ইবাদত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ যে আমল অনুমোদন করেননি সে আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হবে বিদ'আত।

২. দ্বীনের অনুমোদিত ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বাইরে অন্য ব্যবস্থার অনুসরণ ও স্বীকৃতি প্রদান। ইসলামে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, শরীয়তের বেঁধে দেয়া পদ্ধতি ও বিধানের মধ্যে থাকা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত ব্যতীত অন্য বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করল ও তার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করল সে বিদ'আতে লিপ্ত হল।

৩. যে সকল কর্মকান্ড সরাসরি বিদ'আত না হলেও বিদ'আতের দিকে পরিচালিত করে এবং পরিশেষে মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে, সেগুলোর হুকুম বিদ'আতেরই অনুরূপ।

জেনে রাখা ভাল যে, 'সুন্নাত'-এর অর্থ বুঝতে ভুল হলে বিদ'আত চিহ্নিত করতেও ভুল হবে। এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সুন্নাতকে বিদ'আত থেকে পৃথক করা; কেননা সুন্নাত হচ্ছে ঐ বিষয় যা শরীয়ত প্রণেতা যার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর বিদ'আত হচ্ছে ঐ বিষয় যা শরীয়ত প্রণেতা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমোদন করেননি। এ বিষয়ে মানুষ মৌলিক ও অমৌলিক অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক দলই ধারণা করে যে, তাদের অনুসৃত পন্থাই হ'ল সুন্নাত এবং তাদের বিরোধীদের পথ হল বিদ'আত।"

বিদ'আতের উপরোল্লিখিত তিনটি প্রধান মৌলিক নীতিমালার আলোকে বিদ'আতকে চিহ্নিত করার জন্য আরো বেশ কিছু সাধারণ নীতিমালা শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা দ্বারা একজন সাধারণ মানুষ সহজেই কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে বিদ'আতের পরিচয় লাভ করতে পারে ও সমাজে প্রচলিত বিদ'আতসমূহকে চিহ্নিত করতে পারে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল শরীয়তের দৃষ্টিতে যা বিদ'আত তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নেয়া ও তা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা। নীচে উদাহরণ স্বরূপ কিছু দৃষ্টান্তসহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নীতিমালা উল্লেখ করা হলো।

প্রথম নীতি ঃ অত্যধিক দুর্বল, মিথ্যা ও জাল হাদীসের ভিত্তিতে যে সকল ইবাদত করা হয়, তা শরীয়তে বিদ'আত বলে বিবেচিত। এটি বিদ'আত চিহ্নিত করার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। কেননা ইবাদত হচ্ছে পুরোপুরি অহী নির্ভর। শরীয়তের কোন বিধান কিংবা কোন ইবাদত শরীয়তের গ্রহণযোগ্য সহীহ দলিল ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। জাল বা মিথ্যা হাদীস মূলতঃ হাদীস নয়। অতএব এ ধরনের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া কোন বিধান বা ইবাদত শরীয়তের

অংশ হওয়া সম্ভব নয় বিধায় সে অনুযায়ী আমল বিদ'আত হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অত্যধিক দুর্বল হাদীসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মত হল এর দ্বারাও শরীয়তের কোন বিধান সাব্যস্ত হবে না।

উদাহরণ ঃ রজব মাসের প্রথম জুমু'আর রাতে অথবা ২৭শে রজব যে বিশেষ শবে মি'রাজের সলাত আদায় করা হয় তা বিদ'আত হিসেবে গণ্য। অনুরূপভাবে শবেবরাতের রাতে যে ১০০ রাকাত সলাত বিশেষ পদ্ধতিতে আদায় করা হয় যাকে সলাতুর রাগায়েব বলেও অভিহিত করা হয়, তাও বিদ'আত হিসেবে গণ্য। কেননা এর ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসটি জাল।

দ্বিতীয় নীতি ঃ যে সকল ইবাদত শুধুমাত্র মনগড়া মতামত ও খেয়াল-খুশীর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় সে সকল ইবাদত বিদ'আত হিসেবে গণ্য। যেমন কোন এক 'আলেম বা আবেদ ব্যক্তির কথা কিংবা কোন দেশের প্রথা অথবা স্বপ্ন কিংবা কাহিনী যদি হয় কোন 'আমল বা ইবাদতের দলিল তাহলে তা হবে বিদ'আত। দ্বীনের প্রকৃত নীতি হল- আল কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমেই শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে জ্ঞান আসে। সুতরাং শরীয়তের হালাল-হারাম এবং ইবাদত ও 'আমল নির্ধারিত হবে এ দু'টি দলিলের ভিত্তিতে। এ দু'টি দলিল ছাড়া অন্য পন্থায় স্থিরীকৃত 'আমল ও ইবাদত তাই বিদ'আত বলে গণ্য হবে। এ জন্যই বিদ'আতপন্থীগণ তাদের বিদ'আতগুলোর ক্ষেত্রে শরয়ী দলীলের অপব্যাখ্যা করে সংশয় সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতেবী রহ. বলেন, "সুন্নাতী তরীকার মধ্যে আছে এবং সুন্নাতের অনুসারী বলে দাবীদার যে সকল ব্যক্তি সুন্নাতের বাইরে অবস্থান করছে, তারা নিজ নিজ মাসআলাগুলোতে সুন্নাহ্ দ্বারা দলিল পেশের ভান করেন।"

উদাহরণ ঃ কাশ্ফ, অন্তর্দৃষ্টি তথা মুরাকাবা-মুশাহাদা, স্বপ্ন ও কারামাতের উপর ভিত্তি করে শরীয়াতের হালাল হারাম নির্ধারণ করা কিংবা কোন বিশেষ 'আমল বা ইবাদতের প্রচলন করা। শুধুমাত্র 'আল্লাহ' কিংবা হু-হু' অথবা 'ইল্লাল্লাহ' এর যিকর উপরোক্ত নীতির আলোকে ইবাদত বলে গণ্য হবে না।

তৃতীয় নীতি ঃ কোন বাঁধা-বিপত্তির কারণে নয় বরং এমনিতেই রসূল ﷺ যে সকল 'আমল ও ইবাদত থেকে বিরত থেকেছিলেন, পরবর্তীতে তার উম্মাতের কেউ যদি সে 'আমল করে, তবে তা শরীয়তে বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তা যদি শরীয়তসম্মত হত তাহলে তা করার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। অথচ কোন বাঁধাবিপত্তি ছাড়াই রসূল ﷺ সে 'আমল বা ইবাদত ত্যাগ

করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'আমলটি শরীয়তসম্মত নয়। অতএব সে 'আমল করা যেহেতু আর কারো জন্য জায়িয নেই, তাই তা করা হবে বিদ'আত।

উদাহরণ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ও জুমা' ছাড়া অন্যান্য সলাতের জন্য অথবা অন্য কোন বিষয়ে 'আযান দেয়া। উপরোক্ত নীতির আলোকে বিদ'আত বলে গণ্য হবে। যেমন, বিপদ-আপদ ও ঝড়-তুফান আসলে ঘরে আযান দেয়াও উপরোক্ত নীতির আলোকে বিদ'আত বলে গণ্য হবে। কেননা বিপদ-আপদে কী পাঠ করা উচিত বা কী 'আমল করা উচিত তা হাদীসে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

চতুর্থ নীতি ঃ সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম, ও তাবেয়ীন যদি কোন বাঁধা না থাকা সত্ত্বেও কোন ইবাদতের কাজ করা কিংবা বর্ণনা করা অথবা লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে থাকেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিরত থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, কাজটি তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তসিদ্ধ নয়। কারণ তা যদি শরীয়তসিদ্ধ হত তাহলে তাদের জন্য তা করার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও যেহেতু তারা কোন বাঁধাবিপত্তি ছাড়াই উক্ত 'আমল ত্যাগ করেছেন, তাই পরবর্তী যুগে কেউ এসে সে 'আমল বা ইবাদত প্রচলিত করলে তা হবে বিদ'আত। হুযাইফা (রা.) বলেন, "যে সকল ইবাদত রসূল ﷺ -এর সাহাবাগণ করেননি তোমরা সে সকল ইবাদত কর না।" (সহীহ বুখারী)

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, "আর যে ধরনের ইবাদত পালন থেকে নাবী কারীম ﷺ বিরত থেকেছেন অথচ তা যদি শরীয়াতসম্মত হত তাহলে তিনি নিজে তা অবশ্যই পালন করতেন, অথবা অনুমতি প্রদান করতেন এবং তাঁর পরে খলিফাগণ ও সাহাবীগণ তা পালন করতেন। অতএব এ কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব যে এ কাজটি বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা।"

উদাহরণ ঃ ইসলামের বিশেষ বিশেষ দিবসসমূহ ও ঐতিহাসিক উপলক্ষগুলোকে ঈদ উৎসবের মত উদযাপন করা। কেননা ইসলামী শরীয়াতই ঈদ উৎসব নির্ধারণ ও অনুমোদন করে। শরীয়াতের বাইরে অন্য কোন উপলক্ষকে ঈদ উৎসবে পরিণত করার ইখতিয়ার কোন ব্যক্তি বা দলের নেই। এ ধরনের উপলক্ষের মধ্যে একটি রয়েছে রসূল ﷺ -এর জন্ম দিবস (মিলাদুন্নবী) উদযাপন।

পঞ্চম নীতি ঃ যে সকল ইবাদত শরীয়াতের মূলনীতিসমূহ এবং মাকাসিদ তথা উদ্দেশ্য ও লক্ষের বিপরীত সে সবই হবে বিদ'আত।

উদাহরণ ঃ ফরয সলাতের আযানের আগে মাইকে দুরূদ পাঠ। কেননা আযানের উদ্দেশ্য লোকদেরকে জামাআ'তে সলাত আদায়ের প্রতি আহবান করা, মাইকে দুরূদ পাঠের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ষষ্ঠ নীতি ঃ প্রথা ও মু'আমালাত বিষয়ক কোনো কাজের মাধ্যমে যদি শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়াই আল্লাহর কাছে সওয়াব লাভের আশা করা হয় তাহলে তা হবে বিদ'আত।

উদাহরণ ঃ পশমী কাপড়, চট, ছেঁড়া ও তালি এবং ময়লাযুক্ত কাপড় কিংবা নির্দিষ্ট রঙের পোষাক পরিধান করাকে ইবাদত ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার পন্থা মনে করা। একই ভাবে সার্বক্ষণিক চুপ থাকাকে কিংবা রুটি ও গোশত্ ভক্ষণ ও পানি পান থেকে বিরত থাকাকে অথবা ছায়াযুক্ত স্থান ত্যাগ করে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে কাজ করাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পন্থা হিসেবে নির্ধারণ করা। উল্লেখিত কাজসমূহ কেউ যদি এমনিতেই করে তবে তা নাজায়িয নয়, কিন্তু এ সকল 'আদাত কিংবা মোয়ামালাতের কাজগুলোকে যদি কেউ ইবাদতের রূপ প্রদান করে কিংবা সওয়াব লাভের উপায় মনে করে তবে তখনই তা হবে বিদ'আত। কেননা এগুলো ইবাদত ও সওয়াব লাভের পন্থা হওয়ার কোন দলিল শরীয়তে নেই।

সপ্তম নীতি ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ যে সকল কাজ নিষেধ করে দিয়েছেন সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সওয়াব লাভের আশা করা হলে সেগুলো হবে বিদ'আত।

উদাহরণ ঃ গান-বাদ্য ও কাওয়ালী বলা ও শোনা অথবা নাচের মাধ্যমে যিকর করে আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করা। এবং কাফির, মুশরিক ও বিজাতীয়দের অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সওয়াব লাভের আশা করা।

অষ্টম নীতি ঃ যে সকল ইবাদত শরীয়তে নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতির সাথে প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে সে নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতি থেকে পরিবর্তন করা বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ ঃ নির্ধারিত সময় পরিবর্তনের উদাহরণ- যেমন যিলহাজ্জ মাসের এক তারিখে কুরবানী করা। কেননা, কুরবানীর শরয়ী সময় হল ১০ যিলহাজ্জ ও তৎপরবর্তী আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো। নির্ধারিত স্থান পরিবর্তনের

উদাহরণ- যেমন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ করা। কেননা, শরীয়ত কর্তৃক ই'তিকাফের নির্ধারিত স্থান হচ্ছে মসজিদ।

নবম্ন নীতি ঃ 'আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক দলিল দ্বারা শরীয়তে যে সকল ইবাদতকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে সেগুলোকে কোন নির্দিষ্ট সময় কিংবা নির্দিষ্ট স্থান অথবা অন্য কিছুর সাথে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা বিদ'আত বলে গণ্য হবে যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ইবাদতের এ সীমাবদ্ধ করণ প্রক্রিয়া শরীয়তসম্মত, অথচ পূর্বোক্ত 'আম দলীলের মধ্যে এ সীমাবদ্ধ করণের উপর কোন প্রমাণ ও দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

উদাহরণ ঃ যে দিনগুলোতে শরীয়াত রোযা বা সিয়াম রাখার বিষয়টি সাধারণভাবে উন্মুক্ত রেখেছে যেমন মঙ্গল বার, বুধবার কিংবা মাসের ৭, ৮ ও ৯ ইত্যাদি তারিখসমূহ, সে দিনগুলোর কোন এক বা একাধিক দিন বা বারকে বিশেষ ফযীলাত আছে বলে সিয়াম পালনের জন্য যদি কেউ খাস ও সীমাবদ্ধ করে অথচ খাস করার কোন দলিল শরীয়তে নেই, যেমন ফাতিহা-ই-ইয়াযদাহমের দিন সিয়াম পালন করা, তাহলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা হবে বিদ'আত, কেননা দলিল ছাড়া শরীয়াতের কোন হুকুমকে খাস ও সীমাবদ্ধ করা জায়িয নেই।

দশম্ন নীতি ঃ শরীয়াতে যে পরিমাণ অনুমোদন দেয়া হয়েছে ইবাদত করতে গিয়ে সে ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী 'আমল করার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করা এবং কঠোরতা আরোপ করা বিদ'আত বলে বিবেচিত।

উদাহরণ ঃ সারা রাত জেগে নিদ্রা পরিহার করে কিয়ামুল লাইল এর মাধ্যমে এবং ভঙ্গ না করে সারা বছর সিয়াম রাখার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা এবং অনুরূপভাবে স্ত্রী, পরিবার ও সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করা বা চিল্লায় যাওয়া।

একাদশ নীতি ঃ যে সকল আকীদাহ, মতামত ও বক্তব্য আল-কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত কিংবা এ উম্মাতের সালাফে সালেহীনের ইজমা' বিরোধী সেগুলো শরীয়াতের দৃষ্টিতে বিদ'আত। এই নীতির আলোকে নিম্নোক্ত দু'টি বিষয় শরীয়াতের দৃষ্টিতে বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।

১ম বিষয় ঃ নিজস্ব আকল ও বিবেকপ্রসূত মতামতকে অমোঘ ও নিশ্চিত নীতিরূপে নির্ধারণ করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যকে এ নীতির সাথে মিলিয়ে যদি দেখা যায় যে, সে বক্তব্য উক্ত মতামতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাহলে

তা গ্রহণ করা এবং যদি দেখা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য উক্ত মতামত বিরোধী তাহলে সে বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপরে নিজের আকল ও বিবেককে অগ্রাধিকার দেয়া।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন ঃ "বিবেকের মতামত অথবা কিয়াস দ্বারা আল কুরআনের বিরোধিতা করাকে সালাফে সালেহীনের কেউই বৈধ মনে করতেন না। এ বিদ'আতটি তখনই প্রচলিত হয় যখন জাহমিয়া, মু'তাযিলা ও তাদের অনুরূপ কতিপয় এমন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যারা বিবেকপ্রসূত রায়ের উপর ধর্মীয় মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন এবং সেই রায়ের দিকে কুরআনের বক্তব্যকে পরিচালিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যখন বিবেক ও শরীয়ার মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিবে তখন হয় শরীয়াতের সঠিক মর্ম বোধগম্য নয় বলে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা হবে অথবা বিবেকের রায় অনুযায়ী তা'বীল ও ব্যাখ্যা করা হবে। এরা হলো সে সব লোক যারা কোন দলিল ছাড়াই আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে তর্ক করে থাকে।"

২য় বিষয় ঃ কোন জ্ঞান ও ইলম ছাড়াই দ্বীনী বিষয়ে ফাতওয়া দেয়া। ইমাম শাতিবী রহ. বলেন, "যারা অনিশ্চিত কোন বক্তব্যকে অন্ধভাবে মেনে নেয়ার উপর নির্ভর করে অথবা গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়াই কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেয়, তারা প্রকৃত পক্ষে দ্বীনের রজ্জু ছিন্ন করে শরীয়াত বহির্ভূত কাজের সাথে জড়িত থাকে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে এ থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন। ফাতওয়ার এ পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিদ'আতেরই অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে আকল বা বিবেককে দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে Dominator হিসেবে স্থির করা নবউদ্ভাবিত বিদ'আত।"

দ্বাদশ নীতি ঃ যে সকল আকীদা কুরআন ও সুন্নাহয় আসেনি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের কাছ থেকেও বর্ণিত হয়নি, সেগুলো বিদআতী আকীদা হিসেবে শরীয়তে গণ্য।

উদাহরণ ঃ সূফী তরীকাসমূহের সে সব আকীদা ও বিষয়সমূহ যা কুরআন ও সুন্নায় আসেনি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের কাছ থেকেও বর্ণিত হয়নি।

ইমাম শাতিবী রহ. বলেন, "তারমধ্যে রয়েছে এমন সব অলৌকিক বিষয় যা শ্রবণকালে মুরীদদের উপর শিরোধার্য করে দেয়া হয়। আর মুরীদের কর্তব্য হল যা থেকে সে বিমুক্ত হয়েছে পুনরায় পীরের পক্ষ থেকে তা করার অনুমতি ও

ইঙ্গিত না পেলে তা না করা.....এভাবে আরো অনেক বিষয় যা তারা আবিষ্কার করেছে, সালাফদের প্রথম যুগে যার কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।"

ত্রয়োদশ নীতি ঃ দ্বীনি ব্যাপারে অহেতুক তর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও বাড়াবাড়িপূর্ণ প্রশ্ন বিদ'আত হিসেবে গণ্য। এ নীতির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শামিলঃ

উদাহরণ ঃ মুতাশাবিহাত বা মানুষের বোধগম্য নয় এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। ইমাম মালেক রহ.-কে এক ব্যক্তি আরশের উপর আল্লাহর استواء বা উঠার প্রকৃতি-ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন "কিরূপ উঠা তা বোধগম্য নয়, তবে استواء বা উঠা একটি জানা ও জ্ঞাত বিষয়, এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং প্রশ্ন করা বিদ'আত"। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহ. বলেন, "কেননা এ প্রশ্নটি ছিল এমন বিষয় সম্পর্কে যা মানুষের জ্ঞাত নয় এবং এর জবাব দেয়াও সম্ভব নয়"।

দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু নিয়ে গোঁড়ামি করা এবং গোঁড়ামির কারণে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা বিদ'আত বলে গণ্য। এছাড়া মুসলিমদের কাউকে উপযুক্ত দলিল ছাড়া কাফির ও বিদ'আতী বলে অপবাদ দেয়াও বিদ'আত বলে গণ্য।

চতুর্দশ নীতি ঃ দ্বীনের স্থায়ী ও প্রমাণিত অবস্থান ও শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাকে পরিবর্তন করা বিদ'আত।

উদাহরণ ঃ চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি পরিবর্তন করে আর্থিক জরিমানা দন্ড প্রদান করা বিদ'আত।

পঞ্চদশ নীতি ঃ অমুসলিমদের সাথে তাদের নিজস্ব যে সকল প্রথা ও ইবাদত রয়েছে মুসলিমদের মধ্যে সেগুলোর অনুসরণ বিদ'আত বলে গণ্য।

উদাহরণ ঃ কাফিরদের উৎসব ও পর্ব অনুষ্ঠানের অনুকরণে উৎসব ও পর্ব পালন করা। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, "জন্ম উৎসব, নববর্ষ উৎসব পালনের মাধ্যমে অমুসলিমদের অনুকরণ নিকৃষ্ট বিদ'আত"।

বিদ'আতীর পরিণাম

মহান আল্লাহ বলেন

- *রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন কর। (সূরা হাশর ঃ ৭)*

- *(হে নাবী!) তাদেরকে বলুন, আমি কি তোমাদেরকে জানাবো যে, আমলের দিক দিয়ে কারা সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ? (তারা হলো ঐ সব লোক) দুনিয়ার জীবনে যাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ভুল পথে চলেছে এবং যারা মনে করে, তারা সব কিছু ঠিকই করছে। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১০৩-১০৪)*
- *যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও অন্তর সবকিছু (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)*
- *আল্লাহর, হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আল্লাহ এই ধরনের যালিমকে কখনোই হিদায়াত দান করেন না। (সূরা কাসাস ঃ ৫০)*
- *আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা নিসা ঃ ১৪)*

রসূল ﷺ বলেছেন

- আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে অচিরেই বহুতর মতানৈক্য দেখবে। তখন আমার তরিকা এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের তরিকাকে শক্ত হাতে এবং দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। সাবধান বিদ'আত হতে বাঁচ! মনে রেখ প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, হাকেম)
- দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)
- আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে কোন নতুন পদ্ধতি আনলো যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
- কিয়ামত দিবসে হাউজে কাউসারে আমি তোমাদের অগ্রগামী হবো। যে আমার নিকট যাবে সে তা পান করবে, আর যে পান করবে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। সেদিন আমার নিকট অনেক দল হাজির হবে। আমি তাদেরকে চিনবো এবং তারাও আমাকে চিনবে। অতঃপর তাদের ও আমার

মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে, আমি তখন বলব ঃ তারা আমার উম্মত! তখন উত্তর হবে ঃ তুমি জান না যে, তোমার পরে তারা কি কি বিদ'আতী কাজ করেছে। তখন আমি বলব ঃ দূর হও! দূর হও! আমার পরে আমার সুন্নাতে পরিবর্তন এনেছো। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

- যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন। (সহীহ মুসলিম)
- যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যে কাজ আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ মুসলিম)
- বিদ'আতীর সলাত, সিয়াম, হাজ্জ প্রভৃতি ফরয কিংবা নফল কোনো ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না এবং সে ইসলাম থেকে এরূপভাবে খারিজ হয়ে যায় যেভাবে মাখানো আটা থেকে এক গুচ্ছ চুল বের হয়। (ইবনে মাজাহ)
- আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি ঃ কুরআন এবং আমার হাদীস। যতদিন তোমরা এই দুটি জিনিস আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। (মুআত্তা মালেক, হাকেম)
- যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে, সে জাহান্নামে তার জন্যে ঘর তৈরী করুক। (সহীহ বুখারী)
- তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাসারাগণ ঈসা (আ.) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

বিদ'আত কবীরা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক!

কারণ যে কবীরা গুনাহ করে সে জানে এটা জঘন্য অপরাধ এবং কোন একদিন সে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে বা তওবা করতে পারে এবং আল্লাহ চাইলে তাকে মাফ করেও দিতে পারেন। কিন্তু বিদ'আতকারী খুব পুণ্যের কাজ মনে করে বেশী বেশী বিদ'আতী কাজ করতে থাকে তাই তার আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া বা তওবা করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বিদ'আতে "হাসানা" এবং বিদ'আতে "সাইয়েআ" বলতে ইসলামে কিছু নেই

'হাসানা' মানে ভাল আর 'সাইয়েআ' মানে মন্দ। বিদ'আত তো বিদ'আতই এর আর ভাল কি আর মন্দ কি? যা কুরআন-সুন্নাহতে নেই তা যতোই ভাল মনে হোক না কেন তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় সোজা কথা। কেউ কেউ বলে থাকেন শবেবরাত, মিলাদ, মিলাদুন্নবী ইত্যাদি বিদ'আতে হাসানা, অর্থাৎ এই কাজগুলো বিদ'আত কিন্তু ভাল বিদ'আত। ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সবসময় মূল ফর্মুলার দিকে ফিরে যেতে হবে। কোন কাজ যতই ভাল বা পূণ্যের কাজ বলে মনে হোক না কেন তা যদি রসূল ﷺ করে না থাকে তা সওয়াবের আশায় কোনভাবেই করা যাবে না।

যেমন একজন লোক চোর, এখন যদি বলা হয় সে ভাল চোর! চোর তো চোরই তার আবার ভাল কি আর মন্দ কি? সে খারাপ লোক এটাই তার মূল পরিচয়। তাই বিদ'আতে হাসানা এবং বিদ'আতে সাইয়েআ সুস্পষ্ট গুনাহর কাজ এবং ভাল বিদ'আত এই ধরনের মনে করাও আরেকটি বিদ'আত।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মাঝে কোন বিদ'আতের প্রচলন করে, আর তাকে হাসানাহ বা ভাল বলে মনে করে, সে যেন প্রকারান্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে খিয়ানত করেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন ঃ 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম।' সুতরাং রসূল ﷺ -এর যুগে যা ধর্মরূপে গণ্য ছিল না, আজও তা ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। (আল-ইতেসাম ঃ ইমাম শাতেবী)

যে সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ যে ইসলামে কোন ভাল পদ্ধতি প্রচলন করল, সে তার সওয়াব পাবে এবং সেই পদ্ধতি অনুযায়ী যারা কাজ করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে, তাতে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ পদ্ধতি প্রবর্তন করবে সে তার পাপ বহন করবে, এবং যারা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করবে, তাদের পাপও সে বহন করবে, তাতে তাদের পাপের কোন কমতি হবে না। (সহীহ মুসলিম)

বিদ'আত সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান

প্রথম কথা ঃ বিদ'আত বা নব আবিষ্কার সকল ক্ষেত্রে নিন্দিত নয়। শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে যা কিছু নব-আবিষ্কার সেটা হল নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য। আল্লাহর রসূল ﷺ এই বিদ'আতকে নিষিদ্ধ করেছেন। আর শরীয়তের পরিভাষায় এটাকেই বিদ'আত বলা হয়।

দ্বিতীয় কথা ঃ ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া মানব কল্যাণের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নব-আবিষ্কার গ্রহণযোগ্য। এই নব-আবিষ্কারকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি, বরং উৎসাহিত করেছে। যেমন ঃ মাইক, টিভি, ফোন, কম্পিউটার, প্লেন ইত্যাদি।

তৃতীয় কথা ঃ ধর্মীয় কোন বিধি-বিধান বা আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে কোন কিছুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা বা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা বিদ'আতের মধ্যে গণ্য হবে না। যেমন আযান দেয়ার জন্য মাইকের ব্যবহার, সলাত ও সিয়ামের সময় জানতে ঘড়ি, কম্পাস ও ক্যালেন্ডারের ব্যবহার -- ইত্যাদি বিদ'আতের মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ, কেউ এগুলোকে ধর্মের অংশ মনে করে না। বা এগুলোর মাধ্যমে ধর্মে কোন নতুন আচার চালু হয়নি। বরং, যা হয়েছে তাহল প্রাচীন আচারের অবকাঠামো ঠিক রেখে তা বাস্তবায়নে আধুনিক পদ্ধতির অবলম্বন যা শরীয়তের পরিভাষায় ভাল ও উপকারী পদ্ধতি বা সুন্নাতে হাসানা বলা যায়। বিদ'আত নয়।

আধুনিক প্রযুক্তি (টেকনলজী) ব্যবহার বিদ'আত নয়

কেউ কেউ আমরা মনে করতে পারি যে, টিভি, কম্পিউটার, প্রজেক্টর, ফেইসবুক, স্মার্ট ফোন ইত্যাদিও তো নতুন আবিষ্কার। তাহলেতো এগুলোও বিদ'আত। না, এই ধারণা মোটেও ঠিক নয়। বিদ'আতের সাথে শুধুমাত্র ইবাদতের সম্পর্ক। বরং মানব কল্যাণে সকল আবিষ্কার ইসলাম স্বাদরে গ্রহণ করে। এই সকল আবিষ্কারের কারণে ইসলামের আরো প্রসার ঘটছে। আজকাল মানুষ টেক্নলজি ব্যবহার করে দ্বীনের কাজ করছে, সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে, অর্থনীতির উন্নয়ন হচ্ছে, মানুষের দুর্ভোগ কমে যাচ্ছে, জীবনযাপন আরো সহজ হয়ে উঠছে। যেমন আগে হাজ্জ করতে যেতে হতো ঘোড়া, উট বা পায়ে হেটে, কিন্তু এখন ব্যবহার হচ্ছে প্লেন। আজকাল ইসলামিক প্রোগ্রামে বা মসজিদে এতো লোক হয় যে সাউন্ড সিসটেম ছাড়া তো কল্পনাই করা যায় না। তাই এই ধরনের নতুন আবিষ্কার বিদ'আত নয়।

কেউ কাউকে ভুল না বুঝি

আমাদের পরিচিত কিছু মাদ্রাসা শিক্ষিত দ্বীনি ভাইদের বক্তব্য ঃ "আমরা যখন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতাম তখন আমাদের শিক্ষক ছাত্রদেরকে দল বেঁধে নিয়ে যেতেন বিভিন্ন বাড়িতে খতম পড়ার জন্য, সেখান থেকে আমরা শিখেছি নানারকম খতমের প্রচলন। আবার কোথাও মিলাদের দাওয়াত থাকলে সেখানে আমরা শিক্ষকের সাথে যেতাম, সেখান থেকে শিখেছি কিভাবে মিলাদ পড়াতে হয়। কোথাও কুলখানি বা চল্লিশা থাকলে শিক্ষকরা সেখানে আমাদেরকে নিয়ে যেতেন এবং তাদের থেকে শিখেছি কিভাবে এগুলো পালন করতে হয়। এই কাজগুলো করে শিক্ষকরা কিছু টাকা-পয়সা পেতেন আমরাও পেতাম এছাড়া ভালভাল খাওয়া-দাওয়া পেতাম। এই বিদ'আত ছাত্র জীবন থেকে আমাদের রক্তের সাথে মিশে আছে যার কারণে তা দূর হওয়া বা সহজে মেনে নেয়া খুব কঠিন। প্রকৃত পক্ষে আমাদের মতো মাদ্রাসার আলেমদের মাধ্যমেই বিদ'আত সমাজে বেশী প্রচলন হয়েছে এবং এখনো চালু আছে।"

মাদ্রাসায় যারা সাধারণত পড়শোনা করেন তারা প্রকৃত পক্ষে খুবই হত দরিদ্র। অনেক মাদ্রাসাতেই পড়াশোনা করতে কোন বেতন লাগে না। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ অসহায় ইয়াতিম ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। যেইসব বাবা-মা সন্তানকে অভাবের তাড়নায় ভাল স্কুলে পড়াতে পারেন না তারা সাধারণত সন্তানকে মাদ্রাসায় দিয়ে থাকেন। আবার অনেক সময় পরিবারের কোন সন্তান যদি পড়াশোনায় অমনযোগী হয় বা কম মেধা সম্পন্ন হয়, অংক, ইংরেজী, বিজ্ঞান ইত্যাদি ভাল না বুঝে তাহলেও তাকে কোন রকম শিক্ষিত করার জন্য মাদ্রাসায় দিয়ে থাকেন। এখানে কোন পক্ষেরই কোন দোষ নেই, সবাই পরিস্থিতির শিকার। তাই আমাদের প্রয়োজন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন। প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সমন্নয়সাধন।

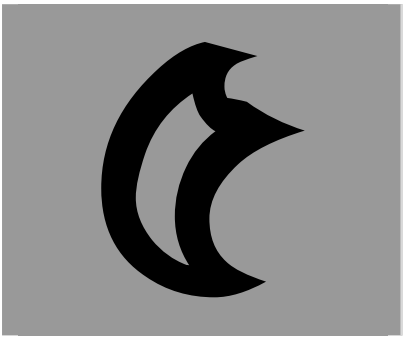

আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ

এখানে বিদ'আত হিসেবে যে কয়টি বিষয়কে পেশ করা হচ্ছে, তার মানে কখনো এ নয় যে, কেবল এ ক'টিই বিদ'আত, এর বাইরে বা এছাড়া আর কোনো বিদ'আত নেই এবং এ ক'টি বিদ'আতের উৎখাত হলেই সমস্ত বিদ'আত বুঝি শেষ হয়ে যাবে, আর সুন্নাতের সোনালী যুগের সূচনা হবে। না, তা নয়। বরং এর অর্থ এই যে, আমাদের মুসলিম সমাজে বর্তমানে যতো বিদ'আত প্রবেশ করেছে, তন্মধ্যে এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত বিদ'আত। নিম্নে কিছু অতি পরিচিত বিদ'আতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো এবং বিদ'আতের একটি লিষ্ট দেয়া হলো যাতে আমরা একে অপরকে সতর্ক করতে পারি।

শবে বরাত ও শবে মিরাজ পালন করা বিদ'আত

'শবে বরাত' কোন আরবী শব্দ নয় এটা ফার্সি শব্দ। 'শব' অর্থ রজনী (রাত) এবং 'বরাত' অর্থ ভাগ্য। ইসলামী চাঁদের মাস শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রিটি ভারতীয় উপমহাদেশে শবে বরাত বলে পরিচিত। এ রাত্রিতে শবে বরাতের নামে যে সব কর্মকান্ড করা হচ্ছে তার ভিত্তি কুরআন সহীহ হাদীস থেকে পাওয়া যায় না। শবে বরাত সংক্রান্ত মা আয়িশা থেকে যে হাদীসটি বর্ণিত হয় তা সহীহ নয়।

ইসলামী সন ৪০০ হিজরীর পূর্বেই সকল অগ্নিপূজকদের রাজ্যসমূহ মুসলিমদের দখলে এসে যায়। এরই মধ্যে 'বারামাকা' নামক এক শ্রেণীর অগ্নিপূজক প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মনেপ্রাণে তারা অগ্নিপূজকই থেকে যায়। তাই এরা মুসলিমদের ছদ্মাবরণে অগ্নিপূজার এক নতুন পন্থা হিসেবে উদ্ভাবন করে শবে বরাত নামক বিদ'আতটি। সলাতুর রাগায়েব নামে চালু করে একটি সলাত (নামায)। এই সলাত ১০০ রাকআত। এটাই শবে

বরাতের সলাত বা নামায বলে খ্যাত। তারা এ সলাতের জন্য জাঁকজমকের সাথে মুসলিমদের লেবাসে মসজিদে হাজির হত, সাধারণ মুসলিমদের মত সলাত আদায় করতো, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিপূজা।

এরা শবে বরাতে এই সলাতের জন্য মসজিদের ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য আলো জ্বালাতো, সম্পূর্ণ মসজিদকে আলোতে ডুবিয়ে রেখে অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত করতো। এভাবে আগুন দিয়ে গোটা মসজিদকে সাজিয়ে যখন সলাত আদায় করতো তখন তাদের চারদিকেই থাকতো আগুন। এই সলাত পড়ার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং আগুন পূজা ও আগুনকে সিজদাহ করানো।

বারামাকা নামক সেই মুসলিম নামধারী ছদ্মবেশী অগ্নিপূজকদের ফাঁদে পা দিয়ে সরলমনা ও অশিক্ষিত মুসলিমরাও মসজিদে জমা হতো। আর এভাবেই তখন থেকে সওয়াবের কাজ মনে করে চলে আসছে শবে বরাত নামক বিদ'আত। আমাদের দেশেও এই দিনে আলোকসজ্জা করা হয় এবং একটি বিদ'আতী কাজকে কত গুরুত্ব দিয়ে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়, আর আমরা অজ্ঞ দেশবাসীও তা আনন্দের সাথে উদযাপন করি।

মিরাজের রাতে মহান আল্লাহ নাবী মুহাম্মদ ﷺ -কে উর্ধআকাশে নিয়ে গিয়েছিলেন এটি সত্যি তা আমরা জানি। কিন্তু প্রতি বছর মিরাজের রাতে অনেকে না জানার কারণে রাত্রি জাগরণ করে নফল সলাত আদায় করে থাকেন, দিনে সিয়াম পালন করে থাকেন যা ইসলামের শারীয়াতে নেই। এই কাজও শবে বরাতের মতো বিদ'আত। মনে রাখতে হবে শবে মিরাজ উপলক্ষে কোন প্রকার ইবাদত নেই, করলে তা হবে প্রচন্ড গুনাহর কাজ।

ঈদে মিলাদুন্নবী পালন বিদ'আত

নাবী ﷺ এর সময়, খুলাফায়ে রাশেদীনদের সময় বা উমাইয়া খলিফাদের যুগে মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী বলতে কিছু ছিল না। এর বীজ বপন করে আব্বাসীয় খলিফাদের যুগে জনৈক মহিলা। মদীনা শরীফে প্রিয় নাবী ﷺ -এর কবর যিয়ারত করার ও সেখানে দু'আ করার যে ব্যবস্থা রয়েছে ঠিক সেভাবে আল্লাহর নাবী ﷺ মক্কায় যে ঘরে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন সেই ঘরটির যিয়ারত ও সেখানে দু'আ করার প্রথা সর্বপ্রথম চালু করেন বাদশাহ হারুনুর রশিদের মা খায়যুরান বিবি (মৃত্যু ১৭৩ হিজরী, ৭৮৯ খৃষ্টাব্দ)। পরবর্তীকালে ১২ই রবিউল আউয়ালকে আল্লাহর নাবী ﷺ -এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস ধরে নিয়ে তীর্থযাত্রীগণ

ঐ ঘরে এসে দু'আ করা ছাড়াও বরকতের আশায় ভূমিষ্ট হওয়ার স্থানটি স্পর্শ ও চুম্বন করতো। এখানে ব্যক্তিগত যিয়ারত ছাড়াও একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। তা ইবনু জুবাইরের (মৃত্যু ৬১৪ হিঃ) গ্রন্থের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় প্রথম জানা যায়।

মিশরের ফাতিমী শিয়া শাসকরা মুসলিমদের মধ্যে জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি চালু করেন। এই ফাতিমী শিয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবূ মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ ইবনু মায়মূন প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন। কারো মতে তিনি ছিলেন অগ্নিপূজারী। অতঃপর হিজরী চতুর্থ শতকে এই উবাইদ নামক ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় উবাইদুল্লাহ। তিনি নিজেকে ফাতিমা (রা.)-র সম্ভ্রান্ত বংশধর বলে দাবী করেন এবং মাহদী উপাধি ধারণ করেন। এরই প্রপৌত্র (পৌত্রের ছেলে) মুয়িয লিদীনিল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের জন্মবার্ষিকীর অনুকরণে ছয় রকম জন্মবার্ষিকী ইসলামে আমদানী করেন।

মুসলিমদের মাঝে এই জন্মবার্ষিকী রীতি চালু হওয়ার একশ তিন বছর পর অর্থাৎ ৪৬৫ হিজরীতে আফজাল ইবনু আমীরুল জাইশ মিশরের ক্ষমতা দখল করে রসূল ﷺ, আলী (রা.), ফাতিমাহ (রা.), হাসান (রা.), হোসেন (রা.)-এর নামে প্রচলিত ছয়টি জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি বাতিল করে দেন। এরপর ত্রিশ বছর বন্ধ থাকার পর ফাতিমী শিয়া খলিফা আমির বি-আহকা-মিল্লাহ পুনরায় এই প্রথা চালু করেন।

এবং ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মিশরের ফিরাউন জন্মোৎসব পালন করতেন। তারপর ঐ রীতি খ্রীষ্টানদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। ফলে তারা তাদের নাবী ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মবার্ষিকী 'ক্রিসমাস ডে' পালন করতে থাকে।

দুঃখের বিষয় ঈদে মিলাদুন্নবীর নামে একটি মারাত্মক বিদ'আতী কাজে আমাদের দেশে রাষ্ট্রিয় ছুটি দেয়া হয়, বিভিন্ন জায়গায় আলোকসজ্জা করা হয়, অফিস-আদালত, পুলিশ ক্যাম্প, ক্যন্টনমেন্ট, জেলখানা ইত্যাদিতে পোলাও-বিরিয়ানী খাওয়ানো হয়। শহরে-গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় মানুষের মিছিল, গাড়ির মিছিল বের হয়। পীরসাহেবরা ঐদিন বছরের সবচাইতে বড় মাহফিলটি করে থাকেন, আর অসহায় মুরীদেরা গরু-মহিষ নিয়ে হাজির হয় সেই পীরের দরবারে।

রসূল ﷺ বলছেন ঃ প্রত্যেক জাতির আনন্দোৎসব আছে আর আমাদের আনন্দোৎসব এই দুটি- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। (আবূ দাউদ) কিন্তু অতি

দুঃখের বিষয় ইসলামে দলিল ভিত্তিক দুটি আনন্দ উৎসব থাকা সত্ত্বেও 'ঈদে মিলাদুন্নবী' নামে আমাদের সমাজে আরেকটি ঈদ চালু করা হয়েছে যা ইসলামে স্বীকৃত নয় সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।

মিলাদ পড়া সুস্পষ্ট বিদ'আত

মিলাদ মানে জন্মদিন, রসূল ﷺ তার জীবনে কোন দিন নিজের জন্মদিন পালন করেন নাই এবং তাঁর কোন আত্মীয়ের জন্মদিন পালন করেন নাই। রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পর চার খলিফা বা কোন সাহাবী তাঁর জন্মদিন পালন করেন নাই। কোন তাবেঈ, তাবেতাবেঈ বা ইমামগণ কোন দিন রসূল ﷺ -এর বা কোন সাহাবার জন্মদিন পালন করেন নাই। যদি এটা পূণ্যের কাজ হতো তাহলে অবশ্যই তাঁরা এটা পালন করতেন কারণ আমাদের চাইতে তাঁরা অনেক বেশী তাকওয়াবান ছিলেন। তাই পুণ্যের কাজ মনে করে মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা সুস্পষ্ট বিদআত এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ। ইসলামে যে সকল সুস্পষ্ট ফরয কাজ রয়েছে সেগুলোইতো আমরা ঠিক মতো পালন করছি না তার উপর কেন একটা বিদআতী কাজকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছি!

কি হাস্যকর কাজ! আমাদের দেশে আমরা কারো জন্ম হলেও জন্মদিন পালন করি, আবার মৃত্যু হলেও জন্মদিন পালন করি অর্থাৎ মিলাদ পড়াই। আবার নতুন দোকান উদ্বোধন করতেও জন্মদিন পালন করি আবার নতুন চাকুরী হলে বা প্রমোশন হলেও জন্মদিন পালন করি। এখন আমরা এতোসব উপলক্ষ নিয়ে কার জন্মদিন পালন করি? কাকেই বা খুশি করার জন্য জিলাপী বিলাই?

ধরে নিলাম মিলাদ খুবই ভাল কাজ, পূণ্যের কাজ, মিলাদ পড়ালে বাড়িতে বরকত হয়, ব্যবসায় উন্নতি হয় এবং অনেক অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। যদি কাজটি সওয়াবের কাজ হয় এবং বাড়িতে মিলাদ পড়ালে বরকত হয় তাহলে হুজুর তার বাড়িতে মিলাদ পড়ান না কেন? আমাদের মিলাদ পড়ানোর জন্য তো হুজুর ভাড়া করে আনতে হয়, তাকে টাকা দিতে হয়। হুজুরতো নিজের বাড়িতে নিজেই মিলাদ পড়াতে পারেন, কাউকে টাকা-পয়সাও দিতে হচ্ছে না। তিনি তো প্রতিদিন তার নিজ বাড়িতে মিলাদ পড়াতে পারেন, প্রতিদিন না হোক প্রতি সপ্তাহে তো একদিন মিলাদ পড়াতে পারেন, প্রতি সপ্তাহে না হোক প্রতি মাসে তো একবার মিলাদ পড়াতে পারেন। কিন্তু হুজুর তো বছরেও একবার তার নিজ বাড়িতে মিলাদ পড়ান না। তিনি শুধু অন্যের ভালোর জন্য অন্যের সওয়াবের জন্য অন্যের বাড়িতে মিলাদ পড়িয়ে বেড়ান! কি আশ্চর্য! মিলাদ, মিলাদুন্নবী

এবং শবে বরাতের বিস্তারিত ইতিহাস জানার জন্য রেফারেন্সের বইগুলো আমরা পড়তে পারি। ইনশা-আল্লাহ, সব ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবে।

মুখে উচ্চারণ করে সলাতের নিয়্যত করা বিদ'আত

নাউয়াইতুয়ান ওসাল্লিয়া লিল্লাহি রাকাতাই সালাতিল ..... ইত্যাদি বলে মুখে উচ্চারণ করে সলাতের জন্য যে নিয়্যত করি তা কোন সহীহ হাদীস তো দূরের কথা কোন জাল হাদীসেও নেই। রসূল ﷺ বা সাহাবারা মুখে উচ্চারণ করে এভাবে কখনোই নিয়্যত করেন নাই। এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কি আমরা নিয়্যত ছাড়াই সলাত আদায় করব? অবশ্যই না, নিয়্যত হচ্ছে সলাতের পূর্বশর্ত। আমি যখন যে সলাতের জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছি বা সলাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি বা জায়নামাযে সলাতের জন্য দাঁড়াচ্ছি, তখন ঐ সলাতের নিয়্যত (বা ইচ্ছা) আমার মনের মধ্যে বা অন্তরে (অর্থাৎ ব্রেইনে) অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন আমি যখন ফযর সলাতের জন্য দাঁড়াচ্ছি তখন আমার মনের মধ্যে যেন মাগরিবের সলাতের চিন্তা না থাকে। আবার ফরয সলাতের সময় যেন নফল সলাতের চিন্তা না আসে। একইভাবে আমি যখন ঈদুল আজহায় পশু কুরবানী করি তখনও মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই। আমি যখনই কুরবানী দিবো বলে চিন্তা করেছি তখনই তো আমি নিয়্যত করে ফেলেছি এবং তা আল্লাহর দরবারে চলে গেছে। সলাতে দাড়িয়ে জায়নামাযের দু'আ বলতেও কিছু নেই।

কাযা এবং উমরী কাযা সলাত বিদ'আত

কুরআন ও সুন্নাহয় উমরী কাযা বলতে কিছু নেই। রসূল ﷺ কোন দিন উমরী কাযা সলাত আদায় করেননি, যদি করতেন তাহলে তা অবশ্যই সহীহ হাদীসগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যেতো। ফরয সলাত ছেড়ে দেয়ার তো কোন way-ই নাই তার উপর আবার উমরী কাযা কোথা থেকে আসবে? নিম্নের সহীহ হাদীস দু'টি দেখি ঃ

- মু'মিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা। (সহীহ মুসলিম)

- আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে সলাতের। অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল সে কুফরী করল। (আবু দাউদ, আহম্মদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

দলিল

রসূল ﷺ -এর জীবনীতে দেখা যায় যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যখন সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে তখন সাহাবীদেরকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, একদল যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন এবং অপর দল জামাতে সলাত আদায় করেছেন। যদি ফরয সলাত কাযা পড়ার হুকুমই থাকতো তাহলে তারা ঐ যুদ্ধের ময়দানে সলাত না আদায় করে পরে এক সময় আদায় করে নিতে পারতেন। আবার দেখা গেছে যে রসূল ﷺ উটের পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন পথিমধ্যে সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে এবং উটের পিঠ থেকে নামার কোন উপায় নেই তখন তিনি ঐ অবস্থায়ই সলাত আদায় করে নিয়েছেন। যদি ফরযের ক্ষেত্রে কাযা সলাতের হুকুম থাকতো তাহলে তিনি গন্তব্যে পৌঁছেই কাযা সলাত আদায় করে নিতে পারতেন, অতো কষ্ট করে উটের পিঠে সলাত আদায় করতেন না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমরা সহীহ মুসলিম এর সলাতের অধ্যায় দেখতে পারি।

তাই কোন অবস্থাই ফরয সলাতের কোন প্রকার কাযা নেই। হয় আমাকে সময়ের মধ্যে সলাত আদায় করে নিতে হবে অথবা সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না। তিন অবস্থায় সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না এবং এর কোন কাফ্ফারাও নেই। ১) পাগল হয়ে গেলে ২) অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে এবং ৩) মহিলাদের পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে। এর বাইরে প্রতিটি মুসলিমের সকল সময়ে সলাত আদায় করতে হবে যখন থেকে তার উপর সলাত ফরয হয়েছে।

অনিচ্ছাকৃত ভুল

আমরা জানলাম যে ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছাড়ার কোন উপায় নেই, এই বলে যে, এই সলাতটা পরে আদায় করে নিব, তা হবে না। যদি এমন হয় যে আমার অজান্তে কোন এক ওয়াক্ত সলাতের সময় পার হয়ে গেছে এবং আমি খেয়ালই করেননি যে কখন যে সময় চলে গেছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়িনি তখন আমি কী করবো? আমার এই ভুলের জন্য আমি অবশ্যই আল্লাহর কাজে স্পেশাল ক্ষমা চাইবো, তওবা করবো এবং যখনই মনে হবে যে আমার ওয়াক্ত পার হয়ে গেছে ঐ মুহূর্তেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সলাতটা আদায় করে নিতে হবে।

যেমন আমি হঠাৎ একদিন ফযরে ঘুম থেকে উঠতে পারলাম না, জেগে দেখলাম সূর্য উঠে গেছে তখন সাথে সাথে ঐ মুহূর্তেই ওযূ করে ফযরের সলাত আদায় করে নিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তবে এই ধরনের ভুল মাঝে মধ্যে করা যাবে না বা প্র্যাক্টিসে নিয়ে আসা যাবে না। এই ধরনের ভুল যেন আর না হয় সেদিকে সতর্ক হতে হবে। কারণ আমার অন্তরের নিয়্যত কিন্তু মহান আল্লাহ জানেন।

যদি সহীহ মুসলিমের সলাতের অধ্যায় দেখি তাহলে দেখা যায় যে রসূল ﷺ এর জীবনেও একবার এরকম অনিচ্ছাকৃত ঘটনা ঘটেছিল। তিনি একদিন ফযরে উঠতে পারেননি এবং উঠে দেখেন সূর্য উঠে গেছে অর্থাৎ তিনি যাকে ফজরে ঘুম থেকে সবাইকে ডেকে তুলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনিও হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং সময় মতো সবাইকে জাগাতে পারেন নাই। সূর্য উদয়ের পরে যখন রসূল ﷺ জেগেছেন তখন তিনি ২ রাকআত সুন্নাহ এবং দুই রাকআত ফরয সলাত আদায় করে নিয়েছিলেন।

ভুল ধারণার অবসান

আমাদের দেশে একটা ভুল নিয়ম প্রচলিত আছে আর তা হচ্ছে উমরী কাযা। অর্থাৎ সারা জীবনে যে সকল সলাত আদায় করা হয়নি তা এক সাথে আদায় করে নেয়া বা মক্কা-মদীনায় গিয়ে আদায় করা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। উমরী কাজা বলতে কুরআন ও সুন্নাহয় কিছু নেই। আমি আমার জীবনে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন সলাত না আদায় করে থাকি বা কোন কবিরাহ গুনাহ করে থাকি তাহলে তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। উমরী কাযা বলে কোন বিদ'আত চালু করা যাবে না অর্থাৎ একটা ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটা নতুন ভুলের জন্ম দেয়া যাবে না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য আসুন ইন্টারনেটে দেখি Youtube: Motiur Rahman Madani.

প্রত্যেক সলাত শেষে ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে মুনাজাত করা বিদ'আত

'মুনাজাতুন' অর্থ কানে কানে কথা বলা বা গোপনে কথা বলা। ফরয সলাতের পর সালাম ফিরানোর পরপরই ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত এবং ইমাম সাহেবের সাথে স্বর মিলিয়ে আমিন আমিন বলা, এবং মুনাজাত করতেই হবে এটা জরুরী মনে করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।

এটা বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা যায় না। কারণ রসূল ﷺ ফরয সলাতের পর এই ধরনের কাজ করেন নাই। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে পাওয়া যায় যে, রসূল ﷺ একবার হাত তুলে সম্মিলিতভাবে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছিলেন।

এখন আমার মনে প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে কি আমরা মুনাজাত করব না? হ্যাঁ, মুনাজাত আমি অবশ্যই করতে পারি, তবে ঐভাবে না। আমার যা যা ইচ্ছা আমি সলাতের পর একা একা মুনাজাত করে মহান আল্লাহর কাছে চাইতে পারি। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মুনাজাতটা সলাতের কোন অংশ নয়, এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইমাম সাহেবও একা একা মুনাজাত করে আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন। শুধু মুনাজাতের মধ্যে কেন? আমি আল্লাহর কাছে সিজদার মধ্যে, দুই সিজদার মাঝে, শেষ বৈঠকে, রুকু থেকে উঠার পরেও আল্লাহর কাছে চাইতে পারি। আসলে গোটা সলাতটাই তো দু'আ, অর্থাৎ আমি যদি অর্থ বুঝে সলাত আদায় করি তাহলে দেখা যায় যে সলাতের প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যা যা পড়ছি তা সবই আমাদের নিজেদের ভালোর জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ (প্রার্থনা)।

রসূল ﷺ ফরয সলাতে সালাম ফিরানোর পর কী করতেন?

১) রসূল ﷺ সালাম ফিরিয়েই উচ্চস্বরে একবার বলতেন "আল্লাহু আকবার, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

২) তারপর তিনি বলতেন "আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারক্তা ইয়া যাল্জালালি ওয়াল ইক্রাম।" (সহীহ মুসলিম)

৩) এরপর রসূল ﷺ সালামের পর আরো পড়তেন "৩৩ বার সুব্হানাল্লাহ, ৩৩ বার আল্হামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আক্বার, ১ বার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ..... ।" (সহীহ মুসলিম)

তিনি ফরয সলাতের সালাম ফিরানোর পরপর কোন মুনাজাতও করতেন না এবং কোন সুন্নাতও পড়তেন না, তিনি উপরের দু'আ (আজকার) গুলো ধীরে-সুস্থে পড়তেন।

কোন্ কোন্ স্থানে সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে দু'আ করা যাবে না?

১. ফরয সলাতের পর সালাম ফিরানোর পরপরই ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত বা দু'আ করা যাবে না;
২. জানাযার সলাতের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যাবে না।
৩. কোন সভা-সমিতি, মাহফিল বা প্রোগ্রাম শেষে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত বা দু'আ করা যাবে না।
৪. বিবাহের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত বা দু'আ করা যাবে না।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, হাত তুললে অসুবিধা কি? অসুবিধা সেখানেই যেখানে আল্লাহর রসূল দু'আ করেছেন কিন্তু হাত তুলেন নাই, সেই সকল স্থানে হাত তুলা যাবে না। যেমন আরো অনেক জায়গায় রসূল ﷺ দু'আ করেছেন কিন্তু হাত তুলেন নাই, তাই আমরাও হাত তুলতে পারবো না। যেমন ঃ টয়লেটে ঢুকার সময় ও বের হওয়ার সময়, স্ত্রী সহবাসের সময়, ঘুমানোর সময় ও ঘুম থেকে উঠে, খাওয়ার শুরু ও শেষে, যানবাহনে উঠার সময়, যাত্রার সময়, হাঁচি দিলে ও হাঁচির উত্তরে, মসজিদের ঢুকার সময় ও বের হওয়ার সময় ইত্যাদিতে দু'হাত উঠানো।

এখন ভাল মনে করে যদি আমরা এই সকল দু'আ পড়ার সময় হাত তুলি তাহলে তা হবে বিদ'আত। তাই ভাল মনে করে ইসলামের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আনা যাবে না, এমনকি সেই আমল বড় কোন পীর, ওলী বা বুজুর্গ দ্বারা সংঘটিত হোক না কেন। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ -কে অনুসরণ করতে হবে।

শুধু তিন স্থানে সম্মিলিতভাবে দু'হাত হাত তুলে দু'আ করা যাবে

১. বৃষ্টি চাইতে গিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা যাবে। (সহীহ বুখারী)
২. সলাতে কুনুতে নাযেলায় সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা যাবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও আবুদাউদ)
৩. যুদ্ধক্ষেত্রে বা কারো সাথে দন্দ্ব হলে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা যাবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও আবুদাউদ)

কোন্ কোন্ স্থানে একাকী দু'হাত তুলে দু'আ করা যাবে?

নিম্নের এই সকল স্থানগুলোতে একাকী হাত তুলে দু'আ করা যেতে পারে।

- সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে হাত তুলে দু'আ করা যায়; (আবু দাউদ)
- জমজমের পানি পান করার পর হাত তুলে দু'আ করা যায়;
- আরাফার মাঠে হাত তুলে দু'আ করা যায়;
- মুজদালিফার মাঠে হাত তুলে দু'আ করা যায়;
- জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর হাত তুলে দু'আ করা যায়;
- ছেলেমেয়ের জন্য হাত তুলে দু'আ করা যায়;
- কবরস্থানে গিয়ে হাত তুলে দু'আ করা যায়;

মহররমের মেলা বিদ'আত

যে ব্যক্তি আশুরার দিনে তার পরিবারবর্গের লোকদের জন্য স্বচ্ছলতার (ভাল খাবার) ব্যবস্থা করবে আল্লাহ সারা বছর তাকে স্বচ্ছল রাখবেন বলে যে হাদীসটি প্রচলিত আছে সেই সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ নয়। আশুরার সাথে হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের কোন সম্পর্ক নেই। কারবালার ইতিহাস স্মরণে আশুরা পালনের নামে যে সকল মাতম, মর্সিয়া, তাযিয়া মিছিল, শরীর রক্তাক্ত করণ, নতুন কাপড় পরিধান, ভালোভালো রান্না করা বিদ'আত। মহররম উপলক্ষে মিরপুর, মুহাম্মাদপুর, পুরান টাউনে বিহারীরা যে কাজগুলো করে তা অনেক ক্ষেত্রে শিরক। প্রতি বছর মহররম উপলক্ষে আজিমপুরে মেলার আয়োজন করা হয় এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই বরং গুনাহর কাজ। ইসলাম এ সকল কার্যকলাপের অনুমোদন দেয় না। এসব হচ্ছে শিয়াদের ক্রিয়াকলাপ। এগুলো সন্দেহাতীতভাবে বিদ'আত। এগুলো বর্জন করে চলা ও অন্যদেরও বর্জন করতে উৎসাহিত করা রসূলে কারীম ﷺ -এর সুন্নাহ অনুসারী সকল ঈমানদারের কর্তব্য।

পানি পড়া, তেল পড়া ও সুতা পড়া বিদ'আত

প্রায়ই দেখা যায় হুজুরা বিভিন্ন কারণে রোগিকে পানি পড়া দিয়ে থাকেন। এই পানি পড়া কি ইসলাম সম্মত? আল্লাহর রসূল ﷺ বা কোন সাহাবা (রা.) কি কখনো কাউকে পানি পড়া দিয়েছেন? সহীহ হাদীসে এর কোন দলিল নেই।

আল্লাহর রসূল ﷺ এবং সাহাবা (রা.)-গণ কখনো কাউকে পানি পড়া দেননি তাই এটি বিদ'আত।

পানি পড়া ইসলাম সম্মত তো নয় এবং বিজ্ঞান সম্মতও নয়। কারণ যখন পানির মধ্যে ফুঁ দেয়া হয় তখন তার মধ্যে কার্বনডাইঅক্সাইড থাকে যা শরীরের জন্য খুই ক্ষতিকারক, আমরা জানি অতিরিক্ত কার্বনডাইঅক্সাইডে মানুষ মারাও যায়। তাই ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে নাবী ﷺ পানির গ্লাসে নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ)

ঝাড়-ফুঁক এর বিধান ঃ ঝাড়-ফুঁক ইসলামে জাযেয, তবে আল্লাহর রসূল ﷺ যতোটুকু করেছেন ঠিক ততোটুকুই জায়েয, এর বেশী নয়। ঝাড়-ফুঁকের বিধান হচ্ছে কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে শরীরে ফুঁ দেয়া। যেমন, শরীরের কোথাও ব্যাথা অনুভব হলে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দেয়া বা দুষ্ট জ্বীন থেকে আত্মরক্ষার জন্য সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে শরীরে ফুঁ দেয়া।

তবে এ বিষয়ে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে মানুষের বানানো কুরআনের আয়াত দিয়ে নানারকম চিকিৎসার লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে যা সহীহ হাদীসে নেই। যেমন নিয়ামুল কুরআন বা মকসুদুল মুমিনিন বই পত্রে রয়েছে। তাই ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারো নিকটে না গিয়ে সহীহ হাদীস থেকে নিজের চিকিৎসা নিজে করাই ভাল, কারণ ঐ হুজুর কী পড়ে ফুঁ দিবেন তা তো আমরা জানি না, হতে পারে সেটা সহীহ হাদীস ভিত্তিক আবার হতে পারে সেটা শিরক-কুফুরী। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শুধু ঝাড়-ফুঁক করে ছেড়ে দিলেই হবে না পাশাপাশি ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে। ঝাড়-ফুঁক হচ্ছে আল্লাহর উপর ভরসা, আর ডাক্তারের কাছে যাওয়াটাও আল্লাহর রসূল ﷺ -এর নির্দেশ। এছাড়া নানারকম অসুখের জন্য হুজুররা কাল সুতা (কায়তন) পড়া বা তেল পড়া দিয়ে থাকেন। এগুলোও ইসলাম সম্মত না এবং বিদ'আত।

চাল পড়া ও বাটি চালান বিদ'আত

আমাদের দেশে এখনো দেখা যায় মানুষ অজ্ঞতার কারণে কিছু চুরি হলে হুজুরের কাছে যায় চাল পড়া আনার জন্য। হুজুরের দেয়া চাল পড়া এনে সবাইকে খাওয়ায় চোর ধরার জন্য। যে ব্যক্তি চাল চিবাতে পারবে না সেই নাকি চোর! আবার অনেকে বাটি চালান দেন চোর ধরার জন্য। এজন্য নাকি তুলা রাশির

লোক লাগে। বাটি অলৌকিক ক্ষমতায় ঐ তুলা রাশিওয়ালাকে ঠেলে নিয়ে চোরের বাড়িতে অথবা হারানো জিনিসের নিকট হাজির হয়! ইসলামে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহর রসূল ﷺ এবং সাহাবা (রা.)-গণ কখনো কাউকে এই জাতীয় তদবীর দেননি তাই এগুলোও বিদ'আত এবং গুনার কাজ। তবে এইগুলো করতে গিয়ে হুজুর যদি কুফরী/মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে পড়ে থাকেন তাহলে তা হবে শিরক।

চাল পড়া এবং বাটি চালান দিয়ে যদি চোর ধরাই যেতো তাহলে সরকার র‍্যাবের অফিসে এবং থানাগুলোতে মাদ্রাসার হুজুরদেরকে চাকরি দিতেন আর তাদেরকে বস্তায় বস্তায় চাল সাপ্লাই দিতেন। তারা র‍্যাব এবং পুলিশের হয়ে চোর ধরতেন আর জেলে পাঠাতেন! মনে রাখতে হবে কুরআন চাল পড়া বা বাটি চালান দিয়ে চোর ধরার জন্য নাযিল হয় নাই, আল কুরআন নাযিল হয়েছে মানব জাতির হিদায়াতের মাধ্যমে চিরতরে চুরি-ডাকাতিসহ সকল অপরাধ বন্ধ করা জন্যে।

স্বপ্ন দেখা নিয়ে বিদ'আত

আমরা সবাই কম বেশী স্বপ্ন দেখি। কোন স্বপ্ন ভাল আবার কোন স্বপ্ন খারাপ। ইসলামী দিক থেকে স্বপ্নের বিষয়টা আমরা অনেকেই পরিষ্কার না। যার কারণে আমরা কোন স্বপ্ন দেখে নানারকম মন্তব্য করি বা এটা-সেটা আমল করি। কিন্তু ইসলাম এই বিষয়ে কী বলে এবং আমাদের কী করা উচিৎ আর কী করা উচিৎ নয় তা জানা আবশ্যক। কারণ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে আমরা যদি ভুল কিছু করে থাকি তাহলে গুনাহগার হতে হবে।

স্বপ্ন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি হলো ঃ নাবী-রসূলরা যে স্বপ্ন দেখতেন তা সত্য হতো। ইউসুফ (আ.) এবং মুহাম্মাদ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন (যা তাঁরা আল্লাহর সাহায্য নিয়েই বলতেন) কিন্তু এখন আর সেই ক্ষমতা কারো নেই। আমরা অনেক সময় স্বপ্ন দেখার পর কোন হুজুরের নিকট যাই তার ব্যাখ্যা জানার জন্য, এগুলো ঠিক নয়। কোন পীর বা বুজুর্গ যদি দাবি করেন যে সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন তাহলে তা বিশ্বাস করা যাবে না।

বাজারে স্বপ্নের তাবীরের নানারকম বই পাওয়া যায় যেমন, ইউসুফী খাবনামা বা সোলেমানী খাবনামা ইত্যাদি। এই সকল বই অনুসরণ করা গুনাহ কারণ এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। অনেক সময় আমরা কোন ঘটনা ঘটার পর

মন্তব্য করি যে, আমি স্বপ্নে দেখে ছিলাম এই রকম এই রকম, ঐ স্বপ্নের সাথে ঘটনা মিলাতে চেষ্টা করি। এই ধরনের কাজও ঠিক না।

ভাল স্বপ্ন বা খারাপ স্বপ্ন দেখার পর করণীয় ঃ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর বিভ্রান্তিমূলক স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে, অতএব যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা তার কাছে ভাল লাগে সে যেন তা তার প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অপর কার নিকট ব্যক্ত না করে। আর সে যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তখন সে যেন তা কারো নিকট না বলে। বরং তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করে ঐ অনিষ্ট হতে যা সে দেখেছে। (এই কাজ তিনবার করতে হবে) সে যেন তা কারো নিকট না বলে। অতঃপর যে পার্শ্বে সে শুয়েছিল তা পরিবর্তন করে (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)। [রাতে] উঠে সলাত আদায় করবে যদি তার ইচ্ছা করে (সহীহ মুসলিম)।

সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, খারাপ স্বপ্ন শয়তান দেখিয়ে থাকে। তাই রসূল ﷺ ঘুমাতে যাওয়ার সময় এবং ঘুম থেকে উঠে দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সন্তানেরা অনেক সময় খারাপ স্বপ্ন দেখে ভয়ে রাতে কেঁদে উঠে। তাই প্রতি রাতে ঘুমানোর সময় তাদের ঘুমানোর দু'আ পড়া স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত। সন্তান যদি শিশু হয় তাহলে তার জন্য বাবা-মা পড়বেন। এছাড়া নাপাক হয়ে ঘুমানো উচিত নয়, গোসল ফরয হয়ে থাকলে অন্ততপক্ষে ওযূ করে ঘুমানো উচিত। মনে রাখতে হবে শয়তান হচ্ছে দুষ্ট জ্বীন সে সারাক্ষণ আমাদের আশ-পাশ দিয়েই ঘুড়াঘুড়ি করে।

সহীহ হাদীস থেকে আমরা এটাও জানলাম যে ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এবং সেই স্বপ্নের কথা প্রিয় ব্যক্তির কাছে বলা যেতে পারে, এর মানে এই নয় যে কাউকে খুঁজে বের করে তার কাছে স্বপ্নের কথা বলতেই হবে। আর এই স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে যেন নিজেরা নিজেরা নানারকম ব্যাখ্যা দিতে না থাকি। কারণ ঐ স্বপ্নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ কী বুঝতে চেয়েছেন তা তিনি ছাড়া আর কেউ ভাল জানে না। তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে, এই নিয়ে ঘাটা-ঘাটি করা যাবে না।

অনেকে স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে দেখে। তখন কেউ কেউ ধরে নেয় যে মৃত ব্যক্তি কষ্টে আছে বা তার জন্য আমল করতে হবে। আবার কেউ কেউ মনে করে যে

তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, কারণ মৃত ব্যক্তি তাকে ডাকছে। আবার অনেকে বলে স্বপ্নে দাত পরা দেখলে কেউ মারা যাবে ইত্যাদি। ইসলামী দৃষ্টিতে এই ধরনের ধারণা আসলে ঠিক নয়। পেপারে একটি ঘটনা পড়েছিলাম, বাংলাদেশের কোন এক গ্রামে এক লোক স্বপ্নে কুরবানী সংক্রান্ত কিছু একটা দেখেছে। সে তার এই স্বপ্নকে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার সাথে মিলানোর চেষ্টা করেছে। (নাউযুবিল্লাহ) তারপর সকালে ঘুম থেকে উঠে সে সত্যি সত্যি তার শিশু পুত্রকে জাবাই করে ফেলেছে! এখন সে জেল-হাজত খাটছে।

রসূল ﷺ -কে স্বপ্ন দেখার বিষয়টি কী? এই বিষয়টা নিয়ে যেন আমরা তর্কে জড়িয়ে না যাই, আমরা বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করি। আমরা হুজুরদের মুখে ওয়াজে শুনে থাকি যে, নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে স্বপ্নে দেখলে জান্নাত নিশ্চিত! এই ধরনের কথা ইসলামের দৃষ্টিতে কতটুকু সত্য। সহীহ হাদীসে কি এর কোন দলিল আছে? এখন প্রশ্ন কেউ স্বপ্নে দেখলেন কিন্তু তিনিই যে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সত্যতা কে যাচাই করবে? কারণ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে তো সাহাবাদের পরের কেউ দেখেননি এবং তাঁর কোন ছবিও নেই। একটি হাদীসে আছে "রসূল ﷺ -এর রূপ শয়তান ধারণ করতে পারে না"। কিন্তু শয়তান যদি অন্য কারো রূপধারণ করে এসে বলে যে আমি তোমার নাবী, তখন কীভাবে বুঝবো? কারণ আমি তো নাবীকে দেখিনি।

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অনেকের সাথেই সাক্ষাত হয়েছে, যারা নাবী মুহাম্মদ ﷺ -কে স্বপ্নে দেখেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন ইসলাম প্র্যাকটিস করেন না, ঠিক মতো নামায পড়েন না, হালাল-হারাম বেছে চলেন না, স্ত্রী পর্দা করেন না ইত্যাদি ইত্যাদি, একজনতো সিগারেট টানতে টানতে খুব তৃপ্তির সাথে বললেন তিনি নাবীকে কয়েকবার দেখেছেন! এখন প্রশ্ন জান্নাত কি এতোই সহজ যে, নাবীকে স্বপ্নে দেখলাম আর জান্নাতে চলে গেলাম! কোন আমলের প্রয়োজন হলো না! আসলে ইসলামের বিষয়টা এমন না। নাবীকে স্বপ্নে দেখার সাথে জান্নাতের কোন সম্পর্ক নেই। স্বপ্নে দেখা তো দূরের কথা যারা নাবীকে জীবদ্দশায় বাস্তবে দেখেছে তাদের মধ্যে অনেকেই জান্নাতে যাবে না। আর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে স্বপ্নে সত্যি সত্যি কেউ দেখলেও ঐ ব্যক্তির আমলের কোন পরিবর্তন হবে না। মার্কেটে হুজুরদের বানানো কিছু আমলের বই পাওয়া যায় যার মাধ্যমে নাবীকে স্বপ্নে দেখা যায়। এই ধরনের কোন আমল সহীহ হাদীসে নেই, এগুলো পালন করা গুনাহ। আসলে জান্নাতে যাওয়ার কোন শর্টকাট রাস্তা নেই, এটিই বাস্তব।

নানারকম ভিত্তিহীন খতমের হাত থেকে আত্মরক্ষা

আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে নানারকম খতম যার কোন কুরআন হাদীসের দলিল নেই। যেমন ঃ খতমে ইউনুস, খতমে তাহ্লীল, খতমে খাজেগান, সবিনা খতম এবং জালালী খতম ইত্যাদি। আল্লাহর রসূল ﷺ এবং তার সাহাবাগণ (রা.) এই কাজ কোন দিন করেননি তাই এই ধরনের খতম সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। দুঃখের বিষয় যে এই খতমগুলো বিভিন্ন হুজুর, আলেম এবং মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা টাকার বিনিময়ে পড়িয়ে থাকেন। যা ইসলামে নেই তা সওয়াবের উদ্দেশ্যে সমাজে এই সকল ব্যক্তিগণ প্রচার এবং প্রসার ঘটাচ্ছেন দীর্ঘ দিন ধরে যা সওয়াবতো নয়ই বরং সুস্পষ্ট গুনার কাজ। আল্লাহ আমাদেরকে এই সকল ভিত্তিহীন খতমের হাত থেকে রক্ষা করুন।

এক বিদ'আত পরিবর্তন হয়ে নতুন বিদ'আত!

আলহামদুলিল্লাহ, সঠিক ইসলামী জ্ঞানের প্রসারতার কারণে এখন অনেক পরিবারই আর মিলাদের আয়োজন করেন না, আগের মতো কুলখানি, চল্লিশা বা মৃত্যুবার্ষিকী করেন না। অনেক মাওলানাদের মধ্যেও এই পরিবর্তন এসেছে, তারা এই পরিবর্তন মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সুক্ষ্ম বিষয়টা হচ্ছে, কেউ মারা গেলে অনেকে এখন আর কুলখানিতে বা মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ পড়ান না ঠিকই কিন্তু এতো দিনের অভ্যেস মনকে মানাতে পারেন না তাই তারা একজন হুজুর ডেকে এনে একটি দু'আর মাহফিলের আয়োজন করেন তারপর খাওয়া-দাওয়া। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দিয়ে বলেন মিলাদতো এখন বিদ'আত তাই হুজুর সবাইকে নিয়ে শুধু দু'আ করবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই স্পেশাল দু'আর মাহফিল কি ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয? এই বিষয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ কী বলেছেন? আল্লাহর রসূল ﷺ কী তার জীবনে কখনো এই জাতীয় দু'আর মাহফিল করেছেন?

উত্তর হচ্ছে, যে কারণে মিলাদ পড়ানো হচ্ছে না সেই একই কারণে এখন একটি দু'আর মাহফিল করা হচ্ছে। একটি বিদ'আত পরিবর্তন হয়ে আরেকটি বিদ'আতের প্রচলন হয়েছে (Just change of face or different formation) একই জিনিসের এক রূপ থেকে অন্য রূপ। যে হুজুর এই দু'আ পরিচালনা করছেন তিনি নিজেও খুশি কারণ তার প্রয়োজন মিটছে, সেও এই বিষয়ে কিছু বলছেন না। মনে রাখতে হবে এই ধরনের স্পেশাল দু'আর

মাহফিল ইসলামের দৃষ্টিতে অবশ্যই জায়েয নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ তার জীবনে কখনো এই জাতীয় দু'আর মাহফিল করেননি। কোন মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে হলে অবশ্যই রসূল ﷺ -এর পদ্ধতিতে করতে হবে। মানুষের তৈরী এই জাতীয় বিভিন্ন দু'আর মাহফিল ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট বিদ'আত।

কিছু দু'আ বা ঘটনা কপি করে বিতরণ করার রহস্য

অনেক সময় আমরা ইমেইলে কিছু দু'আ বা ঘটনা পাই যার শেষে লেখা থাকে যে, এটি আপনি আরো একশ জনকে Forward করুন তা না হলে আপনার ক্ষতি হবে আর বিতরণ করলে আপনি এতো এতো সওয়াব পাবেন। এই জিনিস অনেক সময় বিভিন্ন মসজিদে ফটোকপি আকারেও পাওয়া যায় এবং সেখানেও লিখা থাকে যে আপনি এটি ২০০ ফটোকপি করে বিতরণ করুন তা না হলে আপনার ক্ষতি হবে আর বিতরণ করলে আপনি এতো এতো সওয়াবের ভাগিদার হবেন। এর রহস্য কী? এর উত্তর হচ্ছে, এগুলো অজ্ঞ-মূর্খদের কাজ, এটি বিতরণ করলে ভালও হবে না বা ক্ষতিও হবে না। যদি এর মধ্যে শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত কিছু থাকে তাহলে বিতরণ করলে গুনাহ হবে।

ফাতিমা নামের ফযীলতে জান্নাত!

ওয়াজে শুনা যায়, আখিরাতের ময়দানে আল্লাহ বলবেন, এই মহিলারা তোমরা শোন, তোমাদের যাদের নাম ফাতিমা তারা এক লাইন হও। আমি আমার পেয়ারা দোস্ত মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমার উপর এতোই খুশি যে তোমাদের যাদের নাম ফাতিমা তারা সবাই বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাও। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরনের কোন কথাই আল্লাহ কোথাও বলেননি, এগুলো মিথ্যা কথা। আল্লাহতো মেয়ের চেয়ে তার বাবার উপর আরো বেশী খুশি, আর বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মুসলিমদের নামের আগে মুহাম্মাদ আছে তাহলেতো মুহাম্মাদ নামের সবাই বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া উচিত। আমাদেরকে আসলে একটু পড়াশোনা করতে হবে, তাহলেই চোখ খুলবে, এতোদিন ধরে আমাদের সমাজে যে সকল কল্পকাহিনী ওয়াজ-নসীহতে চলে আসছে তা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো।

নোট ঃ ইসলামী দৃষ্টিতে রসূল ﷺ এর স্ত্রীদের নামের আগে শুধু 'মা' ব্যবহার করা যাবে, তাদেরকে বলা হয় উম্মুল মু'মিনিন অর্থাৎ মু'মিনদের মা। যেমন মা

আয়িশা, মা খাদিজা ইত্যাদি। কিন্তু রসূল ﷺ -এর মেয়েদের নামের আগে 'মা' ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, 'মা ফাতিমা' বা মা কুলসুম ইত্যাদি বলা যাবে না। শুধু নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর স্ত্রীদের মা বলা যাবে অন্য কাউকে নয়।

অন্য কারো মাধ্যমে রসূল ﷺ -এর কবরে সালাম পাঠানো বিদ'আত

কেউ হাজ্জে যাওয়ার আগে অনেক সময় আমরা এই অনুরোধ শুনতে পাই "ভাই আমার সালাম রসূল ﷺ -এর কাছে পৌঁছে দিবেন।" মনে রাখতে হবে, অন্য কারো মাধ্যমে রসূল ﷺ -এর কবরে সালাম পাঠানো সুস্পষ্ট বিদ'আত। কারণ কোন সাহাবী এটা করেননি। কেউ যখন দূর থেকে রসূল ﷺ -কে সালাম দেন বা দুরূদ পাঠ করেন তখন তা ফিরিশতাদের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। (আবু দাউদ, নাসাঈ) তাই কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর কাছে সালাম পাঠানোর প্রয়োজন নেই। তাই আমার দায়িত্ব হবে যখন কেউ আমাকে সালাম পৌঁছানোর কথা বলবেন তখন আমি খুব সুন্দর করে তাকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিবো যেন সে মনে কষ্ট না পান বা ভুল না বুঝেন।

হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে সতর্কতা

আবেস ইবনে রাবীআ (রা.) উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমর) হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমু দিয়ে বললেন, আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কারো অনিষ্ট করতেও পার না, আবার উপকার করতেও সক্ষম নও। যদি আমি নাবী ﷺ -কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমায় চুমু দিতাম না (সহীহ বুখারী)

তাই মনে রাখতে হবে হাজরে আসওয়াদের কোন ক্ষমতা নেই। হাজরে আসওয়াদের নিকট কিছু চাওয়া যাবে না, চাইলে হবে শিরক। হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া সুন্নাহ। তবে প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে, যুদ্ধ করে ধাক্কাধাক্কি করে হাজরে আসওয়াদে গিয়ে চুমু দেয়ার কোন মানে নেই। এতে সওয়াব তো দূরের কথা বরং গুনাহগার হতে হবে। আর মহিলাদের তো প্রশ্নই উঠেনা। তাই এই ভিড়ের মধ্যে দূর থেকে হাত দ্বারা ইশারা করবো কিন্তু ইশারাকৃত হাতে চুমু দেবো না। তাওয়াফের সময় ইশারাকৃত হাতে চুমু দিলে তা হবে বিদ'আত।

হাজ্জে গিয়ে মদীনায় ৪০ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ওয়াজিব মনে করা বিদ'আত

মদীনা যাওয়া বা যিয়ারত করা হাজ্জের কোন অংশ নয়। এটা আমার ইচ্ছা, আমি হাজ্জ করতে এসে মদীনায় চাইলে যেতে পারি অথবা নাও যেতে পারি। হাজ্জ, উমরাহ অথবা যিয়ারতে এসে মদীনা শরীফে ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ওয়াজিব মনে করা বিদ'আত। কোন সহীহ হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। তবে সওয়াবের উদ্দেশ্যে শুধু পৃথিবীর তিন জায়গা যিয়ারত করা যাবে, যথা ঃ মক্কার মসজিদে হারাম, মদীনার মসজিদে নববী এবং জেরুজালেমের মসজিদে আকসা এবং সেই সূত্র ধরে আমি মদীনার মসজিদে নববী যিয়ারত করতে পারি। কারণ অনেকে অনেক দূর দেশ থেকে মক্কায় হাজ্জ করতে আসেন এবং সেই সাথে মদীনাও যিয়ারত করে যান। তবে পরিষ্কার মনে রাখতে হবে, আমি মদীনায় না গেলে আমার হাজ্জের কোন প্রকার ক্ষতি হবে না এবং হাজ্জের সাথে মদীনার কোন সম্পর্ক নেই।

কেউ আবার ভুল না বুঝি। এই আলোচনায় মসজিদে নববীর কোন মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে না। শুধু বিষয়টা সকল হাজ্জ ও উমরাহ পালনকারীর নিকট পরিষ্কার করা হচ্ছে। কারণ আমাদের ভারত উপমহাদেশে মদীনায় ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত সলাতের উপর প্রচন্ড গুরুত্ব দেয়া হয় এবং ওয়াজিব মনে করা হয়। মদীনায় ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত কেন আমি আরো বেশী দিন অবস্থান করে ১৬ দিনে ৮০ ওয়াক্ত সলাতও আদায় করতে পারি তাতে সওয়াবও বেশী হবে। সেখানে সলাত আদায় করার ব্যাপারে কোন দিন বা ওয়াক্ত নির্দিষ্ট নেই। যতো ইচ্ছে তত আদায় করা যাবে। তবে এ কাজটি ওয়াজিব মনে করাটা বিদ'আত।

হাজ্জ করতে গিয়ে একাধিক উমরাহ করা এবং বিভিন্ন নামে নামে তাওয়াফ করা বিদ'আত

একাধিক উমরাহ ঃ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে হাজ্জ করতে গিয়ে বাবার নামে, মায়ের নামে, শশুর-শাশুরীর নামে, ভাই-বোনদের নামে এবং অন্যান্য নিকট আত্মিয়-স্বজনদের নামে একাধিক উমরা করা। আমরা হয়তো না জানার কারণে কাজটি করে থাকি। এই কাজটি করা সহীহ হাদীস ভিত্তিক কিনা সে ব্যাপারে আমাদের হুজুররা কিছু তো বলেনই

না বরং তারাই মূলতঃ এটা করতে উৎসাহিত করেন। বারে বারে একাধিক উমরা করা সত্যিকার অর্থে সহীহ হাদীসের কোথাও কোন দলিল নেই।

রসূল ﷺ হাজ্জের সময় তার জীবনে একবারই উমরাহ করেছিলেন। তাই আমরাও হাজ্জ করতে গিয়ে বিভিন্ন জনের নামে একাধিক উমরাহ করতে পারবো না। এই কাজ করলে তা হবে সুস্পষ্ট বিদ'আত। হাজ্জ করতে গিয়ে বিভিন্ন জনের নামে একাধিক উমরাহ করা কোন সাহাবীদের জীবনীতেও পাওয়া যায় না। যদি কাজটি ইসলামে জায়েয হতো তাহলে অবশ্যই সাহাবারা করতেন। তাই হাজ্জ করতে গিয়ে বারে বারে আয়িশা মসজিদে গিয়ে ইহরাম বেঁধে এসে একাধিক উমরাহ করা গুনাহর কাজ। কিছু ট্যাক্সি ড্রাইভার পয়সার লোভে মানুষকে বোকা বানিয়ে আয়িশা মসজিদে নিয়ে যায় ইহরাম বাঁধার জন্য। হাজ্জ এজেন্সিগুলোও তাদের হাজ্জীদের হারাতে চায় না, তাই তারাও মিথ্যা দলিলের রেফারেন্স দিয়ে বলে থাকে যে নানা জনের নামে একাধিক উমরা করা যায়।

একাধিক তাওয়াফ ঃ একইভাবে নানা জনের নামে একাধিকবার কাবা ঘর তাওয়াফ করাও ইসলামে জায়েজ নেই। কারণ আল্লাহর রসূল ﷺ এবং সাহাবারা বিভিন্ন জনের নামে কখনো তাওয়াফ করেননি। তবে কারো নামে নামে নয়, অবসর সময়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করা সওয়াবের কাজ এবং আল্লাহর রসূল নিজে এই কাজ করেছেন এবং অন্যদেরকে করতে উৎসাহ দিয়েছেন। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যাক। অবশ্যই কাবা ঘর একাধিকবার নফল তাওয়াফ করা যাবে তবে কারো নামে নামে নয়। নফল তাওয়াফ করতে হবে ইহরামের সাদা কাপড় ছাড়া সাধারণ পোশাকেই।

আমাদের মনে একটি অতৃপ্তি থেকে যায় যে, আহারে বাবা-মায়ের জন্য যদি কিছু করতে পারতাম। যেহেতু কাজটি সওয়াবের তাই সন্তান করলে অবশ্যই সদকায়ে জারিয়া হিসেবে তার সওয়াব বাবা-মা এমনিতেই পাবেন। মনে রাখতে হবে নেক সন্তান যতো ভাল কাজ করবে বাবা-মা তার সওয়াব পাবেন। আর তাওয়াফ করার সময় অনেক দু'আ করা যায় এবং করতে হয়। তাই আমি যাদের নামে তাওয়াফ করার নিয়্যত করেছিলাম তাদের নামে তাওয়াফ না করে তাদের জন্য প্রচুর দু'আ করতে পারি। হাজ্জ করতে গিয়ে যারা নানা জনের নামে বার বার উমরাহ ও তাওয়াফ করেন একজন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে আমাদের উচিত তাদের সতর্ক করা এবং সত্য প্রচার করা।

কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো বিদ'আত

অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বসে আছি এবং কেউ আসলো তখন আমরা তার সম্মানার্থে দাঁড়াই অথবা দাঁড়িয়ে সালাম দেই অথবা দাঁড়িয়ে হ্যান্ডসেক করি। এছাড়া আমাদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়ম আছে যে শিক্ষক ক্লাশে ঢুকলেই ছাত্র-ছাত্রীরা তার সম্মানার্থে দাঁড়াবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি নিষেধ এবং বিদ'আত কারণ রসূল ﷺ এই কাজটি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর নিজের সম্মানার্থেও যদি কেউ দাঁড়াতো তা তিনি অপছন্দ করতেন। যেমন দলিলস্বরূপ হাদীসে আছে ঃ

যে লোক পছন্দ করবে যে, লোকেরা তার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য দাঁড়াক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। (সহীহ বুখারী)

আবূ উসামা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ লাঠিতে ভর করে আমাদের মাজলিসে আসলেন। আমরা তাকে দেখে দাঁড়ালাম। তিনি ক্রোধভরে বললেন, তোমরা আমাকে দেখে দাঁড়াবে না যেরূপ বেদ্বীন, অনারবী লোকেরা একে অপরের সম্মানার্থে দাঁড়ায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

তাই কোন মানুষের সম্মানার্থে দাঁড়ানো যাবে না, দাঁড়াতে হবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সম্মানার্থে এবং সলাতের মধ্যে। আল্লাহ বলেন, *তোমরা আদবসহ বিনম্রভাবে কেবল আমার জন্য (সলাতে) দাঁড়াবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)*

খোদা হাফেয থেকে আল্লাহ হাফেয উভয়ই বিদ'আত

খোদা নামের ইতিহাস ঃ খোদা আল্লাহর নাম নয়। তাহলে এই খোদা কোথা থেকে এলো? পৌত্তলিক ধর্মে পারস্যের অগ্নি উপাসক এক মহান দেবতার নাম ছিল খোদ। তাদের মতে সে মেঘের উপর বিচরণ করে। তাদের বিশ্বাস মতে পারস্যের এই অগ্নি উপাসক তাদের বৃষ্টি দিত, তার অসন্তুষ্টিতে দুর্যোগ নেমে আসত। তারা তখন তাকে এভাবে ডাকতো 'খোদ আ' এক সময় তা খোদা রূপ লাভ করে। ডিকশেনারী অনুযায়ী খোদা স্ত্রী লিঙ্গ। খোদা মানে যে আগে ছিল না পরে এসেছে (নাউজুবিল্লাহ)। 'খোদা হাফেয' অভিবাদটি ফার্সি থেকে এসেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার মুসলিমরা বিদায় নেয়ার কালে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে যার হাদীসে কোন অস্তিত্ব নেই। ইসলামী আদবের মধ্যে সহীহ হাদীসে এই ধরনের কোন কথা নেই। দীর্ঘদিন ধরে এই 'খোদা হাফেয' অভিবাদটি আমাদের দেশে প্রচলিত। কিন্তু গত ১৫-২০ বছর আগে

বাংলাদেশের একটি ইসলামী দল ইতিহাস জানার পর এটি পরিবর্তন করে 'আল্লাহ হাফেয' প্রচলন শুরু করে। তবে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়াতে এখনো 'খোদা হাফেয' রয়ে গেছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই 'আল্লাহ হাফেয' অভিবাদটিও সহীহ হাদীসে কোথাও নেই। যেহেতু 'খোদা হাফেয বা আল্লাহ হাফেজ' কোনটিই আল্লাহর রসূল ব্যবহার করেননি সেহেতু উভয় অভিবাদটি-ই বিদ'আত। তাহলে বিদায় নেয়ার কালে আমরা কী বলবো? সহীহ হাদীসে কী আছে? আল্লাহর রসূল ﷺ এবং সাহাবাদের মধ্যে কেউ বিদায় নেয়ার কালে পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিতেন। তাই ফোনে আলাপ শেষেও সালাম বিনিময় করে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নেয়া উচিত।

সম্রাট আকবরের নতুন ধর্ম 'দ্বীনে ইলাহী' বিদ'আত

ভারত উপমাহাদেশের ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে যে, সম্রাট আকবর তার নিজের নামে নিজের মতো করে একটি ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন যা ছিল ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণ। সেই ধর্মের নাম ছিল দ্বীনে ইলাহী এবং সেই ধর্মের কালিমা ছিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আকবর খলিফাতুল্লাহ"। এই সম্রাট আকবরের যুগে ইসলামের অনেক বিকৃতি ঘটে এবং ভারত বর্ষে বিভিন্ন মাযারের প্রসার ঘটে তার সাথে সাথে প্রচুর শিরক ও বিদ'আতের প্রসার ঘটে।

আমাদের সমাজে প্রচলিত আরো কিছু বিদ'আত

এ রকম যত নতুন নতুন পন্থা দ্বীনের মধ্যে যোগ করা হয়েছে এবং সওয়াবের কাজ মনে করা হচ্ছে তার সবই বিদ'আতের অন্তর্গত। কেননা এগুলোর স্বপক্ষে কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশ নেই। দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ, এখানে কোন কিছু বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই। কেউ যদি এহেন কাজ করেন তাহলে সেটা আপাতদৃষ্টিতে যত ভাল বা সওয়াবের কাজই মনে হোক না কেন তা হবে বিদ'আতের আওতাভুক্ত। সহীহ বুখারী ২৫১ পৃ: সহীহ মুসলিম ৪১ পৃ: কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার কোন প্রমাণ নেই, কোন ভুয়া আমল করে, কোন ভুয়া আমলকারীকে আশ্রয় দেয়, কিয়ামতের মাঠে ঐ ব্যক্তির কোন ফরয ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না, কোন নফল ইবাদতও আল্লাহ কবুল করবেন না। অনেক সময় কিছু কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করে না দেখালে তার গুরত্ব থাকে না। তাই মুসলিমদেরকে সচেতন করার লক্ষে আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু বিদ'আতের তালিকা নীচে দেয়া হলো।

রসূল ﷺ -কে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

১. রসূল ﷺ -কে সৃষ্টি না করলে দুনিয়াতে কোন কিছু সৃষ্টি হত না এমন আকীদাহ পোষণ করে সওয়াবের আশা করা ।
২. রসূল ﷺ আল্লাহর নূরের তৈরী এমন ধারণা করা ও সওয়াব মনে করা ।
৩. রসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেননি এমন ধারণা পোষণ করা ।
৪. রসূল ﷺ -এর ব্যক্তি সত্ত্বার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া ।
৫. রসূল ﷺ -এর নামে কুরবানী, হাজ্জ অথবা উমরা করা ।
৬. রসূল ﷺ -এর কবরকে 'রওজা' বলা ।
৭. রসূল ﷺ -এর কবরের নিকটে না গিয়ে দূর হতে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া ।
৮. অন্য কারো মাধ্যমে রসূল ﷺ -এর কবরে সালাম পাঠানো ।
৯. সর্বদা কোন নির্দিষ্ট সময় বা দিনে রসূল ﷺ -এর কবর যিয়ারত করা ।
১০. রসূল ﷺ -এর কবরে গিয়ে উচ্চস্বরে সালাম দেয়া ।
১১. রসূল ﷺ -এর কবরে গিয়ে কান্নাকাটি করাকে সওয়াব মনে করা ।
১২. ওয়াজের সময় নারায়ে রিসালাত বলে উচ্চস্বরে ইয়া রসূলুল্লাহ বলা ।
১৩. আজানের সময় রসূল ﷺ -এর নাম আসলে চোখে দুই বৃদ্ধ আঙুলি দিয়ে দুই চোখের মধ্যে লাগিয়ে চুমু খাওয়া ।
১৪. মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ দেখা মাত্রই দুরূদ ও সালাম পাঠ করা ।
১৫. কোন ইসলামী মাহফিলের দু'আ, দুরূদ ও যিকরের সওয়াব রসূল ﷺ -এর কবরে, সকল ওলিদের রুহে ও মৃতদের কবরে পাঠিয়ে দেয়া ।
১৬. সুন্নতী পোশাকের নামে বিশেষ ধরনের পোশাক পরা ।
১৭. নতুন নতুন দুরূদ এর আবিস্কার করা এবং তা পড়া ।
১৮. আশেকে রসূল বলে দাবী করা । জস্নে জুলুস করা ।
১৯. বরকত বা সওয়াবের উদ্দেশ্যে মদীনার নামে নানা দল তৈরী করা ।
২০. মাহফিলে হুজুর পাবলিককে দুরূদ পড়তে দিয়ে নিজে চা খাওয়া আর মাঝে মধ্যে একটা-দুইটা করে শব্দে টান দেয়া ।
২১. আমার আল্লাহ নাবীজির নাম..... বলে ভিক্ষা করা ।
২২. বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি..... ইত্যাদি বলা শিরক এবং বিদ'আত ।
২৩. রসূল ﷺ আল্লাহর হাবীব বা দোস্ত এই কথা বলা ।

সওয়াবের আশায় বিভিন্ন দিবস পালন করা বিদ'আত

২৪. ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস পালন করা।
২৫. মিলাদের মাহফিল করা।
২৬. শবে বরাতকে ভাগ্য রজনী মনে করে এ রাত্রি পালন করা।
২৭. শবে মিরাজ দিবস পালন করা।
২৮. প্রথম মহররম রাত্রি উৎযাপন করা।
২৯. ওরছ করা, ইছালে সওয়াবের মাহফিল করা।
৩০. রমাদান মাসে "বদর দিবস" পালন করা।
৩১. ঈদের পরে "ঈদ পূণর্মিলনী" অনুষ্ঠান করা।
৩২. জন্ম বার্ষিকী বা Birthday পালন করা।

সলাতকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

৩৩. নাউয়াইতুয়ান ওসাল্লিয়া ..... বলে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করা।
৩৪. জায়নামাযে দাঁড়িয়ে জায়নামাযের দু'আ পাঠ করা।
৩৫. সলাত শেষে সওয়াবের উদ্দেশ্যে পাশের মুসুল্লিদের সাথে মুসাফা করা।
৩৬. মাগরিবের পর দুই রাকাত নফল সলাত নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং এই সলাত বসে পড়া।
৩৭. সলাতুল আওয়াবীন নামে মাগরিবের পরে ৬ রাকাত সলাত আদায় করা।
৩৮. সলাতুল হাজাত নামে সলাত আদায় করা।
৩৯. ইহরামের নিয়তে দুই রাকাত সলাত আদায় করতে হবে মনে করা।
৪০. সলাতের পর মাথায় বা কপালে হাত রাখা।
৪১. পাগড়ী পড়ে সলাত আদায় করলে অনেক সওয়াব হবে মনে করা।
৪২. টুপি মাথায় দেয়াকে সলাতের সুন্নাহ মনে করা।
৪৩. লম্বা দাড়ি ও লম্বা পাঞ্জাবী দেখে ইমাম নির্বাচন করা।
৪৪. উমরী কাযা সলাত আদায় করা।
৪৫. জানাযার সলাতে সানা পাঠ করা।
৪৬. শবে ক্বদরের সলাতের পদ্ধতি ও পরিমান নির্ধারণ করা।
৪৭. শবে বরাত ও শবে মিরাজের সলাত আদায় করা।
৪৮. আখেরী চাহার শোম্বার সলাত আদায় করা।
৪৯. জুম্মার খুৎবার মাঝে কাবলাল জুম্মার ৪ রাকআত সুন্নাত পড়ার সময় দেয়া।
৫০. জুম্মার দিন খুৎবার সময় লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখা এবং লিখে রাখা যে লাল বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় সলাত আদায় করা নিষেধ।

৫১. জুম্মাতুল বিদা পালন করা এবং আখিরি জুম্মা বলা ।
৫২. জুম্মার সলাত শেষ না হলে ঘরে মহিলারা সলাত আদায় না করা ।
৫৩. জুম্মার দিনে খুৎবার সময় চাঁদার বাক্স চালানো ।
৫৪. জুম্মার সলাত ২২ রাকআত নির্ধারণ করা ।
৫৫. জুম্মার অতিরিক্ত খুৎবার প্রচলন ।
৫৬. ফরয সলাতের পর ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত ।
৫৭. জানাযা সলাতের শেষে হাত তুলে দু'আ করা ।
৫৮. জানাযার ও ঈদের সলাতের আযান দেয়া ।
৫৯. সশরীরে সলাত না আদায় করে বা জামাতে সলাত না আদায় করে রূহানী জগতের মাধ্যমে সলাত আদায় করা ।
৬০. গায়েবীভাবে বাংলাদেশ থেকে মক্কার কাবাঘরে এক ওয়াক্তের সময় অন্য ওয়াক্তের সলাত আদায় করতে যাওয়া ।
৬১. পুরুষ এবং মহিলাদের সলাতের পদ্ধতি আলাদা করা ।
৬২. বিবাহিত ও অবিবাহিতদের সলাতে বৈষম্য তৈরী করা ।
৬৩. বিতরের পর নফল সলাত বসে পড়ায় অধিক সওয়াব মনে করা ।
৬৪. মহিলাদের জামাত, জুম্মা ও ঈদের সলাত থেকে দূরে রাখা ।
৬৫. রফ'উল ইয়াদাইন করা, জোরে আমীন বলা, পুরুষরা বুকে হাত বাঁধা এবং তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়ানো বা খাড়া করে রাখা অপছন্দ করা ।
৬৬. জামাত শুরু হয়ে গেলেও বা ইকামত হয়ে গেলেও সুন্নাত পড়া ।
৬৭. সফরে কসর না পড়ে নিয়ম মত সলাত আদায় করা ।
৬৮. সফরে দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রে না আদায় করা ।
৬৯. আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা নাজায়েয মনে করা ।
৭০. ইমাম সলাতে ভুল করলে 'সুবহানআল্লাহ' না বলে 'আল্লাহু আকবার' বলা ।
৭১. সাহু সিজদার জন্য ডান দিকে একবার সলাম ফিরানো এবং পুনরায় তাশাহহুদ পড়া ।
৭২. সালাম ফিরানোর পর ইমামের মুক্তাদিদের দিকে ঘুরে না বসা ।
৭৩. ঠোঁট না নেড়ে মনে মনে সূরা ক্বিরাতের মাধ্যমে সলাত আদায় করা ।
৭৪. বিতর সলাত নির্দিষ্ট করে শুধু তিন রাক'আত পড়া ।
৭৫. আট রাক'আত তারাবির সলাতকে আহলে হাদীসের নিয়ম বলা ।
৭৬. সলাতের কাতারে শিশুদের রাখা মাকরূহ মনে করা ।
৭৭. জায়নামাযে কাবার ছবি, মদীনার সবুজ গম্বুজের ছবি বিদ'আত ।
৭৮. সলাত শেষে জায়নামাযকে চুমু খাওয়া ।

৭৯. সলাত শেষে জায়নামাযের কোনা ভাজ করে রাখা।
৮০. সলাত শেষে অতিরিক্ত একটি সাজদা দেয়া।

মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

৮১. মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা।
৮২. মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুলখানি, চল্লিশা অথবা চেহলাম করা।
৮৩. মৃত ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা।
৮৪. মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জিয়াফত, কুরআনখানি, ইছালে সওয়াব, এগারোবী শরীফ, রূহে সওয়াব বখশে দেয়া।
৮৫. মৃত ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করা।
৮৬. মহিলাদের ঘন ঘন কবর যিয়ারত করা।
৮৭. কবরে ফুল দেয়া।
৮৮. শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ ও তাতে বিভিন্ন উপলক্ষে ফুল দেয়া।
৮৯. কবর যিয়ারতের সময় কুরআন তিলাওয়াত করা।
৯০. কবর উঁচু করা, বাঁধানো এবং কবরকে সুন্দর করা।
৯১. নির্দিষ্টভাবে শুধু ঈদের দিনে অথবা জুমার দিনে কবর যিয়ারত করা।
৯২. ফাতিহা ইয়াজদহম ও দু'আজদহম পালন করা।
৯৩. মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক এবং বিদ'আত।
৯৪. মৃত ব্যক্তিদের জন্য ১মিনিট বা কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা।
৯৫. দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা।
৯৬. মৃত্যুর পর তিন দিন বাড়িতে চুলা না জালানো বা রান্না না করা।
৯৭. বাড়ীতে বা কবরস্থানে এই সময় সদাকা বিলি করা।
৯৮. চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা ন্যাড়া করা, চুল-গোঁফ না কাটা ইত্যাদি।
৯৯. তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা। (কেবল স্ত্রী ব্যতীত, কেননা তিনি ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবেন)
১০০. কবরের উপরে খাদ্য ও পানীয় রেখে দেয়া। যাতে লোকেরা তা নিয়ে যায়।
১০১. মৃতের ঘরে তিন রাত, সাত রাত (বা ৪০ রাত) ব্যাপী আলো জ্বেলে রাখা।
১০২. কাফনের কাপড়ের উপরে দু'আ-কালেমা ইত্যাদি লেখা।
১০৩. মৃতকে নেককার লোকদের গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া।
১০৪. এই ধারণা করা যে, মৃত ব্যক্তি জান্নাতী হলে ওজনে হালকা হয় ও দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায়।

১০৫. জানাযার পিছে পিছে উচ্চৈঃস্বরে যিকর ও তিলাওয়াত করতে করতে চলা।
১০৬. জানাযা শুরুর প্রাক্কালে মৃত কেমন ছিলেন বলে লোকদের কাছ থেকে সমস্বরে সাক্ষ্য নেয়া।
১০৭. জানাযার সলাতের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাথা বর্ণনা করা।
১০৮. জুতা পাক থাকা সত্ত্বেও জানাযার সলাতে জুতা খুলে দাঁড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করা।
১০৯. কবরে মৃতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো।
১১০. কবরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ও পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অতঃপর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরে ঢালা।
১১১. তিন মুঠি মাটি দেয়ার সময় ১ম মুঠিতে 'মিনহা খালাক্বনা-কুম' ২য় মুঠিতে 'ওয়া ফীহা নুঈদুকুম' এবং ৩য় মুঠিতে 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা' বলা অথবা 'আল্লাহুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্বান'...পাঠ করা (ইবনু মাজাহতে বর্ণিত এই হাদীসটি যঈফ)।
১১২. কবরে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শুরুর অংশ পড়া।
১১৩. সূরা ফাতিহা, ক্বদর, কাফিরূন, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দু'আ পড়া।
১১৪. কবরের উপর শামিয়ানা টাঙ্গানো।
১১৫. প্রতি জুমআয় কিংবা সোম ও বৃহস্পতিবারে নির্দিষ্ট করে পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা।
১১৬. এছাড়া আশূরা, শবে মিরাজ, শবেবরাত, রমাদান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে কবর যিয়ারত করা।
১১৭. কবরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো ও সূরা ফাতিহা ১ বার, ইখলাছ ১১ বার কিংবা সূরা ইয়াসীন ১ বার পড়া।
১১৮. কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা-পিনা ও টাকা-পয়সা দেয়া বা এ বিষয়ে অছিয়ত করে যাওয়া।
১১৯. কবরে রুমাল, কাপড় ইত্যাদি বরকত মনে করে নিক্ষেপ করা।
১২০. কবরে চুম্বন করা।
১২১. কবরের গায়ে বরকত মনে করে হাত, পেট ও বুক লাগানো।
১২২. মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বলে ধারণা করা।
১২৩. ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন) পড়ে এর সওয়াবসমূহ মৃতের নামে বখশে দেয়া। যাকে কুরআনখানী বলে।

১২৪. কাফিরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই চারটি 'কুল' সূরার প্রতিটি ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেয়া। যাকে 'কুলখানী' বলে।
১২৫. আযান শুনে নেকী পাবে বা গোর আযাব কম হবে ভেবে মসজিদের পাশে কবর দেয়া।
১২৬. মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে আলো জ্বেলে ও মাইক লাগিয়ে রাত্রি ব্যাপী উচ্চৈঃস্বরে কুরআন খতম করা।
১২৭. সলাত, কিরাআত ও অন্যান্য দৈহিক ইবাদত সমূহের নেকী মৃতদের জন্য হাদিয়া দেয়া। যাকে 'সওয়াব রেসানী' বলা হয়।
১২৮. আমল সমূহের সওয়াব রসূলুল্লাহ সা. এর নামে (বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে) বখশে দেয়া। যাকে 'ইসালে সওয়াব' বলা হয়।
১২৯. নেককার লোকদের কবরে গিয়ে দু'আ করলে তা কবুল হয়, এই ধারণা করা।
১৩০. জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা।
১৩১. ঐ সময় মৃতের কাযা সলাত সমূহের বা উমরী কাযার কাফফারা স্বরূপ টাকা আদায় করা।
১৩২. মৃত্যুর পরপরই ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা-পয়সা বিতরণ করা।
১৩৩. দাফনের পরে কবরস্থানে গবাদি-পশু যবহ করে গরীবদের মধ্যে গোশত বিতরণ করা।
১৩৪. লাশ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তিনবার নামানো।
১৩৫. কবরে মাথার কাছে 'মক্কার মাটি' নামক আরবীতে 'আল্লাহ' লেখা মাটির টুকরা রাখা।
১৩৬. মৃতের কপালে আতর দিয়ে 'আল্লাহ' লেখা।
১৩৭. কবরে মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়া।
১৩৮. মৃতের বিছানা ও খাট ইত্যাদি ৭দিন পর্যন্ত একইভাবে রাখা।
১৩৯. কবরের আযাব মাপের উদ্দেশ্যে কাবার বা কোন পীরের কবরের গিলাফের অংশ কিংবা তাবিজ লিখে দাফন করা।
১৪০. কবরের উপরে একটি বা চার কোণে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল পোতা বা কোন গাছ লাগানো যে, এর প্রভাবে কবর আযাব হালকা হবে।
১৪১. মৃত স্বামীর এবং মৃত স্ত্রীর মুখ না দেখা।
১৪২. স্ত্রী বা স্বামী কর্তৃক মৃত স্বামী বা স্ত্রীকে গোসল করানো নিষেধ করা।
১৪৩. মৃত ব্যক্তির রূহ চল্লিশদিন পর্যন্ত বাড়িতে আসে বিশ্বাস রাখা।
১৪৪. মাযারে ওরশে দান করা।
১৪৫. দশদিনে রুটি হালুয়া বাটা।

১৪৬. জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চৈস্বরে যি্কর করা।
১৪৭. মৃতের সামনে চিৎকার করে কাঁদা।
১৪৮. মৃতের শোকে কাপড় ছেঁড়া, গায়ে চড় মারা।
১৪৯. মৃতের বাড়িতে গেলে ফিরে এসে নিজের গোসল করতে হয়।
১৫০. মৃতের বাড়িতে এক রাত্রি থাকলে তিন রাত্রি থাকতে হয়।
১৫১. মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাওবা পড়া।
১৫২. 'ইন্নালিল্লাহ ..... রাজিউন'-কে শুধু মুত্যু সংবাদের দু'আ মনে করা।

কুরবানীকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

১৫৩. রসূল ﷺ -এর নামে কুরবানী করা।
১৫৪. কুরবানীর সময় মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করে পশু কুরবানী করা।
১৫৫. কুরবানীর পশুর সামনে কে কে কুরবানী করছে তাদের নামের তালিকা পাঠ করা এবং নাম কম পড়লে সেখানে রসূল ﷺ নাম বসিয়ে দেয়া।
১৫৬. কুরবানীর মাংস শুকিয়ে বা ফ্রিজে রেখে তা মহররম মাসে খাওয়া।

দু'আ, দুরূদ, খতম পড়ানো ও কুরআন তিলাওয়াত সংক্রান্ত বিদ'আত

১৫৭. দু'আ করার সময় ১বার সূরা ফাতিহা, ৭বার ইসতিগ্ফার, ৩বার সূরা ইখলাস ও ১১বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে দু'আ শুরু করার নিয়ম করা।
১৫৮. ওয়াজ আল আখিরা কালামিনা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বলে দু'আ শেষ করতে হবে বলে মনে করা।
১৫৯. দু'আ শেষ করে দুই হাত দিয়ে মুখ মুছা জরুরী মনে করা।
১৬০. খাবার খাওয়ার পর দুই হাত তুলে দু'আ করতে হবে বলে মনে করা।
১৬১. বরকতের জন্য সবীনা খতম পড়ানো।
১৬২. বিপদ আপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুরূদে তাজ পড়া, দুরূদে তুনাজ্জিনাহ পড়া, খতমে জালালী পড়া, খতমে ইউনুস পড়া, খতমে তাহলিল পড়া।
১৬৩. মৃত্যু পথযাত্রীর মৃত্যু তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য খতমে খাজেগান পড়া।
১৬৪. সওয়াবের উদ্দেশ্যে দলাইলুল খাইরাত পাঠ করা।
১৬৫. কুরআন চুমু খাওয়া, বুকে ও কপালে স্পর্শ করা। কুরআন ছুয়ে শপথ করা।
১৬৬. কুরআন তিলাওয়াত করে সাদাকাল্লাহুল আজীম বলা জরুরী মনে করা।
১৬৭. মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা করা এবং পুরুষদের সম্মুখে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা।

১৬৮. কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় হঠাৎ বিনা কারণে ঢুকরে কেঁদে ওঠা। অর্থ বুঝে কাঁদলে ঠিক আছে।
১৬৯. কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সর্বদা সভা-সমিতি আরম্ভ করাকে ইসলামের নিয়ম মনে করা। (তবে মাঝে মধ্যে করা যেতে পারে কিন্তু নিয়ম বানানো যাবে না)।
১৭০. সম্মিলিতভাবে দু'আ করার সময় বলা ও মজলিসে যে তোমার প্রিয় বান্দা অথবা বে-গুনাহ মাসুম বাচ্চা আছে তাদের উসিলায় অথবা তুমি যে হাত পছন্দ কর তার উসিলায় আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল কর।
১৭১. সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে দশবার কুরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায় এবং সূরা ইয়াসীন 'গরম সূরা' বলে মনে করা।
১৭২. খানার উপর বরকতের জন্য সূরা কুরাইশ পড়া।
১৭৩. দু'আ করার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা জরুরী মনে করা।
১৭৪. নতুন চাঁদ দেখার পর হাত তুলে দু'আ করা।
১৭৫. মাইকে এক নাগাড়ে কুরআন খতম (সাবিনা খতম) করা।
১৭৬. একাধিক লোক একসঙ্গে বসে শব্দ করে কুরআন খতম করা।
১৭৭. আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁ দেয়া
১৭৮. খতমে ইউনুস।
১৭৯. খতমে আম্বিআ।
১৮০. মাজারে কুরআন পাঠ।
১৮১. কারী ও হুজুর ভাড়া করে এনে খতম পড়ানো।
১৮২. খতমে বুখারী (সওয়াবের উদ্দেশ্যে বুখারী খতম দেয়া)।

সফর সংক্রান্ত প্রচলিত বিদ'আত

১৮৩. পীর ওলিদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তে সফর করা।
১৮৪. সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফ, মসজিদে নব্বী, মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা।
১৮৫. সওয়াবের আশায় মদিনার সাত মসজিদের যিয়ারত করা।
১৮৬. নিজের পরিবার, প্রতিবেশী ও এলাকায় দাওয়াত না দিয়ে দূর-দূরান্তে দ্বীনের দাওয়াতী কাজে বের হওয়া।
১৮৭. কসরের দূরত্ব হিসাবে ৪৮ মাইলকে নির্ধারণ করা।
১৮৮. দ্বীনের দাওয়াতের কাজে সপ্তাহে একদিন, মাসে তিনদিন, বছরে ৪০ দিন, সারা জীবনে ১২০ দিন সময় নির্দিষ্ট করে চিল্লা লাগানো।

পাক-নাপাক সংক্রান্ত বিদ'আত

১৮৯. ওযূ করার সময় গর্দান মসেহ করা।
১৯০. ইস্‌তেন্‌জার পানির সাথে ঢিলা-কুলখ নেয়া ওয়াজীব মনে করা।
১৯১. প্রস্রাবের পর ঢিলা লাগিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরে ৪০ কদম হাঁটা।
১৯২. ওযূতে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় কতগুলো নির্দিষ্ট দু'আ পড়া।
১৯৩. খাবার আগে ওযূ করলে দারিদ্র দূর হয় বলে মনে করা।
১৯৪. নাপাক কাপড় সাত বার না ধুলে পাক হবে না মনে করা। (শুধু কুকুরের লালা লাগলে একবার মাটি দিয়ে পরে সাতবার পানি দিয়ে ধুতে হবে, অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে তিনবার শুধু পানি দ্বারা ধুলেই যথেষ্ট হবে)।

মাযহাব, দল, পীর-মুরীদি ও যিকর সংক্রান্ত বিদ'আত

১৯৫. চারটি মাযহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাযহাব হুবহু মানা ফরয, ওয়াজিব অথবা সুন্নাত মনে করা।
১৯৬. নিজেকে হানাফী বা সালাফী বলে পরিচয় দেয়া।
১৯৭. মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল তৈরী করা।
১৯৮. ইসলামের ইলমকে শরীয়ত, তরিকত, মারিফত ও হাকিকত এই চার ভাগে ভাগ করা।
১৯৯. ইলমে তাসাউফ বলে নতুন জ্ঞানের চর্চা করা।
২০০. পীর-মুরীদি করা বিদ'আত এবং শিরক।।
২০১. পীর-মুরীদির সিলসিলা তরিকায় চলা ও ইবাদত করা।
২০২. রাজতন্ত্রের ন্যায় বংশানুক্রমে পীরের ওয়ারিস হওয়া।
২০৩. পীরের নিকট বাইয়াত করা।
২০৪. পীর বা অন্য কোন ওলির নিকট তওবা করা।
২০৫. পীর-ওলি বা বুজুর্গানের নিকট বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাদের শরীর, হাত-পা টিপে দেয়া।
২০৬. বরকতের উদ্দেশ্যে পীরের আধা-খাওয়া প্লেট থেকে খাবার খাওয়া।
২০৭. স্বপ্নে পাওয়া তরিকায় নফল ইবাদত করা।
২০৮. বরকতের উদ্দেশ্যে পীরকে টাকা, গরু-ছাগল, চাল-ডাল ইত্যাদি দেয়া।
২০৯. মা-বাবার খেদমত না করে পীরের খেদমত করা।
২১০. কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশিবন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি চার তরিকায় ইবাদত করা।
২১১. ছয় লতিফার যিকর করা। শুধু আল্লাহ শব্দের যিকর করা।

২১২. শুধু ইল্লাল্লাহ শব্দের যিকর করা। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দের সাথে তার গুণবাচক কোন নাম যোগ না করে যিকর করা।
২১৩. মাফি কালবি গাইরুল্লাহ, লাইলাহাইল্লাল্লাহ নূর মুহাম্মাদ সাল্লল্লাহ বলে যিকর করা।
২১৪. পীর-ওলিদের হুজুর কেবলা বলা, হুজুরে পাক বলা বা আব্বাহুজুর বলা।
২১৫. সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে যিকর করা।
২১৬. যিকর করতে করতে জবাই করা মুরগির মতো লাফ দেয়া।
২১৭. আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জংগলে চলে যাওয়া।
২১৮. পীরসাহেবের নামে দুরূদ পড়া এবং যিকর করা।
২১৯. সলাত আদায়ের পরে পীরসাহেবের বানানো ওযীফা বা হাদিয়া ফরয বা সুন্নাত মনে করে পড়া।
২২০. পীরের গদ্দীনশীন হওয়া।
২২১. অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড ঘটানো, এটা প্রথমে শিরক এবং পরে বিদ'আত।
২২২. পীরকে কদমবুসি করা, আর কদমবুসি করার সময় মাথা নিচু হলে এটা শিরকে পরিণত হয়ে যাবে।
২২৩. পীরকে গোসল করিয়ে সেই গোসলের পানি খাওয়া। তাছাড়া এই পানিকে অতি পবিত্র এবং শিফা মনে করা বিদ'আত ও শিরক।
২২৪. কোন কোন দরগায় ঢোল-ডুগডুগি বাজিয়ে যিকির করা হয়।
২২৫. কোন কাজ ঠিক মতো না হলে তখন পীরসাহেব বলবেন যে তার দেয়া আমল ঠিক মতো করা হয়নি।
২২৬. হিন্দুদের মতো কারো উসিলা সন্ধান করা বা ধরা।
২২৭. এমনভাবে যিকির করতে হবে যেন দেখে পাগল মনে হয়।
২২৮. নাবীর তরিকা বাদ দিয়ে পীরের তরিকা অনুসরণ করা।

হাজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত বিদ'আত

২২৯. প্রত্যেক তাওয়াফে বা সায়ীতে নির্দিষ্ট দু'আ পড়া।
২৩০. মক্কা-মদীনা, আরাফা, মুযদালিফা, বদর ও ওহুদের মাটি, গাছ, পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করে বরকতস্বরূপ দেশে নিয়ে যাওয়া।
২৩১. হাজ্জ বা ওমরার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মাথা কামানো সুন্নাত মনে করা।
২৩২. হাজ্জ করে নিজের নামের সাথে আলহাজ্জ উপাধি লাগানো।
২৩৩. হাজ্জ, উমরাহ অথবা যিয়ারতে এসে মদীনা শরীফে ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ওয়াজিব মনে করা বিদ'আত।

২৩৪. হাজ্জ করতে হবে ঘরে বসেই আর তা হবে রূহানী জগতের মাধ্যমে, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।

২৩৫. পীরের কলবের ভিতরেই আছে কাবা। তাই পীরের সেবা করলেই হাজ্জ হয়ে যাবে, এসব কথায় বিশ্বাস করা।

২৩৬. ঢাকার টুঙ্গির বিশ্ব ইজতেমাকে দ্বিতীয় হাজ্জ বলা বা মনে করা এবং ইহরামের কাপড় পরে সেখানে উপস্থিত হওয়া।

২৩৭. ঢাকার টুঙ্গির বিশ্ব ইজতেমাকে গরিবের হাজ্জ মনে করা। (বিদ'আত এবং শিরক)

২৩৮. ওহুদ পাহাড়ের মাটি এনে তা শিফা হিসেবে ব্যবহার করা বিদ'আত ও শিরক।

২৩৯. যমযম কূপের পানি এনে তা আবার পীরসাহেব বা হুজুর কেবলা দ্বারা পানির মধ্যে ফুঁ দিয়ে তা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে দেয়া।

২৪০. সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফ, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা।

২৪১. অনেকে তাওয়াফ শেষের দুই রাক'আত সলাত দীর্ঘ করেন। অতঃপর সলাত আদায় শেষে বসে দীর্ঘ মুনাজাতে লিপ্ত হন। এটি একেবারেই সুন্নত বিরোধী কাজ।

২৪২. মদীনার বাকী কবরস্থানকে 'জান্নাতুল বাকী' বলা বিদ'আত।

২৪৩. উমরাহ করতে গিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর তাওয়াফ না করে প্রথমে দুই রাকআত তাহ্ইয়াতুল মসজিদ পড়া।

২৪৪. অনেকে বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে ফেরার সময় কাবা ঘরের দিকে মুখ করে কবর পূজারীদের মত পিছন দিকে হেঁটে বের হন, এটা বিদ'আত।

২৪৫. বিভিন্ন নামে নামে তাওয়াফ করা। যেমন- মায়ের নামে, ছেলের নামে ইত্যাদি বিদ'আত।

২৪৬. মসজিদে নববীর খুঁটিকে 'হানড়বা খুঁটি' 'আয়িশা খুঁটি' ইত্যাদি মনে করে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করা ও এসব এর উসীলায় দু'আ করা বিদ'আত।

২৪৭. আলী মসজিদ, আবুবকর মসজিদ ইত্যাদিতে বরকত মনে করে সলাত আদায় করা বিদ'আত।

২৪৮. ফাতেমা (রা.)র কবুতর মনে করে গম ছিটানো বিদ'আত।

২৪৯. বাকী কবরস্থানে যাদেরই কবর হবে তারা জান্নাতে যাবে, এধারণা বিদ'আত।

২৫০. হাজ্জের সাদা কাপড়গুলো জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে রাখা এবং কবরের আজাব লাঘবের উদ্দেশ্যে কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করা।

বিয়ে সংক্রান্ত বিদ'আত

২৫১. বিয়েতে মহরানা আদায় না করে বাকী রাখা ।
২৫২. গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের একত্রে আনন্দ ফুর্তি করা ।
২৫৩. পরিশোধ না করার উদ্দেশ্যে বড় অংকের মোহরানা ধার্য্য করা ।
২৫৪. বিয়ের আগেই বর কনের অবাধ মেলামেশা অবৈধ ।
২৫৫. পাত্রের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পাত্রী দেখা ।
২৫৬. একত্রে তিন তালাক দেয়া ।
২৫৭. সমাজে প্রচলিত হিল্লা বিয়ে ।
২৫৮. মেয়েদের পিতার ওয়ারিশি না দেয়া ।
২৫৯. বিয়েতে 'উকিল বাবা' এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী । প্রকৃত বাবা একজনই, অন্য কাউকে বাবা বানানো যাবে না । উকিল বাবার নিকট পর্দাও ফরয ।
২৬০. বিবাহ বার্ষিকী বা Marriage anniversary পালন করা ।

সালাম (কদমবুসি) সংক্রান্ত কুসংস্কার

২৬১. কারো পায়ের সাথে বা গায়ের সাথে পা লাগলে কদমবুসি করতে হয় ।
২৬২. আত্মীয়স্বজন ও গুণীদের পা ছুয়ে সালাম করা (কদমবুসি করা) ।
২৬৩. দাঁড়ী-পাল্লা বা মাপার জিনিস পায়ে লাগলে বা হাত থেকে নিচে পড়ে গেলে সালাম করতে হবে, না হলে লক্ষ্মী চলে যাবে ।
২৬৪. কুরআন হাতে নিয়ে বা তিলাওয়াত করে তাকে সালাম করতে হয় ।
২৬৫. বই হাত থেকে মাটিতে পরে গেলে তাকে উঠিয়ে সালাম করতে হয় ।
২৬৬. তসবীহ পড়ার পর তসবীহ ছড়া মুখে চুম খেয়ে সালাম করতে হয় ।
২৬৭. রাস্তা-ঘাটে কোথাও কোন আরবী লিখা কাগজ পেলে তা উঠিয়ে সালাম করা (হতে পারে সেটা আরবী পত্রিকা বা অন্য কিছু) ।

অন্যান্য বিদ'আতসমূহ

২৬৮. কোন কাজ শুরু করার আগে বরকতের উদ্দেশ্যে ফাতিহা পাঠ করা ।
২৬৯. আজানের পর দু'আ করার সময় হাত তুলে দু'আ করতে হবে মনে করা ।
২৭০. রমাদানের সাতাশের রাতকে নির্দিষ্টভাবে লাইলাতুল কদরের রাত মনে করা । এছাড়া এই রাতে ওমরা করা ।
২৭১. সওয়াবের উদ্দেশ্যে বই লিখে প্রিয়জনের নামে উৎসর্গ করা ।
২৭২. খাওয়ার সময় লবণ দিয়ে খাওয়া আরম্ভ করাকে সুন্নাত মনে করা ।

২৭৩. সাইরেন, ঢোল, গজলের সুরে সেহরী বা ইফতারের জন্য ডাকা সওয়াব মনে করা এবং চাঁদা নেয়া।
২৭৪. স্বপ্নের ফয়সালা মেনে নেয়া।
২৭৫. সওয়াবের উদ্দেশ্যে তসবীহ ব্যবহার বা সর্বদা সওয়াবের উদ্দেশ্যে হাতে তসবীহ রাখা। (ক্যলকুলেটর হিসেবে তসবীহ ব্যবহার করা যেতে পারে)
২৭৬. মহররমের নামে তাজিয়া মিছিল বের করা ও মাতম করা ইত্যাদি।
২৭৭. হাত তুলে মুনাজাত করার পর মুনাজাত শেষে দুই হাত মুখের মধ্যে ঘষা।
২৭৮. কবরকে 'মাযার' বলা। যেমন ঃ পাগলা বাবার মাযার, লেংটা বাবার মাযার ইত্যাদি।
২৭৯. আল্লাহর নাম বা কুরআনের কোন আয়াত অংকে convert করা। যেমন, ৭৮৬ বা 786.
২৮০. যাহেরী ইলম ও বাতেনি ইলম, রূহানী ইলম ইত্যাদি প্রকারভেদসমুহ।
২৮১. আশুরার দিন সাতদানার শিরণী পাকান সওয়াবের কাজ মনে করা।
২৮২. ভুল হলে তওবা তওবা বলে দুই গালে থাপ্পর দিয়ে তওবা করা।
২৮৩. যে গ্রাম দিয়ে একজন আলেম হেটে যাবে সেই গ্রামের কবরে ৪০ দিন পর্যন্ত আযাব হবে না।
২৮৪. আল্লাহ হাফেয বা খোদা হাফেয বলা বিদ'আত। কারণ এটি কোন ইসলামী পরিভাষা না।
২৮৫. ঈদ-মুবারক বলা বিদ'আত।
২৮৬. মুছাফা করার পর হাত বুকে লাগানো বিদ'আত।
২৮৭. আজানের সময় মহিলাদের মাথায় কাপড় দেয়া।
২৮৮. কিবলার দিকে পা না দিয়ে ঘুমানো।
২৮৯. বাচ্চাদের খতনা করানোর পর মুসলমানীর অনুষ্ঠান করা।
২৯০. আযানের পর হাত তুলে মুনাজাত (দু'আ) করা।
২৯১. রোযার নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা।
২৯২. ১৩০ ফরয জানা ফরয।
২৯৩. স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত।
২৯৪. খাবার সময় সালাম দিতে নেই।
২৯৫. ঔষধ খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ বললে' রোগ বেড়ে যাবে।

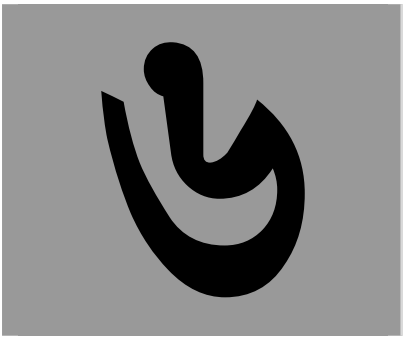

মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়

ইসালে ছাওয়াব কী?

'ইসালে ছাওয়াব' ফারসী শব্দ। আরবীতে হবে 'ঈসালুস সওয়াব'। আভিধানিক অর্থ সওয়াব পৌঁছে দেয়া। অনেকে বলে থাকেন 'সওয়াব রেসানী' বা 'সওয়াব বখশে দেয়া' অর্থাৎ পুণ্য বা সওয়াব প্রেরণ করা। প্রচলিত অর্থে ইসালে ছাওয়াব হল, মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য কোন নেক আমল [সৎকর্ম] বা ইবাদত-বন্দেগী করে তা উক্ত ব্যক্তির জন্য উৎসর্গ করা)।

ইসালে সওয়াবের প্রচলিত ভুল পদ্ধতিসমূহ

যে প্রিয়জন আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন, আমরা সকলেই তার জন্য এমন কিছু করতে চাই যা হবে তার জন্য কল্যাণকর ও শুভ পরিণতির বাহক। তাদের আত্মার কাছে উপহার হিসেবে পৌঁছে যাবে সে কাজের প্রতিফল; ফলে আল্লাহ তাদের ইহকালিন পাপ মোচন করে সুখে রাখবেন তাদেরকে, ভরিয়ে দিবেন নানা সমৃদ্ধিতে। এ উদ্দেশ্যে কিছু সৎকর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিবেদন করতে আমাদের আগ্রহের কমতি নেই। এ মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে আমাদের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের লোকেরা নিজেদের বিশ্বাস ও প্রথা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন যা ইসলাম সম্মত নয়। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

১) কুলখানি ঃ কোন ব্যক্তির ইন্তিকালের তিন দিনের মাথায় তার মাগফিরাত ও আত্মার শান্তি কামনা করে মীলাদ বা কুরআন খতম অথবা অন্য কিছু পাঠের মাধ্যমে দু'আ-মুনাজাতের অনুষ্ঠান করা।

২) ফাতিহা পাঠ ঃ মৃত ব্যক্তির কবরে উপস্থিত হয়ে তার জন্য সূরা ফাতিহা বা সংক্ষিপ্ত দু'আ-প্রার্থনা করা। ফাতিহার আরেকটি প্রচলিত রূপ আছে। তা হল কোন ওলী বা বুযুর্গের সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে খানা পাকানোর পর তাতে দু'আ-দুরূদ বা সূরা-কালাম পড়ে ফুঁক দেয়া ও তারপর তা বিতরণ করা।

৩) চেহলাম বা চল্লিশা ঃ চেহলাম ফারসি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ চল্লিশতম। অনেকে চল্লিশা বলেন। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মীলাদ, কুরআন খতম, দু'আ-মুনাজাত ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা থাকে।

৪) মাটিয়াল ঃ মাটিয়াল শব্দের প্রচলন গ্রামাঞ্চলে বহুল প্রচলিত। মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন বা মাটি দিতে যারা অংশগ্রহণ করে, তাদের উদ্দেশ্যে ভোজ আয়োজন করাকে বলা হয় মাটিয়াল খাওয়ানো।

৫) মীলাদ ঃ প্রচলিত অর্থে মীলাদ বলতে এমন অনুষ্ঠানকে বুঝায়, যেখানে কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি বানানো সব দরুদ ও সালাম পেশ, তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু কবিতার পংক্তি আবৃত্তি, দু'আ-মুনাজাত ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

৬) খতমে তাহলীল ঃ খতম শব্দের অর্থ শেষ। তাহলীল শব্দের অর্থ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অর্থ হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শেষ করা। এক লাখ বা সোয়া লাখ বার এটা পাঠ করা। এ যেমন এককভাবে আদায় করা হয়, তেমনি কিছু সংখ্যক লোক একত্র হয়ে পাথর বা কোন দানা গুনে গুনে এ খতম আদায় করে থাকে। অনেকে আবার নিজেই মৃত্যুর পূর্বে নিজের খতমে তাহলীল -- এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে যান।

৭) কুরআন খতম বা কুরআনখানি ঃ মৃত ব্যক্তির প্রতি সওয়াব পাঠানোর জন্য কুরআন খতম বা কুরআন খতমের অনুষ্ঠান করা হয়। কুরআন খতমের যত অনুষ্ঠান হয়, তার পঁচানব্বই ভাগই মৃত ব্যক্তির জন্য উৎসর্গিত। বাকিগুলো ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, বিদেশ যাত্রায় সাফল্য, চাকুরি লাভ, মামলা-মকদ্দমায় খালাস, দোকান, বাড়িঘর, বাস-ট্রাকের উদ্বোধন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে করা হয়।

৮) কাঙ্গালীভোজ ঃ মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনায় দরিদ্র অসহায় লোকদের জন্য বিশেষ দিন ধার্য্য করে অনুষ্ঠান করে খাবারের আয়োজন করা। গরীবকে খাবার খাওয়ানো খুবই ভাল ও সওয়াবের কাজ এবং এটা একটা সদকাহ কিন্তু এটা শুধু একটা নির্দিষ্ট দিনে কেন? বা শুধু কেউ মারা গেলে কেন? এই

সদাকাতো হওয়া উচিত সারা বছর ধরে কারণ এটা গরীবের হক, যা আদায়ের কোন নির্দিষ্ট দিন-কাল-সময় নেই ।

৯) ওরস ঃ ওরস বা উরস আরবী শব্দ । মূল অর্থ, বিবাহের জন্য কনেকে বরের গৃহে নিয়ে যাওয়া । বিবাহ ও বিবাহ উপলক্ষ্যে খাওয়া-দাওয়াকে উরস বলা যায় । বাংলাদেশে মাযার বা কবর-কেন্দ্রিক মেলাকে ওরস বলা হয় । যারা ওরস করে তারা তা কবরবাসীদের জন্য সওয়াবের উদ্দেশ্যে করে ।

১০) ইসালে সওয়াব মাহফিল ঃ ইসালে সওয়াব-মাহফিলের আয়োজনকারীদের উদ্দেশ্য হল, আম্বিয়া, আউলিয়া, পীর-দরবেশসহ সকল মৃত মুসলিমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা, তাদের জন্য দু'আ করা ।

১১) উরসে-কুল ঃ উরসে-কুল শব্দের অর্থ সকলের জন্য ওরস । দেশের কোন কোন সূফী সম্প্রদায় এ পদ্ধতিতে মৃতদের জন্য ইসালে সওয়াব পালন করে থাকেন । কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে গোলাকার হয়ে বসে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাছ ও তাদের দলীয় বিশেষ একটি দুরূদ পাঠ করে মুনাজাতের মাধ্যমে সওয়াব বখশে দেন সকল নাবী, ওলি ও মুসলিমদের জন্য ।

১২) কবরে ও কফিনে ফুল দেয়া বা পুষ্পস্তবক অর্পণ ঃ অনেকে নিজের প্রিয় ব্যক্তিদের কবরে ও কফিনে ফুল দেন । যদি এটা মৃত ব্যক্তির আত্মার কাছে সওয়াব পাঠানোর জন্য করা হয় অথবা যদি সওয়াব পাঠানোর নিয়্যত না করে শুধু প্রথা-পালনের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে এক্ষেত্রে প্রথমটি বিদ'আত আর দ্বিতীয়টি কুফুরি ।

১৩) এক মিনিট নীরবতা পালন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করতে দেখা যায় অভিজাত ও উচ্চ মহলে । বড় ধরনের কোন অনুষ্ঠানে, যেখানে সমাজের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন । পশ্চিমারা মৃতদের সম্মানে নীরবতা পালনের এমন সংস্কৃতি চর্চা করে থাকে ।

১৪) মৃত ব্যক্তির জায়নামায ও পোশাক দান করা ঃ মৃত ব্যক্তির কল্যাণে, তার জন্য সওয়াব পাঠানোর উদ্দেশ্যে তার রেখে যাওয়া পোশাক, জায়নামায -- ইত্যাদি ব্যবহৃত জিনিস-পত্র কোন ইমাম বা পীরসাহেব, অথবা আলেমকে দান করা হয় । নিয়্যত করা হয় যে, যাকে দান করা হয়েছে সে যতদিন ব্যবহার করবে ততদিন মৃত ব্যক্তি এর সওয়াব পাবে ।

১৫) লাশ ও কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত ঃ অনেকে মৃত ব্যক্তির কবর যিয়ারত করতে গিয়ে কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেন। লাশের কাছেও কুরআন পাঠ করতে দেখা যায়। কেউ সূরা ইয়াসীন পড়েন, কেউ পড়েন সূরা তাকাসুর, চার কুল অথবা সূরা ফাতিহা।

১৬) জানাযা সলাত শেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ-মুনাজাত ঃ আমাদের দেশে ইমাম সাহেব জানাযা সলাত শেষে সবাইকে নিয়ে আবার মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ-মুনাজাত করেন। অথচ পুরো জানাযার সলাতটাই হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ।

১৭) মৃত্যু-দিবস পালন ঃ এ প্রথাটি সম্পূর্ণ বিধর্মীদের। ইসলাম বা মুসলিমদের আচার নয়। যদি এটাকে ধর্মীয় আচার মনে করে করা হয় তবে তা বিদ'আত হিসেবে একটা গুনাহের কাজ বলে পরিগণিত হবে।

উপরে বর্ণিত ইসালে সওয়াবের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো ইসলাম, কুরআন ও হাদীস সম্মত নয়

মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব পাঠানোর উদ্দেশ্যে প্রচলিত যে পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কি ইসলামী শরীয়ত অনুমোদিত? না-কি মানুষের আবিষ্কার করা কুসংস্কার বা বিদ'আত? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর উত্তর দেয়ার পূর্বে কয়েকটি সর্বসম্মত মূলনীতি উল্লেখ করা হলো ঃ

১) আমরা মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছোনোর জন্য যা কিছু করব তা তার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোন মানুষ, কোন দল বা শক্তি বা কোন বিশেষ মাধ্যম মৃত ব্যক্তির কাছে সওয়াব পৌঁছে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তার কোন কল্যাণ করতে পারে না। তাই যিনি সওয়াব পৌঁছে দিবেন তার কাছে সওয়াবের জন্য করা সেই কাজটি গ্রহণযোগ্য হতে হবে। যদি আল্লাহর কাছে কাজটি কবুল বা গ্রহণযোগ্য না হয় তবে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছার প্রশ্নই আসে না।

২) আল্লাহর কাছে যে কোন আমল বা নেক কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দুটি শর্তের উপস্থিতি জরুরি। যদি এ দুটো শর্তের কোন একটি অনুপস্থিত থাকে, তবে আমলটি আল্লাহর কাছে অগ্রাহ্য হবে। আল্লাহর কাছে কবুল না হলে তা মৃতের কোন উপকারে আসবে না। শর্ত দুটি হলো ঃ

- ইখলাস (অর্থাৎ কৃত সৎকর্মটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যত ব্যতীত অন্য কোন নিয়তে করা হলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না)
- রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশিত পদ্ধতির অনুসরণ। অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্ত রসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য। কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হল ঠিকই, কিন্তু আল্লাহর রসূল কর্তৃক কাজটি অনুমোদিত হয়নি, তাহলে এ কাজও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। রসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন ঃ যে কেউ এমন আমল করবে যা করতে আমরা (ধর্মীয়ভাবে) নির্দেশ দেইনি তা প্রত্যাখ্যাত। (সহীহ মুসলিম)।

যেমন কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করল কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়্যতে নয়, অন্য নিয়্যতে। তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে সলাত রসূলুল্লাহ ﷺ এর পদ্ধতিতে আদায় করা হয়। এমনিভাবে, কেউ সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একশ ভাগ নিয়্যতে সলাত আদায় করল, তবে তা কবুল হবে না। কারণ সে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতিতে সলাত আদায় করেননি।

মৃত ব্যক্তির জন্য যা কিছু করা হবে তা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়্যতে করতে হবে এবং যা কিছু করা হবে তা রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। যদি অনুমোদিত না হয় তবে তা হবে প্রত্যাখ্যাত। তাতে কোন সওয়াবই হবে না, মৃতের কোন উপকারও হবে না।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে মৃত ব্যক্তির কল্যাণে কোন কিছু করার দিক-নির্দেশনা আছে কি-না?

অবশ্যই আছে। আল্লাহর রসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁর অনেক প্রিয়জন, আপনজন ইন্তিকাল করেছেন। ইন্তিকাল করেছেন প্রিয়তমা সহধর্মিণী খাদিজা রা., মেয়ে রুকাইয়া রা., ছেলে কাসেম, তাইয়েব, ইবরাহীম। প্রিয়তম চাচা হামযা (রা.) তাঁর প্রিয় আরো বহু সহচর। কিন্তু তিনি কখনো তাদের কারো জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান করেননি। রসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকাল হল। তাঁর সাহাবায়ে কেরাম শোকে দিশেহারা হলেন। ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। কিন্তু তারা কি কেউ রসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইসালে সওয়াবের জন্য কোন অনুষ্ঠান করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগে খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর

(রা.) ইন্তিকাল করলেন। উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.) শহীদ হলেন। তারা কি তাদের জন্য এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান করেছেন? করেননি কখনো। তাই কোন রকম দ্বিধা ছাড়া বলা যায় যে, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, তাদের পরবর্তীকালের তাবেইন ও ইমামগণ কেউই কারো জন্যে কুলখানী, ফাতিহা পাঠ, চেহলাম, মাটিয়ালভোজ, মীলাদ, খতমে তাহলীল, কুরআন খতম, কাঙ্গালী ভোজ, ওরস, ইসালে সওয়াব মাহফিল, উরসে কুল, কবরের কাছে কুরআন পাঠ, মৃত্যু-দিবস পালন, কবরে ও কফিনে ফুল দেয়া, এক মিনিট নীরবতা পালন, জানাযার সলাতের পর মুনাজাত-- কোনটিই করেননি।

রসূলুল্লাহ ﷺ বহুবার তার প্রিয়জনদের কবর যিয়ারত করেছেন। কবর যিয়ারত করতে গিয়ে তিনি কী বলেছেন, কী কী দু'আ পড়েছেন তা হাদীসে সংরক্ষিত আছে। তিনি তো কখনো কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেননি। কাউকে করতেও নির্দেশ দেননি। সাহাবায়ে কেরাম তারা কারো কবর যিয়ারত করতে গিয়ে কবরের কাছে কুরআন পাঠ করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। এগুলো বিদ'আত। অনেকে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ-মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে তার ঘরে একত্রিত হয়ে দু'আ-অনুষ্ঠান করে থাকেন। মনে করেন এতে অসুবিধা নেই। আমরা তো মীলাদ পড়ছি না। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এর বৈধতা কতটুকু তা কি ভেবে দেখেছি?

সাহাবী জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, মৃত ব্যক্তির দাফন করার পর তার পরিবারের কাছে জমায়েত হওয়া ও খানা-পিনার ব্যবস্থা করাকে আমরা জাহিলী যুগের নিয়াহা হিসেবে গণ্য করতাম। (আহমদ)

নিয়াহা হল ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে আনুষ্ঠানিক কান্নাকাটির আয়োজন করা। জাহেলী যুগে এ প্রথা চালু ছিল। ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে। সাহাবী জরীর (রা.)-এর প্রতিনিধি দল যখন উমর (রা.)-এর কাছে আসল, তখন উমর (রা.) তাদের প্রশ্ন করলেন ঃ

তোমরা কি তোমাদের মৃতদের জন্য নিয়াহা কর? তারা বলল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি মৃত ব্যক্তির কাছে একত্র হয়ে থাকো এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকো? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ এটাইতো নিয়াহা। অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য এমন কোন অনুষ্ঠান করা ঠিক নয় যা হাদীসে রসূল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলো সবই বিদ'আতের মধ্যে গণ্য হবে।

নাবী কারীম ﷺ জুমার খুতবায় বলতেন ঃ আর শুনে রেখ! সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব ও সর্বোত্তম পথ-নির্দেশ হল মুহাম্মাদ ﷺ -এর পথ-নির্দেশ। ধর্মে নতুন বিষয় প্রচলন করা সর্ব নিকৃষ্ট বিষয়। এবং সব ধরনের বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা। (সহীহ মুসলিম)

যারা এ সকল কাজ করেন তাদেরকে যখন বলা হয় এগুলো আল্লাহর রসূল করেননি, তাঁর সাহাবাগণের কেউ করেননি বা করার জন্য বলেননি, তাই এগুলো বিদ'আত। তারা উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, বিদ'আত ঠিকই, কিন্তু এগুলো বিদ'আতে হাসানা বা উত্তম বিদ'আত। তাদের এই উক্তিটিও আসলে একটি বিদ'আত। কেননা, রসূলুল্লাহ ﷺ বা তার সাহাবায়ে কেরামের কেউ বলেননি যে, বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদ'আত বলে কিছু আছে। বরং আল্লাহর রসূল ﷺ স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব পাঠানোর উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় সবগুলো ধর্মীয় আচার মনে করে করা হয়। সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যেই করা হয়। অতএব, বর্ণিত সকল অনুষ্ঠান বিদ'আত। বিদ'আতের ক্ষতি অনেক এবং সুদূর প্রসারী। বিদ'আত ধর্মকে বিকৃত করে। ইসলামে বিদ'আতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিদ'আতী আচার-অনুষ্ঠান করার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সওয়াবের বিষয়টির প্রতি যদি লক্ষ্য করি ঃ তাহলে দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে বিদ'আতী নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত ও অনুমোদিত পদ্ধতিকে পরিহার করা হচ্ছে। এ সকল অনুষ্ঠানাদি করতে গিয়ে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ খরচ করা হয়, তার সকল ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে যথাযথ অনুমতি না নিয়ে, অন্যায়ভাবে। এতে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করে তা দিয়ে সওয়াবের কাজ করলে তা কবুল হবে না।

ইসালে সওয়াবের জন্য কী করা যেতে পারে?

কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকার কারণে অনেকেই সঠিক দিক-নির্দেশনা পায় না, তাই হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত। ফলে, সে কল্যাণকর মনে করে এমন কিছু করে, যা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। এমন কাজ করে, যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আজকাল হাদীসে রসূলে

এ সম্পর্কে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা না মেনে প্রচলিত কুসংস্কার তথা বিদ'আতের আশ্রয় নেয়া হয়। তাই দেখা যাক এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কী নির্দেশনা রয়েছে।

আমাদের বিদায়ী আপনজনদের জন্য এমন কিছু করা উচিত যা সত্যিকারার্থে তাদের কল্যাণে আসে। প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার, বিদ'আত, মনগড়া অনুষ্ঠানাদি পরিহার করে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনায় কাজ করা কাম্য। কেননা, যে সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে অনুমোদন নেই তা বিদ'আত হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত। তা যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন, তা মৃত ব্যক্তির কোন উপকারে আসে না। বরং, আয়োজনকারীরা গুনাহগার হয়ে থাকেন।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'মু'মিনের ইন্তিকালের পর তার যে সকল সৎকর্ম তার কাছে পৌঁছে তা হল, সে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যাওয়া যার প্রচার অব্যাহত থাকে, সৎ সন্তান রেখে যাওয়া, কুরআন শরীফ দান করে যাওয়া, মসজিদ নির্মাণ করে যাওয়া, মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করে যাওয়া, কোন খাল খনন করে প্রবাহমান করে দেয়া অথবা এমন কোন দান করে যাওয়া যা দ্বারা মানুষেরা তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর উপকার পেতে থাকে।' (ইবনে মাজাহ)

এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল –

১) জীবদ্দশায় এমন কিছু ভাল কাজ করা যেতে পারে যার সুফল মৃত্যুর পর পাওয়া যায়।
২) মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কল্যাণকর কাজের কিছু নমুনা দেয়া হয়েছে বর্ণিত হাদীসে। যাকে সদাকায়ে জারিয়া বলা হয়।
৩) সৎ সন্তান এমন এক সম্পদ মৃত্যুর পরও পিতা-মাতা তার দ্বারা উপকার পেয়ে থাকেন।
৪) হাদীসে বলা হয়েছে সৎ সন্তানের দু'আ মৃত্যুর পর পিতা-মাতার কাজে আসে। তাই অসৎ সন্তানের দু'আ কাজে আসবে এমনটি এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সন্তানকে সৎ বানাতে প্রচেষ্টা চালানো এমন একটি মহৎ কাজ যার সুফল মৃত্যুর পরও পিতা-মাতা ভোগ করতে থাকে।

৫) এমন জ্ঞান যা মানুষের কল্যাণে আসে তা শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষার কাজে সহযোগিতা করা একটি সদাকায়ে জারিয়া। দীনি ইলম তো অবশ্যই কল্যাণকর।

৬) এ হাদীসে মু'মিন ব্যক্তিকে এমন কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে যা মৃত্যুর পর কাজে আসবে। তাই নিজের ইসালে সওয়াবের জন্য প্রত্যেকেই নিজ জীবনে কিছু কাজ করে যেতে পারাটা একটা বিশাল অর্জন।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য করণীয় আমলসমূহ

রসূলুল্লাহ ﷺ সেসব সন্তানদেরকে হতভাগ্য বলেছেন যারা তাদের মাতা বা পিতাকে অথবা উভয়কে জীবিত অবস্থায় পেয়েও তাদের সেবাযত্নের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হতে পারেনি। অর্থাৎ পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত নিশ্চিত করা যায়। এ ফায়দা অর্জন করা যায় যখন তাঁরা জীবিত থাকেন। তাদের মৃত্যুর পর যে সকল আমল করা যেতে পারে। যেমন ঃ

১. বেশী বেশী দু'আ করা

মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তান মা-বাবার জন্য বেশী বেশী দু'আ করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কী দু'আ করবো তাও শিক্ষা দিয়েছেন।

"হে আমার রব, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন"। (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ২৪)। "হে আমাদের রব, কিয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিনকে ক্ষমা করে দিন"। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪১)

"হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না"। (সূরা নূহ ঃ ২৮)

মা-বাবা এমন সন্তান রেখে যাবেন যারা তাদের জন্য দু'আ করবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি আমল বন্ধ হয় না- ১. সাদাকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ৩. এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দু'আ করে"। (সহীহ মুসলিম ঃ ৪৩১০)

২. দান-সাদাকাহ করা, বিশেষ করে সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রদান করা

মা-বাবা বেঁচে থাকতে দান-সাদাকাহ করে যেতে পারেন নি বা বেঁচে থাকলে আরো দান-সাদাকাহ করতেন, সেজন্য তাদের পক্ষ থেকে সন্তান দান-সাদাকাহ করতে পারে। আয়িশা (রা.) বলেন ঃ "জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই কোন অসিয়ত করতে পারেন নি। আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে দান-সাদাকা করতেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদাকা করলে তিনি কি এর সওয়াব পাবেন? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই পাবেন।" (সহীহ মুসলিম ঃ ২৩৭৩)। তবে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সাদাকায়ে জারিয়া বা প্রবাহমান ও চলমান সাদাকা প্রদান করা।

৩. মা-বাবার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন

মা-বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি তাদের কোন মানতের সিয়াম কাযা থাকে, সন্তান তাদের পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করলে তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে তার উপর সিয়াম ওয়াজিব ছিল। তবে তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিসগণ সিয়াম রাখবে" (সহীহ বুখারী ঃ ১৯৫২)। অধিকাংশ আলেমগণ এ হাদীসটি শুধুমাত্র ওয়াজিব সিয়াম বা মানতের সিয়ামের বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাদের পক্ষ থেকে নফল সিয়াম রাখার পক্ষে দলীল নেই।

৪. হাজ্জ বা উমরাহ করা

মা-বাবার পক্ষ থেকে হাজ্জ বা উমরাহ করলে তা আদায় হবে এবং তারা উপকৃত হবেন। (সহীহ বুখারী ঃ ১৮৫২)।

৫. মা-বাবার ওসিয়ত পূর্ণ করা

মা-বাবা শরীয়াহসম্মত কোন ওসিয়ত করে গেলে তা পূর্ণ করা সন্তানদের উপর দায়িত্ব। (সহীহ ইবন হিববান ঃ ১৮৯)

৬. মা-বাবার আত্নীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা

সন্তান তার মা-বাবার আত্নীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার

পিতার সাথে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ভালবাসে, সে যেন পিতার মৃত্যুর পর তার ভাইদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখে' । (সহীহ ইবন হিববান ঃ ৪৩২)

৭. মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করা

মা-বাবার বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, সম্মান করা, তাদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদেরকে হাদিয়া দেয়া । (সহীহ মুসলিম ঃ ৬৬৭৭)

৮. ঋণ পরিশোধ করা

মা-বাবার কোন ঋণ থাকলে তা দ্রুত পরিশোধ করা সন্তানদের উপর বিশেষভাবে কর্তব্য । রসূলুল্লাহ ﷺ ঋণের পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যায়; যতক্ষণ না তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়" । (সুনান ইবন মাজাহ ঃ ২৪১৩) ।

৯. কাফফারা আদায় করা

মা-বাবার কোন শপথের কাফফারা, ভুলকৃত হত্যাসহ কোন কাফফারা বাকী থাকলে সন্তান তা পূরণ করবে । রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কসম খেয়ে শপথ করার পর তার থেকে উত্তম কিছু করলেও তার কাফফারা আদায় করবে" । (সহীহ মুসলিম ঃ ৪৩৬০)

এ বিধান জীবিত ও মৃত সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য । দুনিয়ার বুকে কেউ অন্যায় করলে তার কাফফারা দিতে হবে । অনুরূপভাবে কেউ অন্যায় করে মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফারা প্রদান করবেন ।

১০. ক্ষমা প্রার্থনা করা

মা-বাবার জন্য আল্লাহর নিকট বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করা গুরুত্বপূর্ণ আমল । সন্তান মা-বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন । মা-বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়ে উসমান (রা.) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, উসমান (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালেন এবং বললেন "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য ঈমানের উপর অবিচলতা ও দৃঢ়তা কামনা কর, কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে" [মুসনাদুল বাজ্জার ঃ ৪৪৫] ।

১১. মান্নত পূরণ করা

মা-বাবা কোন মান্নত করে গেলে সন্তান তার পক্ষ থেকে পূরণ করবে। ইবন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, কোন মহিলা রোজা রাখার মান্নত করেছিল, কিন্তু সে তা পূরণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল। এরপর তার ভাই এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন কর। (সহীহ ইবন হিববান ঃ ২৮০)

১২. কবর যিয়ারত করা

সন্তান তার মা-বাবার কবর যিয়ারত করবে। এর মাধ্যমে সন্তান এবং মা-বাবা উভয়ই উপকৃত হবে।

এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, অতঃপর মুহাম্মাদের মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা কবর যিয়ারাত কর, কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (সুনান তিরমীযি ঃ ১০৫৪)

১৩. মা-বাবার ভাল কাজসমূহ জারী রাখা

মা-বাবা যেসব ভাল কাজ অর্থাৎ মসজিদ তৈরী করা, মাদরাসা তৈরী করা, দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীসহ যে কাজগুলো করে গিয়েছেন সন্তান হিসাবে তা যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা করা। কেননা এসব ভাল কাজের সওয়াব তাদের আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে।

হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তির ইসলামের ভাল কাজ শুরু করল, সে এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব পাবে। অথচ তাদের সওয়াব থেকে কোন কমতি হবে না''। (সহীহ মুসলিম ঃ ২৩৯৮)

১৪. ওয়াদা করে গেলে তা বাস্তবায়ন করা

মা-বাবা কারো সাথে কোন ভাল কাজের ওয়াদা করে গেলে বা এমন ওয়াদা যা তারা বেঁচে থাকলে করে যেতেন, সন্তান যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। কিন্তু কোন ইসলাম বিরোধী বা বিদ'আতী কাজ করার জন্য ওয়াদা করে করে গেলে তা অবশ্যই পালন করা যাবে না।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, "আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪)

১৫. কোন গুনাহের কাজ করে গেলে তা বন্ধ করা

মা-বাবা বেঁচে থাকতে কোন গুনাহের কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা বন্ধ করবে বা শরীয়াহ সম্মতভাবে সংশোধন করে দিবে।

কেননা আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এবং যে মানুষকে গুনাহের দিকে আহবান করবে, এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ গুনাহ তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে কোন কমতি হবে না"। (সহীহ মুসলিম ঃ ৬৯৮০)

১৬. মা-বাবার পক্ষ থেকে মাফ চাওয়া

মা-বাবা বেঁচে থাকতে কারো সাথে খারাপ আচরণ করে থাকলে বা কারো উপর যুলুম করে থাকলে বা কাওকে কষ্ট দিয়ে থাকলে মা-বাবার পক্ষ থেকে তার কাছ থেকে মাফ মাফ চেয়ে নিবে অথবা ক্ষতি পূরণ দিয়ে দিবে। সুতরাং এ ধরনের নিঃস্ব ব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য তার হকদারদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া সন্তানের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

সুশীল সমাজে লাশ দাফন নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি

অনেক সময় আমরা পত্রিকায় দেখি আমাদের সুশীল সমাজে মৃত্যুর পর লাশ দাফন নিয়ে মাঝে মধ্যে নানারকম বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কোন বিশিষ্ট কেউ মারা গেলে তার লাশ শহীদ মিনারে রাখা হলো কিনা, তাকে জাতীয় কবি নজরুলের পাশে কবর দেয়া হলো কিনা, তাকে রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় দাফন করা হলো কিনা, বনানীতে কবর দেয়া হলো নাকি আজিমপুরে কবর দেয়া হলো ইত্যাদি নিয়ে পরিবারের মধ্যে, শুভাকাক্ষিদের মধ্যে নানারকম ক্ষোভ দেখা দেয়। তারপর আবার মৃতের জানাযায় কে অংশগ্রহণ করলো আর কে করলো না, জানাযা বায়তুল মুকাররমে হলো নাকি স্টেডিয়ামে হলো এগুলো নিয়েও মনমালিন্য দেখা দেয়। এই বিষয়ে পত্রিকায় কয়েকদিন ধরে নানারকম আলোচনা-সামালোচনা লেখা-লেখি হয়। আসলে এ সবই হয় সঠিক ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে। মৃত্যুর পর ঐ বেচারার কী অবস্থা হবে! কবরের আযাব কিভাবে সামলাবে! আখিরাতের ময়দানে কী অবস্থা হবে! এগুলো নিয়ে কেউ চিন্তা করেন না। বেঁচে থাকা অবস্থায় তার আমল কী ছিল! ইসলামের পক্ষে কিছু করেছেন কিনা! নাকি শুধু ইসলামের বিরোধীতাই করে গেছেন এগুলো নিয়ে কেউ চিন্তা করেন না। কারণ দাফন-কাফন-জানাযা-কবর-দু'আ এগুলো তো ইসলামের বিষয়।

মৃতদের নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ কোন ইসলামী মাহফিলের দু'আ, দুরূদ ও যিকরের সওয়াব রসূল ﷺ এর কবর মদিনায়, সকল ওলিদের রুহে ও সকল মৃতদের কবরের দিকে পাঠিয়ে দেয়া বিদ'আত কিনা?

উত্তর ঃ এখানে মূল সমস্যাটা হলো কোন দু'আর মাহফিল থেকে তার সওয়াব বা দু'আ মৃতদের জন্য কবরে পাঠিয়ে দেয়া বা বকসে দেয়া। এই ধরনের কাজ মূলতঃ ভারত উপমহাদেশের মুসলিমরা করে থাকেন যা ইসলাম সম্মত নয়। আবার মৃতদের জন্য এই ধরনের দু'আর মাহফিলের সিস্টেমও ইসলামে নেই, যা বিদ'আত। আর রসূল ﷺ এর নামে দু'আ করার সিস্টেমও আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন যা আমরা সলাতে পড়ে থাকি (দুরূদে ইব্রাহীম)। রসূল ﷺ এর নামে সালাম পেশ করলে তা ফিরিশতাদের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়।

মৃতদের জন্য দু'আ আমরা অবশ্যই করবো কিন্তু তা হতে হবে সহীহ হাদীস ভিত্তিক, অর্থাৎ পদ্ধতিটা হতে হবে রসূল ﷺ -এর দেখিয়ে দেয়া নিয়মে। নিজের মনগড়া কোন ইবাদতের পদ্ধতি আবিস্কার করা যাবে না। ইবাদতের যতোরকম পদ্ধতি আছে তা রসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দসায় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই এক অনুষ্ঠানে দু'আ করে তার ফযীলত বা সওয়াব মৃতদের জন্য পাঠানোর প্রয়োজন নেই কারণ এর কোন সহীহ হাদীস ভিত্তিক দলিল নেই যে রসূল ﷺ এভাবে কোনদিন কোন দু'আর মাহফিল থেকে দু'আ পাঠিয়েছেন।

আমরা যখন কারো জন্য কোন দু'আ করি তখন তার নিয়্যত তো অন্তরের মধ্যেই থাকে এবং মহান আল্লাহ তা জানেন এবং তা প্রাপকের নিকট পাঠানোর দায়িত্বও আল্লাহরই। যেমন আমরা বলতে পারি "হে আল্লাহ তুমি আমার বাবা-মাকে জান্নাত দাও, কবরের আযাব থেকে মুক্তি দাও" আর বাবা-মার জন্য শ্রেষ্ঠ দু'আ তো আল্লাহ নিজেই আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

"রব্বিরহামহুমা কামা রব্বাইয়ানী সগিরা"। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৪)

অর্থ ঃ 'হে আমার রব। আমার পিতা-মাতার উপর তেমনি রহম কর যেমন তারা শিশু বেলায় আমাকে লালন পালন করেছেন।' [রসূল ﷺ প্রত্যেক সলাতের শেষে সালাম ফিরানোর আগে এই দু'আ করতে বলেছেন]

এখানে ভুল বুঝার অবকাশ নেই। পিতা-মাতার জন্য আমদের অবশ্যই দু'আ করতে হবে। আমাদের দেশে যে সিস্টেমে দু'আ করা হয় বা সওয়াব আত্মার মাগফিরাতের জন্য পাঠনো হয় তার পদ্ধতিটা ঠিক নয় অর্থাৎ হাদীস সম্মত নয়।

প্রশ্ন ঃ কুরআন তিলাওয়াত পাঠ করে কেউ যদি মৃত ব্যক্তিকে ইসালে সওয়াব করে, তাহলে মৃত ব্যক্তি কি উপকৃত হবে?

উত্তর ঃ প্রথমত কেউ যদি কুরআন তিলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তিকে ইসালে সওয়াব করে, আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এ সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছায় না, কারণ এটি মৃত ব্যক্তির আমল নয়। এ তিলাওয়াত জীবিত ব্যক্তির চেষ্টা বা আমল, এর সওয়াব সে নিজেই পাবে, অন্য কাউকে সে ইসালে সওয়াব করার অধিকার রাখে না।

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে যে, তার জানাযার সলাত অমুকে পড়াবে, তাহলে ইমামতির জন্য অসিয়তকৃত ব্যক্তি উত্তম হবে না নির্ধারিত ইমাম?

উত্তর ঃ অসিয়তকৃত ব্যক্তিই উত্তম, তবে যদি সে অজ্ঞ হয় তাহলে ইমাম উত্তম।

প্রশ্ন ঃ কবর যিয়ারতের সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করা, অথবা কুরআনের কোন অংশ পাঠ করা কি বৈধ, আর এর দ্বারা সে কি উপকৃত হবে?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণিত রসূলুল্লাহ সা. কবর যিয়ারত করতেন এবং কিছু বাক্য দ্বারা তিনি কবরবাসীদের জন্য দু'আ করতেন, যা তিনি সাহাবাদের শিখিয়েছেন, তারাও তার থেকে শিখে নিয়েছে। ফাতিহা বা কুরআনের কোন অংশ পাঠের কোন সহীহ দলিল নেই।

প্রশ্ন ঃ জানাযায় অধিক লোকের অংশ গ্রহণে কি বিশেষ কোন ফযীলত আছে?

উত্তর ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যদি কোন মুসলিম মৃত্যুবরণ করে, আর তার জানাযায় চল্লিশ জন লোক এমন উপস্থিত হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না, আল্লাহ মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ কফিন নিয়ে নিয়ে দ্রুতচলা কি সুন্নত?

উত্তর ঃ কফিন নিয়ে সাধ্যানুযায়ী দ্রুতচলা সুন্নাহ। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুতচল, যদি পুণ্যবান হয় তাহলে তোমরা তাকে ভাল পরিণতির দিকে দ্রুত পৌঁছে দিলে, আর যদি পাপী হয়, তাহলে একটি মন্দবস্তুকে তোমাদের কাঁধ থেকে দ্রুত সরালে। (সহীহ বুখারী)

৭

কাউকে অন্ধ অনুসরণ করা ইসলামে নিষেধ

অন্ধ অনুসরণ বা তাকলীদ করা কেন নিষেধ

তাকলীদ ঃ বিনা দলিলে কারো কথার উপর আমল করাকে বলে 'তাকলীদ'। অথবা দলিল ব্যতীত কারো কথা গ্রহণ করাকে বলা হয় 'তাকলীদ'।

মুকাল্লিদ ঃ বিনা দলিলে কারো কথার উপর যারা আমল করেন তাদেরকে বলে 'মুকাল্লিদ'। অথবা দলিল ব্যতীত কারো কথাকে অন্ধভাবে যারা গ্রহণ করেন তাদেরকে 'মুকাল্লিদ' বলে। মুকাল্লিদ অর্থ 'অন্ধ অনুসরণকারী'।

সাবধানতা ঃ তাই কুরআন-হাদীসের দলিল ছাড়া কোন ব্যক্তির কথার উপর কোন প্রকার আমল করা যাবে না এবং রসূল ﷺ ছাড়া আর কাউকে অন্ধ অনুসরণও করা যাবে না সে যতো বড় বুজুর্গই হোক না কেন। (আবু দাউদ থেকে বর্ণিত)

অবশ্যই কোন ইমাম বা ইসলামিক স্কলারকে অনুসরণ করা যাবে তবে অন্ধভাবে নয় তাঁদেরকে অনুসরণ করতে হবে চোখ খুলে। ইমাম বা স্কলারের যে বিষয়গুলো কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক সেই বিষয়গুলো চোখ খুলে অর্থাৎ সহীহ দলিলের ভিত্তিতে মেনে নিতে হবে, আর যে অংশগুলো সহীহ দলিলের ভিত্তিতে নয় তা চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়া যাবে না।

পিতৃ পুরুষের আচরণের অন্ধ অনুসরণ বৈধ নয়

সূরা আল-মায়িদার ১০৪ নং আয়াতে, সূরা আল-বাকারার ১৭০ নং আয়াতে মুকাল্লিদরা বলছে, 'আমরা তো পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসারী'। এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কাজ করেও তারা প্রমাণ স্বরূপ এ তাকলীদকেই উপস্থাপিত

করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আ'রাফের ৮ নং আয়াতে তাদের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। শরীয়ত বিরোধী কার্য সম্পাদন করে ও বলে থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষরাও এ কাজগুলো সম্পাদন করতেন। ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্বজাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে তাদের উত্তরও একই ধরনের ছিল ঃ 'আমাদের পূর্বপুরুষকেও এদের ইবাদত করতেই দেখেছি' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৫৩)

'বরং আমরা পূর্ব পুরুষকে এভাবেই করতে দেখেছি' (সূরা শুয়ারা ঃ ৭৪)। হূদের উম্মতেরও একই উত্তর ছিল। নাবী ﷺ -এর যুগের কাফিরদেরও একই উক্তি। 'বরং আমরা পূর্ব পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসারী' (সূরা লুকমান ঃ ২১)। পৃথিবীতে সকল নাবীর বিরোধিতা মুকাল্লিদরা সম্পাদন করেছিল। নাবীগণের সাথে বিরোধিতার মূল কারণই ছিল 'তাকলীদ'। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'আর আমরা যে দেশে যে সকল রসূলগণকে ভয় প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছিলাম, সে দেশের সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দই বলে উঠেছিল ঃ 'আমরা তো পিতৃপুরুষের অনুসারী, তাদেরকে যেভাবে তাদের অনুষ্ঠানাদি পালন করতে দেখেছি সেভাবেই অনুষ্ঠানাদি পালন করব' (সূরা যুখরুফ ঃ ২৩)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফতোয়া অনুযায়ী আজকাল যদি কোন ব্যক্তি হাদীসের অনুসরণ করে ইমামের ফতোয়াকে বর্জন করে, তবে অন্ধ অনুকরণকারীরা 'ইমাম সাহেবকে অবমাননা করা হল'- বলে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। যদি ইমামগণের মতবাদগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বর্জন করলেই সে ইমামের অবমাননা করা হয়, তবে ইমাম চতুষ্টয়ের অনুকরণকারীরা কেউই এরূপ অবমাননা করার হাত থেকে রেহাই পাবেন না। কেননা হানাফী মুকাল্লিদগণ ইমাম শাফিয়ীর ফতোয়াকে বর্জন করে তাঁকে অবমাননা করে থাকেন। আবার শাফিয়ী মুকাল্লিদগণ ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতামতকে বর্জন করে তাঁকে অবমাননা করে থাকেন। এভাবে তাদেরই মতে প্রত্যেক দলের অন্ধ অনুগামী অন্য দলের ইমামের অবমাননা করে থাকেন। মুহাম্মাদ ﷺ -এর শিক্ষানুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ব্যতীত পূর্বের নাবীগণের শরীয়ত অবশ্য অবশ্য বর্জনীয়। তাহলে কি কোন মুসলিম অন্যান্য নাবীগণকে অবমাননা করে থাকেন? অন্ততঃ কোন প্রকৃত মুসলিম এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন না।

এখানে একটি বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মত মুসলিম কেবলমাত্র তাদের শরীয়তদাতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুকরণ করবে। তিনি ব্যতীত কোন সাহাবী, কোন তাবিয়ী, কোন মুহাদ্দিস,

কোন ইমাম ও কোন মুজতাহিদ নির্বিচারে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণের যোগ্য নন। কুরআন ও সুন্নাহতে কোন বিষয় (মাসআলা) অবোধগম্য হলে তবেই মুজতাহিদের ইজতিহাদ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করে মাসআলা বের করবেন। তবে যে বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে, সেটাকে অবলম্বন করে তার প্রতি আমল করতে হবে। এতদভিন্ন কুরআন ও সুন্নাহ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোথাও নির্বিচারে ইমাম ও মুজতাহিদের তাকলীদ করতে হবে- এমন কথা পাওয়া যাবে না।

মুজতাহিদ সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ মন্তব্য করেছেন ঃ 'মুজতাহিদ কখনও নির্ভুল ও সঠিক মাসআলা বের করেন, আবার কখনও ভুলও করে থাকেন।' এ কারণেই তাঁদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এক বিষয়ে চার মাযহাবের মুজতাহিদগণ চার রকম মতামত পোষণ করে থাকেন। আল্লাহর নিকট চারটা মতের মধ্যে মাত্র একটা শুদ্ধ। অন্যগুলো বিশুদ্ধ নয়। সুতরাং মুজতাহিদগণকে অন্ধভাবে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হতে পারেন না। কাজেই অন্ধভাবে তাঁদের তাকলীদ করা বৈধ নয়। দুনিয়ায় মুসলিম কেবলমাত্র এবং একমাত্র মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ -কে অন্ধভাবে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারবে; অন্যকাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হলে তা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিল থাকতে হবে। একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ ব্যতীত কোন অলী-আউলিয়া, পীর-হুজুর, কোন নেতা বা ইমামের অন্ধ অনুসরণ করা বৈধ নয়।

আল্লাহ বলেন ঃ (হে মুসলিম সমাজ!) তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে (প্রকাশ্যরূপে অহী এবং অপ্রকাশ্যরূপে নাবীর হাদীস) তোমরা অনুসরণ করে চলবে তারই এবং তা ব্যতীত অন্য কোন অলীর (অভিভাবকের) অনুসরণ করবে না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৩)

এখানে আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ ঃ মুসলিম কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করে চলবে, কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত কোন ব্যক্তির অনুসরণ করে চলবে না।

মাযহাব মানা কি ফরয?

আমরা কি মাযহাব মানতে বাধ্য? অনেকে বলেন কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবকে অবশ্যই মানতে হবে অর্থাৎ মাযহাব মানা ফরয। এবং চার মাযহাবের মধ্যে কোন প্রকার সংমিশ্রণ করা যাবে না! যেমন হানাফী মাযহাবের কিছু নিয়ম-কানুন

এবং শাফী মাযহাবের কিছু নিয়ম-কানুন একই সাথে অনুসরণ করা যবে না! এই ধরনের কথা মোটেও ঠিক নয়। আমরা মাযহাব মানতে অবশ্যই বাধ্য নই। কোন মাযহাবের ঐ বিষয়টুকু শুধু মানবো যেটুকু সহীহ হাদীসভিত্তিক। যা সহীহ হাদীসভিত্তিক নয় তা অবশ্যই মানা যাবে না। এটি রসূল ﷺ -এর আদেশ। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

যদি বলা হয় কোন একটি মাযহাব মানা ফরয তাহলে জানতে হবে যে এই ফরয হুকুমটি কার থেকে এসেছে। কারণ ইসলামের সমস্ত ফরয হুকুম এসেছে ওহীর মাধ্যমে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছ থেকে। কোন আলেম বা কোন হুজুর ইসলামের কোন বিষয় ফরয বা নফল করতে পারবে না, আর কেউ যদি তা করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সে মহান আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে।

আর মাযহাব মানা যদি ফরয হতো বা সুন্নাহ হতো তাহলেও তার দলিল কুরআনের কোন আয়াতে থাকতো। কুরআনে না থাকলেও সহীহ হাদীসগ্রন্থগুলোতে থাকতো। কোন সহীহ হাদীসগ্রন্থে না থাকলেও হয়তো দুর্বল হাদীসে থাকতো। কিন্তু কুরআন-হাদীস তো দূরের কথা মাযহাব ফরয হওয়ার বিষয়ে একটি জাল হাদীসও নেই। তাই "মাযহাব মানা ফরয" এই স্লোগান বা নির্দেশ মুসলিম সমাজে কীভাবে এলো তা চিন্তা করার বিষয়। মাযহাব আল্লাহর রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর চারশত বছর পরে এসেছে। এই চারশত বছর পর কে এই ফরয হুকুম নিয়ে এলো? কার কাছে ওহী এলো?

হানাফী মাযহাব সংক্রান্ত জটিলতা

চার ইমামকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের নিকট যে হাদীসসমূহ পৌঁছেছিল তার উপর ইজতিহাদ করে ছিলেন। তাঁদের একে অপরের সাথে যে মত পার্থক্য ঘটেছিল তার বিশেষ কারণ হচ্ছে, কারো নিকট কোন হাদীস পৌঁছেছিল যা অন্যের নিকট পৌঁছে নাই। কারণ, সেই যামানায় হাদীসের খুব বেশী প্রসার ঘটেনি। আর হাদীসের হাফিজগণ নানা

এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। কেউ ছিলেন হিজাযে, কেউ সিরিয়া, কেউ ইরাকে, কেউ মিসরে বা অন্যান্য মুসলিম দেশে। তাদের যামানায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত ছিল খুবই কঠিন ও কষ্টবহুল। সে কারণে দেখতে পাওয়া যায়, ইমাম শাফিয়ী (রহ.) যখন ইরাক ছেড়ে মিসরে গেলেন তখন ইরাকে তার যে পুরাতন মাযহাব ছিল তা ত্যাগ করেন। কারণ, তখন তাঁর সম্মুখে নুতন নুতন বহু সহীহ হাদীস উপস্থাপিত হয়।

একটি উদাহরণ। ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মাযহাব অনুসারে কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযূ ছুটে যায় কিন্তু অন্যদিকে ইমাম আবূ হানিফাহ্ (রহ.)-এর মতে ছুটে না। এমতাবস্থায় আমাদের উপর ওয়াজিব হল কুরআন ও সহীহ সুন্নাতের সন্ধান করা। আল্লাহ বলেনঃ

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর তবে তার বিচারের ভার আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ছেড়ে দাও যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক। এটাই হচ্ছে উত্তম এবং সঠিক ব্যাখ্যা।"
(সূরা নিসা ঃ ৫৯)

আর আমাদেরকে তো হুকুম করাই হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। আর রসূল ﷺ আমাদেরকে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে উহার ব্যাখ্যা দান করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ কর। তাকে ছেড়ে অন্য কোন আউলিয়াদের অনুসরণ কর না। তোমরা খুব কমই ইহা স্মরণে রাখ।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩)

তাই কোন মুসলিমের সামনে কোন সহীহ হাদীস পেশ করলে তাকে এই বলে ত্যাগ করা জায়িয নেই যে, এটা আমাদের মাযহাব বিরোধী। কারণ সমস্ত ইমামগণের ইজমা হচ্ছে সর্বদা সহীহ হাদীস গ্রহণ করা, আর হাদীসের খেলাফ তাদের যে মতবাদ তা পরিহার করা।

এখন Information Technology-র যুগ। আমাদের সামনে সকল তথ্য বিদ্যমান। হাদীসের মধ্যে কোনটি সহীহ এবং কতো % সহীহ, কোনটি দুর্বল এবং কতো % দুর্বল আর কোনটি জাল এবং কতো % জাল ইত্যাদি সব তথ্য রয়েছে। হাদীস বিশারদগণ রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পরদিন থেকে দিনের পরদিন গবেষণা করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এখন আর কোন বিষয়

অস্পষ্ট বা গোপন নেই। কোন কোন গবেষক নির্দিষ্ট কয়েকটি হাদীসের উপরও পি.এইচ.ডি করছেন, কেউ আল কুরআনের একটি সূরার উপর দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে পি.এইচ.ডি করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করছেন। কুরআন-হাদীসের বিষয়গুলো গবেষণা করে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আজ এর ফলাফল শুধু আরবী ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, প্রকাশিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়।

সহীহ হাদীসের সাথে হানাফী মাযহাবের এতো পার্থক্য কেন হলো?

এই ধরনের হেডিং দেখে যেন আমরা রেগে না যাই এবং কেউ কাউকে যেন ভুল না বুঝি। ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) যখন ইসলামের উপর গবেষণা (ইজতেহাদ) করেছেন তখন রসূল ﷺ -এর সবগুলো হাদীস একসাথে সংকলিত (compile) করা হয়নি। তখন হাদীসগুলো সারা আরব দেশে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় ছিলো। তার উপর ছিল হাজার হাজার সহীহ, দুর্বল এবং জাল হাদীসের সংমিশ্রণ। তখনও হাদীস নিয়ে ঐ পরিমাণ গবেষণা হয়নি এবং যাচাই-বাছাইও হয়নি যে কোনটি সহীহ আর কোনটি জাল। ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-র নিকট ছিল তখন এই নানারকম সংমিশ্রিত হাদীস এবং তিনি যা পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে সমসাময়িক ফতোয়া দিয়েছেন।

এরপর ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-এর অন্যান্য ছাত্র তিন ইমাম এসেছেন, যুগের উন্নতি হয়েছে। হাদীসের উপর গবেষণা করে সহীহ-দুর্বল-জাল হাদীসের সংকলন বের হয়েছে। সলাতসহ ইসলামের অন্যান্য বিষয়গুলো সহীহ হাদীসভিত্তিক প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) যে বিষয়গুলো দুর্বল বা জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছিলেন পরবর্তীতে সেই বিষয়ের উপর সহীহ হাদীস সামনে আসাতে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)র ফতোয়া অগ্রহণযোগ্য এবং বাতিল হয়ে গেছে।

চার ইমামের ফতোয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুর্বল এবং জাল হাদীসভিত্তিক হচ্ছে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-র ফতোয়া, কারণ চারজনের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম। আমরা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাই যে আবূ হানিফা (রহ.)-এর পরবর্তী তিন ইমামই ইমাম আবূ হানিফাকে অনুসরণ করেননি। তাঁরা আবূ হানিফা (রহ.)-র ফতোয়াকে বাদ দিয়ে নতুন ফতোয়া দিয়েছেন। কারণ তাদের হাতেও তখন নতুন নতুন সহীহ হাদীসের সমারোহ ঘটেছে। আবূ হানিফা (রহ.)-র

ফতোয়া যদি সঠিক থাকতো তাহলে তাঁরা নতুন মাযহাব সৃষ্টি না করে সরাসরি আবূ হানিফা (রহ.)-কেই অনুসরণ করতেন। কিন্তু তাঁরা তা না করে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)-কে অন্ধভাবে অনুসরণ করেনি।

এই চারজন ইমামের পর যদি অন্য আরো চারজন ইসলামিক স্কলার তাঁদের মতো ইসলামের নিয়ম-কানুন নিয়ে কাজ করতেন তাহলে হয়তো মাযহাব চারটির জায়াগায় আটটি হতো এবং মাযহাবের ইমামও চারজনের জায়গায় আটজন হতেন। হয়তো পরবর্তী চারজনের গবেষণায় আরো নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতো এবং আট মাযহাবে আটরকম তথ্য দেখা যেতো।

হাদীস সম্বন্ধে চার মাযহাবের চার ইমামের বক্তব্য

নিম্নে ইমামগণের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। তাদের উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের উপর যেসব দোষারোপ করা হয়, তা দূরীভুত হবে এবং তাদের অনুসারীদের নিকট সত্য উদঘাটিত হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন ঃ

১. কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জ্ঞাত হবে এটা আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি।

২. ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম, যে আমার দলিল না জেনে, শুধু কথার উপর ফতোয়া দেয়। কারণ আমরা মানুষ। আজ এক কথা বলি আগামীকাল আবার ওটা হতে প্রত্যাবর্তন করি।

৩. যদি আমি এমন কোন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব কিংবা রসূল ﷺ - এর কথার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তখন আমার কথাকে ত্যাগ করবে।

৪. ইমাম ইবনে আবেদীন তার কিতাবে বলেন ঃ যদি কোন হাদীস সহীহ হয় আর ওটা মাযহাবের বিরোধী হয় তথাপি ঐ হাদীসের উপর আমল করতে হবে। ওটাই হবে তার জন্য মাযহাব। কোন মুকাল্লিদ ওটার উপর আমলের দ্বারা হানাফী মাযহাব হতে বের হয়ে যাবেন না। কারণ সহীহ রেওয়াতে ইমাম ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, যদি হাদীস সহীহ হয় তবে ওটাই আমার মাযহাব।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন ঃ

১. আমিতো একজন মানুষ মাত্র। ভুলও করি, শুদ্ধও করি। তাই আমার রায়কে উত্তমভাবে পর্যবেক্ষণ কর। তার মধ্যে যেগুলো কুরআন-হাদীসের সাথে মিলে তাদের গ্রহণ কর। আর যেগুলো কুরআন ও হাদীসের সাথে মিলে না তাকে ত্যাগ কর।

২. শুধুমাত্র নাবী ﷺ -এর সব কথা গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন ঃ

১. এমন কেউ নেই যার নিকট রসূল ﷺ -এর কিছু সুন্নাত আছে আর কিছু গায়েব আছে। তাই আমি যত কথাই বলি না কেন, আর যত উসূলী কথাই বলি না কেন, যদি রসূল ﷺ হতে তার বিপরীত কোন কথা আমার দ্বারা বলা হয়ে থাকে তবে রসূল ﷺ -এর কথাই গ্রহণযোগ্য, আর ওটাই আমার মত বলে ধরা হবে।

২. মুসলিমদের ইজমা হয়েছে যে যদি কারও নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন সুন্নাত প্রকাশিত হয় তাঁর কথাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কথা গ্রহণ করা তার জন্য জায়েয হবে না।

৩. যদি আমার কোন কিতাবে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কথা দেখতে পাও তবে তোমরা রসূল ﷺ -এর কথাকেই গ্রহণ করবে। ওটাই আমার কথা।

৪. যদি কোন হাদীস সহীহ হয় তবে ওটাই আমার মাযহাব।

৫. একদা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমরা আমার থেকে হাদীস ও তার বর্ণনাকারীদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত আছ। যদি কোন সহীহ হাদীস পাও তবে সাথে সাথে আমাকে জ্ঞাত করবে যাতে আমি তার উপর মাযহাব বানাতে পারি।

৬. ঐ সমস্ত মাসআলা যাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমি যা বলেছি তা সহীহ হাদীসের বিপরীত তবে আমি আমার জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পরও ওটা হতে বিরত হচ্ছি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন ঃ

১. আমাকে তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করিও না, আর না মালিক বা শাফিয়ী বা আওযায়ী অথবা সাওরী-কে অনুসরণ কর। বরং তারা যেখান হতে গ্রহণ করেছে সেখান হতে গ্রহণ কর। (যারা বুঝেছে ও শিখেছে তাদের হতে)।

২. যে ব্যক্তি রসূল ﷺ -এর কোন হাদীসকে অস্বীকার করবে সেতো ধংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে নিয়ে বানানো গল্প

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে নিয়ে একটি বানানো গল্প প্রচলিত আছে যে, তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর ঈশার ওয়াক্তের ওযূ দিয়ে ফযরের সলাত আদায় করেছেন। এই ধরনের গল্প ভিত্তিহীন এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জন্য অপমানজনক। কারণ সারা রাত্রি জাগরণ থেকে অর্থাৎ না ঘুমিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ কোন ইবাদত করেননি বরং এই ধরনের ইবাদত করতে তিনি মানা করেছেন। আমরা জানি যে ঘুমালে ওযূ ছুটে যায়। তাহলেও ঈশার ওয়াক্তের ওযূ দিয়ে ফযরের সলাত আদায় করা সম্ভব নয়। এছাড়া এটিও অবাস্তব যে দীর্ঘ ৪০ বছর পায়খানা-প্রশ্রাব না করে কী করে ঈশা থেকে ফযর পর্যন্ত ওযূ রাখা যায়!

এখন কিছু প্রশ্ন

১. একজন মুসলিম হিসেবে আমি কোন মাযহাবকে অনুসরণ করবো?

২. যদি হানাফী মাযহাবকে অনুসরণ করি তাহলে শাফিঈ মাযহাব নয় কেন? আবার যদি শাফিঈ মাযহাব অনুসরণ করি তাহলে মালিকি মাযহাব কোন দোষ করলো?

৩. মাযহাবে আছে একরকম এবং রসূল ﷺ বলেছেন আরেক রকম, এখন আমি কোনটি মানবো?

৪. উদাহরণস্বরূপ, আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী। হানাফী এবং মালিকি মাযহাবে কোন একটি বিষয় সহীহ হাদীসভিত্তিক নয়, আবার শাফিঈ এবং হানবলী মাযহাবে ঐ একই বিষয় সহীহ হাদীসভিত্তিক! এখন আমি কোন মাযহাব অনুসরণ করবো?

৫. যুগ যুগ ধরে হাদীস বিশারদগণ গবেষণা করে জাল এবং দুর্বল হাদীস বাছাই করেছেন। সেগুলো দলিল প্রমাণ আমার সামনে থাকা সত্ত্বেও কেন আমি জাল বা দুর্বল হাদীস অনুসরণ করবো?

৬. একটি বিষয়ে আমার সামনে একাধিক সহীহ হাদীস আছে তা জানা সত্ত্বের আমি কেন জাল ও দুর্বল হাদীস অনুসরণ করবো?

৭. 'লা-মাযহাব' বলতে কুরআন ও সহীহ হাদীসে কিছু আছে কি?

৮. রসূল ﷺ কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

৯. সাহাবীগণ (রা.) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

১০. রসূল (রা.) এর মৃত্যুর চারশত বছর পর মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে, তার আগে কোন মাযহাব ছিল?

১১. ইমাম আবু হানীফার পর এসেছেন ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক এবং ইমাম হানবাল। পরবর্তী তিনজন ইমাম কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

১২. পরবর্তী তিন ইমাম শাফিঈ, মালিক এবং হানবাল কেন অন্ধভাবে হানাফী মাযহাবকে অনুসরণ করলেন না?

১৩. পরবর্তী তিন ইমাম কেন নিজেরা আলাদা আলাদা মাযহাব সৃষ্টি করলেন? কেন তারা একে অপরের মাযহাবকে অন্ধভাবে অনুসরণ করলেন না?

১৪. আমাদের সন্তানরা যখন বড় হবে তখন সে কোন মাযহাব অনুসরণ করবে? যখন তারা উপরের প্রশ্নগুলো করবে তখন তাদের প্রশ্নের উত্তর দিব কিভাবে?

১৫. একজন অমুসলিম যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন সে কোন মাযহাব অনুসরণ করবে?

জাল ও দুর্বল (মওজু ও যঈফ) হাদীস থেকে সাবধানতা অবলম্বন

শরীয়াতের মূল উৎস হচ্ছে আল কুরআন। আর কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হলো হাদীস। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন কারণেই ইসলামের মধ্যে নানা ধরনের বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র। ইসলামের শত্রুরা যখন মুসলিমদের সাথে পেরে উঠছিলনা তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। কিছু অমুসলিম বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ভাব দেখিয়ে মুসলিমদের মাঝে তারা বিভিন্ন কর্মকান্ডের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এজন্য তারা সাধারণ মুসলিম জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের কথার মধ্যে "রসূলুল্লাহ বলেছেন" এই কথাটি সংযোগ করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়।

এভাবে মুসলিম সমাজে জাল-যঈফ হাদীসের প্রচলন ঘটে, বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কারের প্রসার ঘটতে থাকে।

শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেছেন ঃ যিনি বিদ'আত করেন তার নিকট সব কিছুই গোলমেলে হয়ে যায়। ফলে সে বিদ'আতকে সুন্নাত আর সুন্নাতকে বিদ'আত মনে করে। অতএব বিদ'আতের ভয়াবহতা হতে রক্ষা পেতে হলে আমাদের মাঝে প্রচলিত বিদ'আতগুলো হতে সতর্ক হয়ে সেগুলোকে পরিত্যাগ করে সহীহ সুন্নাহ মাফিক আমল করা ছাড়া আখিরাতে মুক্তির জন্য আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার উপর আমার নির্দেশ নেই সে আমলটি অগ্রহণযোগ্য" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আসুন! আমরা জাল ও যঈফ হাদীসগুলোকে জানি এবং তথাকথিত আলেম-ওলামাদের জাল ও যঈফ হাদীস নির্ভর ফাতোয়া ও আক্বীদাহ হতে নিজেদেরকে মুক্ত করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর ও তাঁর নাবীর যথাযথ অনুসরণ করার তৌফীক দান করুন। আমীন। রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই হাদীস হিসেবে বর্ণনা করবে।" (সহীহ মুসলিম)

ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রমানিত ঃ যিনদীক ও মুনাফিক সম্প্রদায় ১৪ হাজার হাদীস জাল করেছিল। তাদের মধ্যে আবদুল করিম ইবনে আবুল আওযা নিজে স্বীকার করেছে যে সে ৪ হাজার হাদীস জাল করেছে। এদের মধ্যে আরো একজন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ ইবনে হাসান আল আসাদী আরো ৪ হাজার হাদীস জাল করেছে। ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ মিথ্যা হাদীস রচনায় খ্যাত ছিল চার জন। তারা হলো- মদীনায় ইবনে আবি ইয়াহইয়া, বাগদাদে ওয়াকেদী, খোরাসানে মাকাতেল বিন সুলাইমান এবং সিরিয়ায় মুহাম্মাদ বিন সাঈদ মাছলুব।

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম ছাড়া বাকি অন্যান্য যে হাদীস গ্রন্থগুলো আছে যেমন ঃ জামে আত তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে আন নাসাঈ, আহমদ, বাইহাকী ইত্যাদি সবগুলোর মধ্যেই কিছু কিছু জাল ও দুর্বল হাদীস রয়েছে। আমাদের দেশে 'মিশকাত শরীফ' নামে সংকলিত যে হাদীসগ্রন্থটি মাদ্রাসার সিলেবাসভুক্ত পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয় তার মধ্যেও অনেক হাদীস রয়েছে যা জাল এবং

যঈফ। এ যুগটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আমাদের সামনে ভুল-শুদ্ধ সকল তথ্য রয়েছে। এখন আমদের নিজ দায়িত্ব সঠিকটা বেছে নেয়া।

আমাদের প্রকাশিত ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের সিরিজের ১০নং বইটি হাদীসের উপর (One Hadith a Day)। এই বইটিতে সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম থেকে বাছাইকৃত ৩৬৫টি সহীহ হাদীস রয়েছে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে বাছাইকৃত ৩৬৫টি জাল ও দুর্বল হাদীস রয়েছে। আমাদের পারামর্শ হচ্ছে, সহীহ হাদীসের পাশাপাশি আমাদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত জাল-যঈফ হাদীসগুলোও আমাদের মুখস্ত থাকা প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু জাল হাদীস

১. যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াদারীর কথা বলে আল্লাহ তার আমল নষ্ট করে দেন। (জাল হাদীস)

২. মসজিদে কথা বলা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন চতুষ্পদ জন্তু ঘাস তৃণলতা খেয়ে ফেলে। (জাল হাদীস)

৩. সবচেয়ে সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট লোকটি জাতির ইমামতি করবেন। (জাল হাদীস)

৪. সলাতের জন্যে ইকামত দিলে ফরয সলাত ছাড়া অন্য কারো সলাত নেই, তবে ফযরের দু রাকাআত সুন্নত পড়া যাবে। (জাল হাদীস)

৫. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশতাকুল জুমুআর দিনে পাগড়ীসহ সলাত আদায়কারীর উপর রহমত বর্ষণ করেন। (জাল হাদীস)

৬. সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো। (জাল হাদীস)

৭. দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর। (জাল হাদীস)

৮. রমাদান মাসে তিনি (রসূল) ২০ রাকাআত এবং বিতর সলাত জামায়াত ছাড়া পড়তেন। (জাল হাদীস)

৯. যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার কোনো এক জায়গায় মারা যাবে তার জন্যে আমার সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন শান্তিতে হাজির হবে। (জাল হাদীস)

১০. যে হাজ্জ করলো অথচ আমার যিয়ারত করলো না সে আমাকে খামুশ করে দিল। (হাদীসটি জাল)

১১. যে হাজ্জ করে আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো সে যেনো আমার জীবিতাবস্থায় যিয়ারত করলো। (জাল হাদীস)

১২. এক ঘন্টা ইলম তলব করা একরাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর একদিন তো তিনমাস রোযা রাখার চেয়েও ভালো। (জাল হাদীস)

১৩. আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাইলের নাবীগণের মতো। (জাল হাদীস)

১৪. বান্দা কুরআন খতম করলে ৬০ হাজার ফিরিশতা তার জন্যে রহমত কামনা করেন। (জাল হাদীস)

১৫. যে সূরায়ে ওয়াকিয়াহ প্রতিরাতে তিলাওয়াত করবে দারিদ্র তাকে কভু স্পর্শ করবে না। আর যে প্রতিরাতে লা ওক্বছিমু বিইয়াওমিল কিয়ামাহ সূরা পাঠ করবে সে আল্লাহর সাথে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল চেহারাসমূহ সাক্ষাৎ করবে। (জাল হাদীস)

১৬. যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ৮০ বার আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে তার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (জাল হাদীস)

১৭. এক ঘন্টা ফিকর (চিন্তা) করা ৬০ বৎসর ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (জাল হাদীস)

১৮. প্রতি ৪০ জনে একজন আল্লাহর ওলী থাকেন। (জাল হাদীস)

১৯. যে আপনার উপর দিনে রাতে **১শ'** বার দুরূদ পড়বে আমি (আল্লাহ) তার ওপর ২ হাজার রহমত দান করবো, সহস্র প্রয়োজন পূরণ করবো, তন্মধ্যে সবচেয়ে সহজ প্রয়োজন হলো জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দেয়া। (জাল হাদীস)

২০. আমি সে সময়ের নাবী যখন আদম, পানি, মাটি কিছুই ছিল না। আরো আছে– আরশের পার্শ্বে একটি নূর ছিল। নাবী বললেন ঃ হে জিবরাঈল! আমি ছিলাম সে নূর। (জাল হাদীস)

২১. যখন আদম ভুল স্বীকার করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রব! আমি মুহাম্মদের ওসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। (জাল হাদীস)

২২. নাবী ﷺ শবে মিরাজে ৯০ হাজার কালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করেন। তন্মধ্যে ৩০ হাজার জাহেরী যা আলেমগণ জানেন; আর ৬০

হাজার বাতেনী সেগুলো সম্পর্কে আলেমগণ অবগত নন; তবে ঐগুলো আলী (রা.)-র জানা। (জাল হাদীস)

২৩. নাবী ﷺ সিদরাতুল মুনতাহায় (মিরাজ রজনীতে) পৌঁছে গেলে জিব্রাইল (আ.) থমকে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আর এক কদম পরিমাণ অগ্রসর হলে আমি জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাব।" (জাল হাদীস)

২৪. কথাটি যাকওয়ান কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য ও চন্দ্র কিরণে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর দেহের ছায়া কখনো দেখা যেতো না। (জাল হাদীস)

২৫. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে বলেন ঃ হে দুনিয়া! আমার ওলীদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে যাও কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবেশ করো না যাতে তারা ফিতনায় পতিত না হয়। (জাল হাদীস)

২৬. পীর মাশায়েখদের ইজ্জত কর। কেননা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহর মহত্ব প্রকাশ করারই নামান্তর। (জাল হাদীস)

২৭. আমার সাহাবাগণ তারকার ন্যায়, যারাই তাদের অনুবর্তী হবে তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (জাল হাদীস)

২৮. আমি নাবীগণের শেষ, আর হে আলী! তুমি হচ্ছো ওলীগণের শেষ। (জাল হাদীস)

২৯. আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন এমন লোক সব সময় থাকবে যাদের ওসীলায় জমিন টিকে থাকবে, বৃষ্টি হবে এবং সাহায্য লাভ করবে। (জাল)

৩০. রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেননি। এমনকি তিনি (এখনো) পড়েন ও লেখেন। (জাল হাদীস)

আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল তথ্য

কিছু হাদীস এবং কিছু ঘটনা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যা সঠিক নয়, কুরআন ও সহীহ হাদীসে এর কোন দলিল নেই। যেমন ঃ

১. যখন আদম (আ.)-এর অস্তিতই হয়নি তখনও 'আমি মুহাম্মাদ নাবী ছিলাম'।

২. আবরাহা বাহিনীকে পাথর নিক্ষেপে ধ্বংসাকারী পাখিকে 'আবাবিল পাখি' বলে উল্লেখ করা এবং সেই পাখি এখনো নাকি মক্কায় দেখা যায়।

৩. রসূল ﷺ এর পথে এক বুড়ি কাঁটা বিছিয়ে রাখতো ... একদিন বুড়ির জ্বর হলো....রসূল ﷺ তাকে দেখতে গেলেন.... ।

৪. রসূল ﷺ ঈদগাহে যাওয়ার পথে এক ইয়াতিম বাচ্চাকে কান্নারত অবস্থায় পেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে মা আয়িশার নিকট দিলেন এবং মা আয়িশা তাকে গোসল দিয়ে নতুন কাপড়-জুতা পরিয়ে দিলেন.... ।

৫. গাছের তলায় একদিন একটি হরিণ বাঁধা ছিল, হরীণ রসূল ﷺ কে বললেন আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিন আমি আমার শিশুদেরকে দুধ পান করিয়ে আবার চলে আসবো.... ।

৬. রসূল ﷺ ও আবু বকর (রা.)-এর হিযরতের সময় গুহায় মাকড়সার জাল তৈরী ও কবুতরের ডিম পাড়ার ঘটনা ।

৭. রসূল ﷺ ও আবু বকর (রা.)-এর হিযরতের সময় গুহায় আবু বকর (রা.)-কে সাপে দংশন । সাপটি ঐ গুহায় ৩০০ বছর যাবৎ অপেক্ষমান ছিল ।

৮. রসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের পূর্বক্ষণে ফাতিমা (রা.)-এর অনুমতিক্রমে আযরাঈলের ঘরে আগমন ।

৯. হোসাইন (রা.) যেদিন কারবালাতে শহীদ হন সেদিন 'ফাতিমা কান্দিয়া কয় আজ বুঝি আমার হোসাইন কারবালাতে শহীদ হয়...' । (নোট ঃ অথচ হোসাইনের মৃত্যুর ৪৯ বছর পূর্বে ফাতিমা (রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন ।)

১০. কারবালাতে সীমার কর্তৃক হোসাইন (রা.)-এর গলায় ছুড়ি চালানো এবং গলা না কাটাতে হোসাইনের অনুরোধে ঘারের দিক দিয়ে ছুড়ি চালানো..... ।

১১. মিরাজে 'তাশাহহুদ - আত্তাহিয়্যাতু' নাযিল হয়েছে ।

১২. আদম-হাওয়ার বিয়ের মোহরানা ছিল শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর ১০ বার দুরূদ পাঠ ।

১৩. রসূল ﷺ কবরে শুয়ে শুয়ে দুরূদ শুনতে পান ।

১৪. দুরূদ পাঠের দ্বারা শুধু নিজের নয় পরবর্তী বংশধরদেরও সওয়াব হয় ।

১৫. দুরূদ পাঠকারীর উপর জান্নাত ওয়াজিব ।

১৬. দুরূদের মাধ্যমে সুদের গুনাহ মাফ হয় ।

১৭. দুরূদের বরকতে কবর হতে সুগন্ধি ছড়ায় ।

১৮. বিনা ওযূতে দুরূদ পড়া নিষেধ ।

১৯. একটা সুন্নাত জিন্দা করলে ১০০ শহীদের সওয়াব লাভ।

২০. যে ব্যক্তি নিজেকে চিনল সে আল্লাহকে চিনল।

২১. 'মাবুদ' বলে আল্লাহর কোন নাম কুরআন বা হাদীসে নেই।

২২. আদম ও হাওয়া (আ.) গন্দম নামের ফল খেয়েছিলেন, এই ধরনের কিছু কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই।

২৩. ইবরহীম (আ.) কর্তৃক ইসমাঈল (আ.)-এর গলায় ছুড়ি চালানো।

২৪. নাবীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার।

২৫. আসমানী কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা।

২৬. আঠারো হাজার মাখলুকাত রয়েছে বলা।

২৭. একজন হাফিয ১০ জন ব্যক্তিকে জান্নাতে নিতে পারবে।

২৮. ওযূ করার সময় ঘাড় মাসেহ করতে হয়।

২৯. হাটুর উপর কাপড় উঠলে ওযূ ভেঙ্গে যায়।

৩০. বিনা ওযূতে আবদুর কাদের জিলানীর নাম নিলে একটা লোম পরে যায়।

৩১. ধুমপান করলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়।

৩২. ওযূ ছাড়া আরবী বই স্পর্শ করা যায় না।

৩৩. ওযূর মধ্যে কথা বলা নিষেধ।

৩৪. ওযূ অবস্থায় বাচ্চাকে স্তন পান করালে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়।

৩৫. ওযূতে মাসেহ করতে হলে মোজা চামড়ার হতে হবে।

৩৬. ঠান্ডা পানিতে ওযূ করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়।

৩৭. টয়লেটে ঢুকার সময় মাথা ঢাকা জরুরী।

৩৮. বদ্ধ বাথরুমের ভিতরেও নগ্ন অবস্থায় গোসল করা যায় না।

৩৯. বাচ্চা প্রসব হতে ৪০ দিন পর্যন্ত সলাত মাফ।

৪০. কুকুর কোন জিনিস স্পর্শ করলে তা অপবিত্র হয়ে যায়।

৪১. মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম।

৪২. সলাতে গভীর মনোযোগের কারণে আলী (রা.)-এর পা থেকে বিদ্ধ তীর খুলতে টের না পাওয়া।

৪৩. জুম্মার সলাত গরীবের হাজ্জ তুল্য।

৪৪. মীর মোশারফের 'বিষাধ সিন্ধুকে' ধর্মীও বই মনে করা।

৪৫. আলেমদের মতবিরোধ রহমত স্বরূপ।

৪৬. কবর বলতে শুধু মাটির গর্তকেই বুঝায়।

৪৭. মহিলাদের বুককে উড়ুর সাথে লাগিয়ে আটোসাটো হয়ে সাজদা করতে হবে। (নোট ঃ এর উপর চারটি জাল হাদীস রয়েছে।)

কালিমার ভুল ব্যাখ্যা ঃ আমাদের সমাজে একটা কথার প্রচলন আছে যে, যে একবার কালিমা পড়েছে সে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবেই অথবা সমস্ত মুসলিমরা জান্নাতে যাবে আর অমুসলিমরা জাহান্নামে যাবে। একটা সেমিনারে একজন অমুসলিম অডিয়েন্স থেকে ড. জাকির নায়েককে এই প্রশ্নটাই করেছিলেন যে, "সমস্ত মুসলিমই জান্নাতে যাবে আর সমস্ত অমুসলিম জাহান্নামে যাবে এটা কি ঠিক?" উত্তরে ড. জাকির নায়েক একটা কুরআনের কপি হাতে নিয়ে বলেন, এই বইয়ের কোথাও এই ধরনের কথা লিখা নেই। তবে লিখা আছে যে, যারা এই বইটা অনুসরণ করবে তারাই জান্নাতে যাবে আর যারা অনুসরণ করবে না তারা জাহান্নামে যাবে।

খতমে তারাবিহ ঃ তারাবিহর মাধ্যমে কুরআন খতম দিতেই হবে এটা মনে করা যাবে না, এবং প্রথম দিন থেকে এক মসজিদে তারাবিহ পড়া শুরু করলে কুরআন খতমের জন্য ঐ মসজিদেই পুরো রমাদান মাস সলাত আদায় করতে হবে এভাবে বাধ্য করে নেয়া যাবে না। তবে রমাদান মাসে কুরআন খতম দেয়া ভাল। আবার দ্রুত খতম দেয়ার জন্য এমনভাবে রেলগাড়ির মতো তিলাওয়াত করা যাবে না যাতে কেউ কিছুই বুঝতে পারে না। অতি দুঃখের বিষয় কেউ কেউ ইশার সলাতের চেয়েও তারাবিহকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

গরম সূরা ঃ এক প্রতিবেশী আপা তার বাচ্চাদের অনেকগুলো সূরা মুখস্ত করিয়েছেন কিন্তু তিনি তার বাচ্চাদের ইয়াসীন সূরা মুখস্ত করতে দেন না। তার কারণে তিনি বলেন, ইয়াসীন সূরা খুব গরম তো তাই ছোট বাচ্চাদের পড়তে দেই না। কোথায় পেলেন তিনি এই গরম সূরার খবর? আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কুরআন নাযিল হয়েছে মানব জাতিকে গাইড করার জন্য। কুরআনের কোন সূরাই গরম বা ঠান্ডার কোন বিষয় নেই, এগুলো ভ্রান্ত চিন্তা।

সাদ্দাদের মিথ্যা কাহিনী ঃ এই কাহিনীতে আজরাঈল (আ.) নাকি বলেছেন তিনি জীবনে দুইবার জান কবয করতে গিয়ে মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন। এক. সমুদ্রের মধ্যে প্রচন্ড ঝরে লঞ্চ ডুবে গেল, সাদ্দাদের মা একটি তক্তা ধরে ভেসে

রইলেন এবং তখন সাদ্দাদের জন্ম হলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে তার মার জান কবজের হুকুম হলো। দুই. সাদ্দাদ যখন তার নিজের তৈরী জান্নাতে প্রবেশ করবে ঠিক ঐ মুহূর্তে তার জান কবযের হুকুম হলো।

মসজিদের পাশে কবর হলে কোন লাভ নেই ঃ কাজী নজরুল ইসলাম তার একটি গানে বলেছেন তাকে মসজিদের পাশে কবর দিতে, যেন তিনি আযান শুনতে পান! এখানে আকীদাগত মারাত্মক ভুল রয়েছে। কুরআন-হাদীস বলে কেউ মারা গেলে সে আর পৃথিবীর কোন কথা শুনতে পায় না। এরপর মসজিদের পাশে কবর হলে কোন লাভ নেই, যে যেমন আমল করেছে তার ঠিক সে অনুযায়ী কবরে আযাব হবে।

মসজিদের পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোড়ে থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই।
আমার গোড়ের পাশ দিয়ে ভাই নামাযিরা যাবে
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি বান্দা শুনতে পাবে।

মক্কা-মদীনায় মৃত্যু হলে কোন লাভ নেই ঃ আমাদের মধ্যে আর একটি ভুল প্রচলিত আছে যে, হাজ্জ করতে গিয়ে মারা গেলে অথবা মক্কায় বা মদীনার বাকী কবরস্থানে কারো দাফন হলে সে জান্নাতী, তার কবরে আযাব হবে না। এই ধরনের কথা ভুল। মনে রাখতে হবে যে জান্নাত নির্ভর করছে আমলের উপর, কোথায় দাফন হলো বা কোথায় মৃত্যু হলো এর সাথে জান্নাতের কোন সম্পর্ক নেই। কাউকে যদি কাবা ঘরের ভিতরে মাটি খুড়ে বা রসূল ﷺ -এর কবরের পাশেও কবর দেয়া হয় তাতে কোন কিছু যায় আসে না।

জান্নাতের ভাষা হবে আরবী কথাটি ঠিক নয় ঃ আমি আরব, কুরআন আরবী, জান্নাতের ভাষা আরবী। (এটি জাল হাদীস) জান্নাতের ভাষা আরবী, জাহান্নামের ভাষা ফার্সি। (এটিও জাল হাদীস) সূরা আরাফের ৩৩ নং আয়াতে আছে আল্লাহ না জেনে কথা বলা হারাম করেছেন। কেউ যদি বলে আল্লাহর ভাষা আরবী এ ধারণার কোন ভিত্তি নেই। জান্নাতের ভাষা আরবী বলে যে হাদীস আছে তাও জাল। জাল হাদীসের উপর আমল করলে গুনাহ তো হবে, মানুষ পথভ্রষ্ট হবে। জান্নাতের ভাষা কি হবে তার কোন সহীহ হাদীস নেই। শুধুমাত্র কুরআন নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়। ২৫ জন নাবীর নাম আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আর ৪ জন নাবী হচ্ছেন আরব যেমন ঃ হুদ (আ.), সালেহ (আ.), শুয়াইব (আ.), মুহাম্মাদ ﷺ। বাকীরা অন্য ভাষাভাষী।

তাজমহলের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই ঃ মুঘল সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রী মমতাজের স্মরণে তাজমহল তৈরী করেছিলেন। তাজমহল তৈরীতে ২০ হাজার শ্রমিকের ২২ বছর সময় লাগে, তার পর তিনি আর্কিট্যাক্টদের হাত কেটে দিয়েছিলেন যাতে দ্বিতীয় আর একটি তৈরী করতে না পারে। এটি কোন প্রকৃত ঈমানদারের কল্যাণমুলক কাজ হতে পারে না, অবশ্যই এটি বৃহৎ অপচয় এবং মুসলিম জাতির জন্য একটি কলংকের অধ্যায়। এটি ইসলামের ইতিহাস হতে পারে না। তাজমহলের ভিতরে তার স্ত্রী মমতাজের কবর রয়েছে, কেউ কেউ তা যিয়ারত করতে যান যা বিদ'আত। বাংলাদেশের কলেজ-ইউনিভার্সিটির সিলেবাসে মুঘল সম্রাটদের কার্যকলাপ ইসলামের ইতিহাস হিসেবে পাঠ্য। মুঘল সম্রাটদের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস বলা হয়তো ঠিক না। হতে পারে এগুলো কিছু মুসলিম নামধারী সম্রাটদের বিলাসিতার ইতিহাস যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-র গ্রন্থাবলী ঃ ইমাম গাজ্জালী রচয়িত এহইয়া-উল-উলুমুদ্দীন, কিমিয়াতে সা'দাত, মুকাশাফাতাল কুলুব ইত্যাদি নামে বহুল প্রচলিত বেশ কিছু বই রয়েছে যা Authentic নয়। এই বইগুলো সূফীজমের উপর লিখিত। এর মধ্যে প্রচুর কল্প-কাহিনী-আজগুবি গল্প এবং জাল হাদীস দিয়ে ভরপুর যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই বইগুলো প্রচার করাও ঠিক নয়, এতে সাধারণ পাঠকরা পড়ে বিভ্রান্ত হবে এবং সঠিক ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) মৃত্যুর দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে নিজ হাতে তৈরী করা কাফনের কাপড় পরিধান করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরনের অলৌকিক ঘটনার কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউ ভবিষ্যত জানেন না। তিনি কী করে জানলেন যে তার মৃত্যু হবে তাই তিনি এডভান্স কাফন পড়ে তৈরী হলেন! এই ধরনের গল্প পড়ে সাধারণ মুসলিমরা বিভ্রান্ত হতে পারে এবং ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-র অলৌকিক কিছু পাওয়ার আছে এই ধরনের ভাবতে পারে যা অবশ্যই শিরক।

মসনবীয়ে রুমী ঃ মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী ছিলেন একজন সূফী। তার রচিত 'মসনবীয়ে রুমী' বইটি বাজারে খুবই পরিচিত যা কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয় (authentic নয়)। এটি প্রকৃত ইসলামের কোন বই নয়। এছাড়া বাজারে মারাত্মক ভুল আকীদা প্রচলিত আছে যে 'মসনবীয়ে রুমী'-কে আল-কুরআনের সাথে তুলনা করা হয়। অনেকে এমন বলেন যে, আল কুরআন যদি নাযিল না হতো তাহলে 'মসনবীয়ে রুমী' কুরআন হয়ে যেতো (নাউযুবিল্লাহ)।

আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-র রচনাবলি ঃ তিনি 'ইলমুত তাসাউফ' সম্পর্কে কয়েকটি বই লিখেন। এগুলো প্রকৃত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষণীয় কোন বই নয়। তাই এই ধরনের বই থেকে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এছাড়া তাঁর রচিত তাফসীরে আশরাফী এবং ফিকাহ গ্রন্থ বেহেস্তী জেওরও সহীহ নয়। এই বইগুলো সাধারণ মুসলিমদের মাঝে প্রচার না করাই ভাল। তবে যারা ইসলাম, কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করেন তারা comparative study-র জন্য অধ্যয়ন করতে পারেন।

মারেফুল কুরআন ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর রচনাবলীগুলো যে সমস্যা ঐ একই সমস্যা পাকিস্তানের মুফতী মুহাম্মাদ শফীর মারিফুল কুরআনেও (বাংলা অনুবাদে মাওলানা মহিউদ্দিন) কারণ উনারা সূফীপন্থি। এই তাফসীরটি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এক সময় সৌদিআরব এই কুরআন চেক না করেই হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে বাংলাদেশী হাজীদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। কোন এক সময় এর মধ্যে আকীদাগত মারাত্মক ভুল ধরা পরে, তখন সৌদিআরব এই কুরআন বিতরণ নিষিদ্ধ করে দেয়। যেমন এই তাফসীরের শুরুতেই সূরা ফাতিহার ভুল ব্যাখ্যা রয়েছে।

নেয়ামুল কুরআন ও মোকসুদুল মোমেনীন ঃ এই অজিফার বই দুটি আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত, প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরেই রয়েছে এই বই। অতি দুঃখের বিষয় যে এই বই দুটির ৯৫% তথ্যই ভুল। এমন মারাত্মক ভুল যে কোথাও কোথাও রয়েছে শিরক এবং কোথাও কোথাও বিদ'আত। তাই এটি আমাদের ঈমানি দায়িত্ব আত্মীয়-স্বজন সকলকে এই বিষয়ে অবহিত করা।

ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা অবলম্বন

মানুষ তার শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমেই তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। আবার জ্ঞান ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তার শিক্ষা দ্বারা। তাই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষা। পক্ষান্তরে অশিক্ষা-কুশিক্ষা বা ভুল শিক্ষা মানুষকে ভুলপথে পরিচালিত করে সর্বনিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়, তখন ভুল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিটিও সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে সহ্য করতে পারে না। ইসলামের উপর বাজারে অনেক বই-ই পাওয়া যায় যাতে মানুষের মধ্যে আবেগ (জজ্‌বা) সৃষ্টির জন্য এমন সব কথা তুলে ধরা হয়েছে যা সত্য নয়, যা কুরআন-হাদীসের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। অসত্য দিয়ে মানুষকে সত্যের পথে আহবান করা যায় না। তাই সরাসরি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের রেফারেন্স ছাড়া কোন ওলী, বুজুর্গ বা মুরুব্বীর বানানো কেচ্ছা-

কাহিনী মেনে নেয়া ঠিক নয়। যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। সহীহ হাদীস, জাল হাদীস, দুর্বল হাদীসের বই বাজারে পাওয়া যায়, তা যাচাই-বাছাই করে আমাদের পড়াশোনা করা উচিৎ, তা না হলে আখিরাতে হাশরের ময়দানে জবাব দেয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

কেরামত ও মজাদার গল্প-কাহিনী হতে সাবধানতা

কেরামত ও সাজানো মজাদার গল্প-কাহিনী মানুষকে বিমোহিত করে ঠিকই কিন্তু তাতে অনেক সময় সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব গল্প-কাহিনীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে মানুষ ঈমানহারা হয়না। যেহেতু ইসলাম-বিরোধী শক্তি মুসলিমগণকে কুরআন ও হাদীস দিয়েই ঘায়েল করার জন্য কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা ও অসংখ্য মিথ্যা হাদীস ও গল্প বেশী ফায়েদার লালসা দেখিয়ে মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেহেতু আমাদের প্রত্যেকের আরো বেশী সচেতন হওয়া উচিৎ। বাজারে ওলী-আওলীয়াদের নামে নানারকম কেরামত সম্বলিত গল্পের বই পাওয়া যায় যা সত্য নয় এবং তাঁদের সঠিক জীবনীর সাথে কোন সম্পর্ক নাই। আর এই ধরনের বানানো গল্প কিচ্ছা-কাহিনী বিশ্বাস করা শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের জন্যও অপমান।

ইবলিস শয়তানের পলিসি থেকে সাবধানতা

ইবলিস শয়তানের পলিসি হচ্ছে মুসলিমদেরকে কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে না দেয়া। কারণ আমি যদি কুরআন বুঝে সেই অনুযায়ী আমার জীবন চালাতে থাকি তাহলে সেখানেই ইবলিস শয়তানের ব্যর্থতা। তাই শয়তান সুকৌশলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বেছে নিয়েছে কুরআনকেই কিন্তু ভিন্ন উপায়ে।

যেমন ঃ খুব সহজে কিভাবে কিছু দু'আ-দুরূদ পড়ে জান্নাত লাভ করা যাবে, কোন দু'আ কত হাজার বার পড়লে কি হবে, কোন আয়াত জাফরান দিয়ে লিখে পেটে বেঁধে রাখলে বাচ্চা হবে, কোন দু'আ পড়ে চাল পড়া দিয়ে চোর ধরা যাবে, কোন আয়াত লিখে বালিশের নিচে রেখে ঘুমালে প্রেমিকাকে পাওয়া যাবে, কোন দুরূদ কাগজে লিখে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলে রোগ মুক্তি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আমলের কোন সহীহ দলিল কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। তাই এই ধরনের ভিত্তিহীন বই-পত্র, অজিফা এবং মানুষের বানানো দুরূদ হতে খুব সাবধান।

ইবলিস শয়তান আমাদের অনেক প্রকার সওয়াবের লোভ দেখায়, জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ দেখায়। সে বলে এই দু'আ ৪০ বার পড়লে ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ঐ দুরূদ এতোবার পড়লে ১ লক্ষ ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। এ কথা শুনে আমরা বলি 'সুবহানাল্লাহ', এর ফযীলত এতো! এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে গুনাহের প্রতি মানুষের ভয় কমিয়ে দেয়া হচ্ছে, অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তখন মানুষ মনে করে ৪-৫ টা গুনাহ করলে কি আর ক্ষতি হবে? অমুক দু'আ পড়লে তো ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়েই যাবে। এভাবে শয়তান অসচেতন লোকদেরকে লক্ষ লক্ষ সওয়াবের লোভ দেখিয়ে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

বাজারে ভিত্তিহীন দু'আ-দুরূদ ও কিচ্ছা কাহিনীর বই-পত্র এবং তার ভিত্তিহীন আমলের কিছু উদাহরণ

ভিত্তিহীন দু'আ-দুরূদের বই-পত্র ঃ নেয়ামুল কুরআন, মক্বছুদুল মোমিনীন, বেহেশতের কুঞ্জী, বেহেশতের পথ, বেহেস্তি জেওর, রুহুল কুরআন, আমালে কুরআন, আমলে নাজাত, সোলেমানী খাবনামা, নূরানী মজমুয়ায়ে পাঞ্জেগানা, নূরানী পূর্ণাঙ্গ অজিফা, তাবীজাতে রূহুল্লাহ, তাযকেরাতুল আম্বিয়া, কাসাসুল আম্বিয়া, ইউসুফী খাবনামা ও ফালনামা, ফাজায়েলে আমল ও বার চান্দের ফযীলত ইত্যাদি .....।

ভিত্তিহীন কাহিনী ঃ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.), মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.), উয়াইস কারনী (রহ.), মনসুর হাল্লাজ (রহ.) খাজা খিযির (আ.), ইমাম গাজ্জালী (রহ.), মাওলানা রূমী (রহ.), বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.), শাহজালাল (রহ.), শাহ পরাণ (রহ.), বার আউলিয়া (রহ.), তাপসী রাবেয়া বসরী (রহ.), শেখ সাদী (রহ.), বাংলাদেশের সূফী-সাধক ও অলী-আউলিয়া, কারবালায় ইয়াজিদ ও হোসাইন, আমানত শাহ (রহ.), শেখ ফরীদ (রহ.), নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.), ইউসুফ-জোলেখা ও রেশমী রুমাল ইত্যাদি .....।

ভিত্তিহীন দুরূদঃ দুরূদে হাজারী, দুরূদে লাখী, দুরূদে তাজ, দুরূদে তুনাজ্জিনা, দুরূদে শিফা, দুরূদে আকবার, দুরূদে ফতুহাত, দুরূদে নারিয়া, দুরূদে ছাইফুল্লাহ, দুরূদে যিয়ারত, দুরূদে খাইর, দুরূদে শাফেয়ী, দুরূদে মাহী, দুরূদে

রুইয়াতে নাবী, দুরূদে রূহী, দুরূদে বীর, দুরূদে গাওসীয়া, দুরূদে মুহাম্মাদী ইত্যাদি ..... ।

ভিত্তিহীন দূ'আঃ দু'আয়ে গঞ্জল আরশ, দু'আয়ে হাবীবী, দু'আয়ে কাদাহ্, দু'আয়ে জ্বামিলা, দু'আয়ে পরশমণি, আহাদ নামা ইত্যাদি ..... ।

ভিত্তিহীন খতমঃ খতমে ইউনুস, খতমে তাহ্লীল. খতমে খাজেগান, সবিনা খতম, জালালী খতম ইত্যাদি ..... ।

এই সকল বই থেকে কিছু উদ্ভট আমল ঃ

চলিশ বৎসরের গুনাহ্ মাফের দু'আ ঃ শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ সূর্য ডুবার সময় নিম্নের এই দু'আ চল্লিশবার পাঠ করিলে চল্লিশ বৎসরের ছগীরাহ গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে ।

পরীক্ষায় পাশ করার দু'আ ঃ এই দু'আটি ১০০০ বার পাঠ করিলে পরীক্ষায় পাশ করা যাইবে ।

পুত্র সন্তান লাভের দু'আ ঃ এই দু'আ গোলাপ পানি ও জাফরানের কালি দ্বারা লিখিয়া স্ত্রীর গলায় বাধিয়া দিতে হইবে এবং ৭০ বার ইয়া মাতীনু পড়িয়া আঙ্গুলি দ্বারা ঐ গর্ভবতীর পেটের উপর বৃত্তের ন্যায় গোল রেখা টানিবে, তাহা হইলেই পুত্র সন্তান লাভ হইবে ।

চাকুরী লাভের তদবীর ঃ দুরূদে নারিয়া ৪৪৪৪ বার পড়িলে নিশ্চিত চাকুরী লাভ হইবে । এই দুরূদ শরীফ পাঠে অসংখ্য রহমতের বর্ণনা রহিয়াছে ।

দোকানে বিক্রয় বেশী হওয়ার দু'আ ঃ এই দু'আ জুম্মার নামাযের পর কারো সাথে কথা না বলিয়া ৭০ বার পড়িতে হইবে । অতঃপর দু'আটি পড়িয়া গোলাপ পানিতে ফুঁ দিয়ে তাহা প্রতিদিন দোকানে ছিটাইয়া দিতে হইবে তাহা হইলে বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে ।

বসন্ত রোগ দূর করার উপায় ঃ এই আয়াতটি ৭বার পড়িয়া ৭টি চাউলের উপর ৭বার ফুঁক দিতে হইবে, অতঃপর এক একটি চাউল এক একজনকে খাইতে দিতে হইবে এবং এতে বসন্ত রোগ হইবে না ।

ডাইরিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ ঃ এই আয়াতটি ১৪শত বার পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া সবাইকে ৩দিন খাওয়াইতে হইবে অথবা প্রতিদিন ২৮০বার

আয়াতটি পড়িতে হইবে অথবা আয়াতটি ৫বার কাগজে লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া সাথে রাখিলে ডাইরিয়া দূর হইয়া যাইবে।

কারো চাকুরী নষ্ট করার তদবীর ঃ যে অন্ধকার রাত্রিতে মেঘের গর্জন হয় ও বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে, সেই রাত্রিতে নতুন বড় বাসনে সূরা রা'দ লিখিয়া বর্ষার পানিতে ধুইবে; ঐ পানি অন্ধকার রাত্রিতে ঐ ব্যক্তির ঘরের দরজায় ছিটাইয়া দিবে, ইন্‌শাআল্লাহ তার চাকুরী নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সূরার ১২ নং আয়াতে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের বর্ণনা রহিয়াছে বলিয়া মেঘের গর্জন ও বিদ্যুত চমকাইতে থাকার সময় এর আমল বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে।

মনের বাসনা ও অভাব পূরণের পরীক্ষিত তদবীর ঃ কাহারও কিছু বাসনা থাকিলে নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া স্রোতঃশীলা নদীর পানিতে ভাসাইয়া দিবে ও আয়াতটি পড়িবে ও মন-বাসনার কথা মনে করিবে তাহা হইলেই মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।

স্বামী বশীভূত করার আমল ঃ এই আয়াত কোন মিষ্টি দ্রব্যের উপর পড়িয়া ফুঁক দিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দিলে ইনশাআল্লাহ স্ত্রীর প্রতি স্বামী আকৃষ্ট হইবে।

দুই জনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করার তদবীর ঃ এই নকশার নীচে লিখিবে অমুক ও অমুকের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হউক এবং ইহা তাবিজ করিয়া পুরাতন দুই কবরের মধ্যস্থলে পুঁতিয়া রাখিলে তাহাদের মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হইবে।

ইয্‌যত ও সম্মান বৃদ্ধির আমল ঃ জাফরান ও মধু একত্রে মিশাইয়া হলুদ রঙের রেশমী কাপড়ের উপর আয়াত লিখিয়া তাবিজের মত করিবে; তৎপর মোম ও কুন্দ্রকুট একত্রে মিশাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইবে, ইহাতে যে ধুঁয়া হইবে সেই ধুঁয়া তাবিজে লাগাইবে। এই তাবীজ সঙ্গে লইয়া যেখানে যাইবে আল্লাহর ফজলে ইয্‌যত ও সম্মান লাভ করিবে।

সূরা আর-রহমানের তদবীর ঃ একটি সুতা নিতে হইবে তারপর সূরা আর-রহমান পড়িতে পড়িতে যতবার 'ফাবি...তুকাজ্জিবান' আসিবে ততবার সুতায় একটি করিয়া গিড়া দিতে হইবে, এভাবে ৩১টি গিড়া হইবে, সেই সূতা স্ত্রীর গলায় বাধিয়া দিলে গর্ভ নষ্ট হইবে না।

দোজখের দরজা বন্ধ করার তদবীর ঃ নিজ ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া এই আয়াত পড়িলে দোজখের দরজা তার জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে।

মৃত্যু ঠেকাবার তদবীর ঃ এই আয়াত মাগরিবের সময় পড়িলে মাগরিব থেকে ফযর পর্যন্ত আজরাঈল কাছে আসিতে পারিবে না আবার ফযরে পড়িলে আজরাঈল ফযর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাছে আসিতে পারিবে না ।

সতর্কতা

উপরের এই আমলগুলো উদাহরণ হিসেবে নেয়া হয়েছে মূলতঃ 'নেয়ামুল কুরআন' ও 'মক্বছুদুল মোমিনীন' বই থেকে। এই বইগুলো লিখেছেন এবং সম্পদনা করেছেন বাংলাদেশের মাদ্রাসা থেকে পাশ করা বড় বড় আলেমগণ। যারা মাদ্রাসার সাথে জড়িত আশা করি তারা আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না। আমরা যদি কারো মনে আঘাত করে থাকি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থি। এখানে মাদ্রাসায় যারা পড়াশোনা করেন তাদের তেমন দোষ নয়। আসলে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে এই সকল ভুল শিক্ষা ও ভুল তথ্য প্রচার এবং আমল হয়ে আসছে যার কারণে এই সকল শিরক ও বিদ'আতি আমলগুলো একের থেকে অন্যের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আলেমদের থেকে ছাত্ররা পাচ্ছেন এবং ছাত্ররা আলেম হওয়ার পর আবার তাদের থেকে তাদের ছাত্ররা পাচ্ছে। প্রকাশনাগুলোরও ইসলামের উপর সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তারাও দিনের পর দিন এই বইগুলো প্রকাশ এবং বিক্রি করে যাচ্ছেন ।

তাবলীগ জামাত নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

আমরা (স্বামী-স্ত্রী দু'জন) কয়েক বছর তাবলীগ জামাত নিয়মিত করেছিলাম। তাদের সাথে দাওয়াতী কাজ করেছি, তাদের বইপত্র পড়েছি এবং তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। যার কারণে তাদের আকীদা সম্পর্কে আমরা অনেকটাই অবহিত। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই তাবলীগ জামাত সংক্রান্ত কিছু বাঁধাধরা প্রশ্ন করে থাকেন। যদিও এ প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত উত্তর ইউটিউবে খুব সুন্দরভাবে রয়েছে। বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর, কারণ আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয়জন এর সাথে জড়িত ।

প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমরা যেন কেউ কাউকে ভুল না বুঝি। শুধু প্রকৃত দ্বীন বুঝার সুবিধার্থে কিছু গবেষণামুলক তথ্য এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। এছাড়া প্রকৃত দ্বীন বুঝার জন্য এবং তাবলীগের বিষয়টি বুঝার জন্য এই বইটি আগাগোড়া খুব ভালভাবে কয়েক বার পড়া দরকার। যেমন কিছু বাঁধাধরা প্রশ্ন ঃ

প্রশ্ন ১) তাবলীগ করা যাবে কি?

প্রশ্ন ২) চিল্লায় যাওয়া যাবে কি?
প্রশ্ন ৩) তাবলীগে যে সকল বইপত্র পড়া হয় তা পড়া যাবে কি?
প্রশ্ন ৪) বিশ্ব ইজতেমায় যাওয়া যাবে কি?
প্রশ্ন ৫) আখিরী মুনাজাতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের ইসলামের সহীহ আকীদা সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান থাকতে হবে, সুন্নাহ ও বিদ'আত সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানা থাকতে হবে। বিষয়টি সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করি। ইসলাম অংকের মতো স্বচ্ছ, অংকে যেমন ৫+৫=১০ হয় কখনো ৫+৫=১১ হবে না অথবা ৫+৫=৯ও হবে না। এবং হওয়ারও কোন সুযোগ নেই, হলে অংক ভুল হবে। ইসলামেও বিষয়টি ঠিক তেমনি। এখানে 'কুরআন+সহীহ হাদীস=ইসলাম'। কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা আছে ততটুকুই ইসলাম, ভাল মনে করে বা সওয়াবের কাজ মনে করে বা ইসলাম মনে করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাইরে কিছুই করা যাবে না, আর তা করলে হবে বিদ'আত। এই বইয়ের বিদ'আতের অধ্যায়ে আমরা বিদ'আত সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। বিদ'আত দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু তা যতো সুন্দরই হোক না কেন তা ইসলামের অংশ না এবং ইসলাম হিসেবে গ্রহণযোগ্য না। এবার উপরের প্রশ্নগুলোকে যদি আমরা অংকের ফর্মুলায় ফেলি তাহলে এক এক করে অংক মিলতে থাকবে। এই বইটির বর্তমান ভার্শন সংকলন করার সময় আমরা ফাজায়েল আমালসহ তাবলীগ জামাতের অন্যান্য বইগুলো ভালোমত অধ্যয়ন করেছি।

তাবলীগ জামাতের আকীদা ঃ এই জামাতে বিশ্বাস করা হয় "কোন কিছু থেকে কোন কিছু হয় না সব কিছু আল্লাহ থেকে হয়, মাখলুক কিছুই করতে পারে না"। এটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ভুল আকীদা। যে চুরি করে, জিনা করে, মানুষ খুন করে তাহলে কি এগুলো আল্লাহ কর্তৃক হয়? (নাউযুবিল্লাহ) অবশ্যই কোন অন্যায় কাজ আল্লাহ তাঁর বান্দাকে দিয়ে করান না।

প্রশ্ন ১) তাবলীগ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে সলাতের দিকে ডাকা হয়, এটি খুবই ভাল কাজ। তাবলীগ অর্থ দাওয়াত, আমাদেরকে অবশ্যই দাওয়াতের কাজ করতে হবে, তবে আল্লাহর রসূল ﷺ যেভাবে দাওয়াতী কাজ করেছেন আমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই করতে হবে। তাবলীগ জামাতের যে যে অংশগুলো সহীহ হাদীসের সাথে মিলে শুধু সেই সেই অংশটুকু করা যাবে আর

যেই যেই অংশগুলো সহীহ হাদীসের সাথে মিলে না সেই অংশটুকু অবশ্যই করা যাবে না, করলে তা হবে বিদ'আত। বিদ'আত কঠিন গুনাহের কাজ।

এখন প্রশ্ন, আমরা দাওয়াত কা'দেরকে দেব? দাওয়াতী কাজে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করবো রসূল ﷺ -এর সুন্নাহ থেকে। আমরা রসূল ﷺ -এর জীবনী পড়লে দেখতে পাই যে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন মূলতঃ অমুসলিমদেরকে। তাঁর মক্কী জীবনে সর্বপ্রথম কাফিরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, আশেপাশের অমুসলিমদেশে দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, যেমন ইথিওপিয়া, মিশর, ইরান, ইরাক, রোম, বাহরাইন, ইয়েমেন, সিরিয়া এবং ওমান। এই দেশগুলো পূর্বে অমুসলিম দেশ ছিল। আল্লাহর রসূল ﷺ -এর দাওয়াত পেয়ে পুরো দেশশুদ্ধ মুসলিম হয়ে গেছে। আমরা জানি যে রসূল ﷺ -কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন-ই মুশরিক ও অমুসলিমদের মাঝে, তিনি তার মিশন শুরু-ই করেছিলেন অমুসলিমদের মাঝে।

এছাড়া সাহাবীরা (রা.) আরবের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে বিদায় হাজ্জের সময় প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবা (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রসূল ﷺ তাদেরকে বলেছিলেন যে "আজ যারা উপস্থিত হতে পারেনি তাদের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছে দেবে।" এই এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবা যদি অমুসলিমদের নিকট না গিয়ে শুধু নিজেদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকতেন তাহলে আজ সারা বিশ্বে ২ বিলিয়ন মুসলিম হতো না। তাই আমাদের প্রথম ফরয কাজ হচ্ছে অমুসলিমদের মাঝে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।

আমরা রসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর জীবনী পড়লে দেখতে পাই যে যারা তাঁর দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মুসলিম হয়েছিলেন তাদের ঈমানকে আরো মজবুত করার জন্য রসূল ﷺ নিয়মিত তারবিয়া বা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রেখেছিলেন, তাদের তাকওয়ার লেভেল বাড়ানোর জন্য তাদেরকে নিয়মিত তাকিদ দিতেন। সাহাবা (রা.) একে অপরকে ঈমান রিনিউ (renew) করার তাকিদ দিতেন। তাই এখন অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে, এবং তার পাশাপাশি তাদের ঈমানী ক্রমোন্নতির জন্য মুসলিমদেরকেও তাকিদ দিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে non-practicing মুসলিমদের মাঝে আরো বেশী করে কাজ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা

যায় যে non-practicing মুসলিমদের অবস্থা আর অমুসলিমদের অবস্থার মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই।

আমরা যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করি তারা অবশ্যই অমুসলিমদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেব এবং যারা মুসলিম দেশে বসবাস করি সেখানেও হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ এবং নাস্তিকদের মাঝে নিয়মিত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এছাড়াও নিজ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রীবর্গ, সামরিক বাহিনী, প্রশাসন, সংসদ সদস্য, মেয়র, কমিশনার এবং দেশের বুদ্ধিজীবীগণ যদি অমুসলিম হন বা সেক্যুলার হন বা নন-প্র্যাকটিসিং মুসলিম হন তাদেরকেও সম্মানের সাথে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে।

তারা যদি কুরআন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে না থাকেন তাহলে তাদেরকে তার দাওয়াত দিতে হবে, তাদেরকে কুরআনের সঠিক বাণী পৌঁছে দিতে হবে। তাদেরকে গিফ্‌ট হিসেবে আল কুরআনের অনুবাদের কপি পাঠানো যেতে পারে। এছাড়া টিভি, পত্রিকা, ই-মেইল, ফেইসবুক এবং বিশ্ব ইজতিমার মাধ্যমেও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। কারণ রসূল ﷺ আদেশ করেছেন যে একটি আয়াতও যদি জানো তাহলে তা অপরের নিকট পৌঁছে দাও। তাবলীগ জামাতে মূলতঃ মুসলিমদের নিকট যাওয়া হয় বটে কিন্তু দাওয়াতের প্রধান কাজ অমুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দেয়া হয় না এবং দেশ যারা পরিচালনা করেন তাদেরকেও কুরআনের সঠিক বাণী তারা পৌঁছান না।

প্রশ্ন ২) চিল্লায় যাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ আমরা রসূল ﷺ -এর বিস্তারিত জীবনী যদি পড়ি তাহলে দেখবো যে তিনি বা তাঁর সাহাবাগণ (রা.) কোন দিন চিল্লায় যাননি। সহীহ হাদীসে এর কোন দলিল নেই। চিল্লা শব্দটি আরবী না এবং কুরআন-হাদীসের পরিভাষাও না। চিল্লা একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ ৪০ দিনের সময়কাল। যাহোক শব্দ কোন মূল বিষয় না, বিষয় হচ্ছে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর ২৩ বছর নবুওত জীবনে কোন দিন ৪০ দিন নির্দিষ্ট করে কোথাও দ্বীনের দাওয়াত দিতে যাননি অথবা অন্য কাউকেও পাঠাননি। তাই আমরাও এই ৪০ দিন নির্দিষ্ট করে কোন কিছু ইবাদত করতে পারবো না, এবং এটাকে একটা বাধ্যতামূলক নিয়মের মধ্যেও আনতে পারবো না। যেমন ঃ ৪০ দিনের একদিনও কম হতে পারবে না, এই

৪০ দিনের মধ্যে বাড়িতে ফেরা যাবে না, তাহলে চিল্লার ফযীলত নষ্ট হয়ে যাবে, তিন চিল্লা দিলে এটা হবে সেটা হবে ইত্যাদি ।

আবার যদি বলা হয় যে আমরা চিল্লায় যাই জ্ঞান অর্জনের জন্য । জ্ঞান অর্জনের জন্য অবশ্যই দূরে কোথাও যাওয়া যাবে কিন্তু দেখতে হবে যে এই যাওয়াটা সবদিক মিলিয়ে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত । যেমন, ঐ ৪০ দিনে আমরা কী অধ্যয়ন করছি? কী শিখছি? অধ্যয়নের বিষয়গুলো কি সহীহ? তারপর আবার চাকুরী-ব্যবসা, পরিবার-পরিজনের প্রতি ফরজ দায়িত্বে অবহেলা করে এভাবে কত দিন বা কত বার ইসলাম বাইরে যেতে অনুমতি দেয়?

চিল্লায় কেন যাবো? যদি উত্তরে বলা হয় দ্বীন শিখতে । তা হলে তো প্রশ্ন জাগে দায়িত্ব অবহেলা করে সেখানে কি সহীহ দ্বীন শেখানো হয়? উত্তর হচ্ছে ঃ অবশ্যই না । সহীহ দ্বীনের উৎস হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদীস । তাবলীগরা কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে আলোচনা করেন না । এরা সূফী ফিলোসফিতে বিশ্বাসী । ফাজায়েলে আমলের ভুমিকাতে তাবলীগ প্রথার স্রষ্টা মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেছেন, কর্মপদ্ধতিটা আমার হোক আর জ্ঞান হোক আশরাফ আলী থানবীর (রহ.) । (আশরাফ আলী থানবী (রহ.) ছিলেন একজন সূফী মতবাদের আলেম ।) লেখক ভূমিকাতে আরো লিখেছেন যে, এই কিতাব ইলিয়াস (রহ.) সাহেবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লিখা এবং বুজুর্গের সন্তুষ্টিই তাকে আখিরাতে নাজাত দিবে । ইসলামী আকীদা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কোন কাজ করা যাবে না, তা করলে তা হবে শিরক ।

প্রশ্ন ৩) তাবলীগে যে সকল বই-পত্র পড়া হয় তা পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ তাবলীগ জামাতের বইগুলোর মধ্যে যেসব অংশ কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয় তা পড়লেও, বিশ্বাস করা যাবে না অথবা আমলও করা যাবে না । এবার একটি সাধারণ প্রশ্ন এসে যায় যে, ঐ বইগুলোর মধ্যে কী তথ্য আছে এবং তার কতটুকু কুরআন ও সহীহ হাদীস নির্ভরশীল? এছাড়া ঐ বইগুলোর মধ্যে যে হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে তার কতগুলো সহীহ, জাল অথবা যঈফ (দুর্বল)? এই তথ্য যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে অন্ধভাবে যদি আমরা তা পড়ি তাহলে ইসলাম সম্পর্কে ভুল জ্ঞান অর্জন করা হবে এবং মুসলিম সমাজে ইসলামের নামে অনৈসলামী বিষয় প্রচার হবে এবং তা পালন করা হবে । এর ফলে আস্তে আস্তে বিদ'আত বাড়তে থাকবে ও প্রকৃত ইসলাম বিনষ্ট হবে ।

মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে যারা হাদীস নিয়ে গ্রাজুয়েশন বা ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছেন তাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে তাবলীগ জামাতের ঐ বইগুলোর মধ্যে ৬০% তথ্য সঠিক নয়। যার মধ্যে রয়েছে অনেক জাল হাদীস, দুর্বল হাদীস, মুরুব্বীদের বানানো কল্প-কাহিনী এবং বুজুর্গদের স্বপ্ন দেখা গল্প যা মোটেও ইসলামের অংশ নয়। এরপর যে ৪০% রয়ে গেছে তা পড়তে ও আমল করতে কোন আপত্তি নেই। তবে সাধারণ মুসলিমদের জন্য সহীহ আর জাল সনাক্ত করা কঠিন কাজ বলে ঐ ৪০% পড়াও বিপদজনক (risky).

এছাড়া এই বইগুলোর মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোন রেফারেন্স নেই। অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন এক বুজুর্গ বলেছেন বা স্বপ্নে দেখেছেন। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের কোন বিষয়ে কোন বুজুর্গের কথা রেফারেন্স হতে পারে না, রেফারেন্স হতে হবে সরাসরি কুরআন অথবা সহীহ হাদীস থেকে, জাল বা দুর্বল হাদীস হলেও হবে না।

এরপর আসি স্বপ্নের কাহিনীর কথায়। কারো দেখা কোন স্বপ্ন ইসলাম হতে পারে না কারণ এর কোন ভিত্তি নেই। নাবী-রসূল আর আসবেন না, তাদের নিকট স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী আসতো, কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট স্বপ্নের মাধ্যমে কোন ওহী আসার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের জন্য যা যা প্রয়োজন তা আল্লাহ তা'আলা শেষ নাবীর মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর মিশন পরিপূর্ণ করে গেছেন। এরপর যদি কোন বুজুর্গ দাবী করেন যে তার কাছে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামের নিয়ম-কানুন, দু'আ-দুরূদ বা কোন স্পেশাল আমল পাঠান সেটা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য অথবা গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে বুঝতে হবে যে আল্লাহর রসূল তার মিশন (দাওয়াত) পরিপূর্ণ করে যাননি, কিছু বাকী রয়ে গিয়েছিল বিধায় এখন আল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে বুজুর্গদের মাধ্যমে তা পাঠাচ্ছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

উল্লেখ্য যে এই বইগুলোতে বুজুর্গদের দেখা যে স্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তা অবাস্তব সব ঘটনা যা বিশ্বাস করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 'ফাজায়েলে আমাল' নামে তাবলীগ জামাতের মূল পাঠ্য বই তা সহীহ (authentic) না হওয়ার কারণে কোন কোন দেশে তা পড়া এবং বিক্রিও নিষিদ্ধ।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রসূল ﷺ ছাড়া আর কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা যাবে না। কোন মুরুব্বী বা বুজুর্গ যদি কুরআন ও সহীহ হাদীসের

দলিল ছাড়া কোন কথা বলেন তা অবশ্যই মানা যাবে না। ইসলামী পরিভাষায় একে বলে তাকলীদ, ইসলামে তাকলীদ (অন্ধভাবে অনুসরণ) হারাম যা আগেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরামর্শ ঃ তাবলীগ জামাতে গিয়ে কুরআনের অর্থসহ তাফসীর পড়া উচিত, সরাসরি সহীহ বুখারী-সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত।

প্রশ্ন ৪) বিশ্ব ইজতেমায় যাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ ইজতেমাটা যদি এমন হয় যে এটি একটি ইসলামী সহীহ জ্ঞান অর্জনের বা ইসলামী সহীহ জ্ঞান আদান-প্রদানের কনফারেন্স তাহলে কোন আপত্তি নেই। আর যদি সেখানে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে বয়ান দেয়া না হয়, যা ইসলামে নেই তা ইসলামের অংশ হিসেবে আলোচনা করা হয় তাহলে সেখানেই আপত্তি। আর যদি কেউ মনে করেন যে এখানে যাওয়াটা ফরয বা এখানে গিয়ে তিনদিন থাকতেই হবে এবং সেখানে অবস্থান করাটা ইসলামের একটি অংশ বা সওয়াবের কাজ তাহলে তা হবে বিদ'আত অর্থাৎ পরিষ্কার গুনাহ। এরপর আরো কিছু কথা বাজারে প্রচলিত আছে, যেমন ঃ কেউ যদি বলে যে এটা গরীবের হাজ্জ বা দ্বিতীয় হাজ্জ বা হাজ্জের পর বিশ্ব মুসলিমদের সবচেয়ে বড় জমায়েত ইত্যাদি, তাহলে তা হবে গুরুতর অপরাধ। কারণ হাজ্জের সাথে এর কোন প্রকার তুলনা করা যাবে না, তুলনা করলে তা হবে শিরক।

এবার প্রশ্ন, বিশ্ব ইজতেমায় কী হয়? মূলতঃ এখানে উর্দ্দুতে বয়ান (লেকচার) হয় যার অধিকাংশই মুসল্লিরা বুঝেন না। এছাড়া বয়ানে যা বলা হয় তা অনেকাংশে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তি নয় কারণ তাদের বয়ানের সোর্স হলো ঐ ফাজায়েলে আমাল বই। হাজার হাজার স্থানীয় মুসলিম ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, ঘর-সংসার ফেলে তিনদিন সেখানে কাটায়। আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে এই তিনদিনে ইসলামের কী কী শিখলেন তা একটু আমাদের বলবেন কি, দেখা যাবে যে সদুত্তর খুবই সামান্য। মূলতঃ সবাই সেখানে যায় সওয়াবের আশায়, তাদের ভ্রান্ত ধারণা যে সেখানে গেলেই অনেক সওয়াব! আখিরাতে মুক্তি!

প্রশ্ন ৫) আখিরী মুনাজাতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ এই ক্ষেত্রে সোজা উত্তর হচ্ছে আখিরী মুনাজাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করা যাবে না। কারণ আখিরী মুনাজাত বলতে কুরআন ও সহীহ হাদীসে কিছু

নেই, এটি দ্বীন ইসলামের মধ্যে নতুন আবিস্কার। আখির অর্থ শেষ, তার মানে সর্বশেষ মুনাজাত। কিন্তু এই মুনাজাত তো প্রতি বছর টঙ্গিতে হয়, এটি তো শেষ মুনাজাত না। এখন আবার অনেক দেশেই প্রতি বছর এই আখিরী মুনাজাত চালু হয়েছে। তাহলে কীভাবে এটা আখিরী মুনাজাত হলো?

আল্লাহর রসূল ﷺ সাহাবাদের নিয়ে কোন দিন আখিরী মুনাজাত করেননি তাই আমরাও করতে পারবো না, করলে গুনাহ হবে। সহীহ হাদীসে আছে কোথায় কোথায় হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যাবে আর কোথায় কোথায় করা যাবে না। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, অনেক লোক এক সাথে জড় হয়ে হাত তুললে আল্লাহ দু'আ কবুল করবেন। তবে এর কোন দলিল নেই এবং এক সাথে অনেক লোক হাত তুললে দু'আ কবুল হওয়ার কোন কারণও নেই।

আমরা জানি রসূল ﷺ বিদায় হাজ্জের সময় প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সাহাবাদের নিয়ে এক সাথে ভাষণ দিয়েছিলেন কিন্তু কোন মুনাজাত করেননি। আমরা দেখি যে প্রতি বছর হাজ্জের সময় আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে ৫০/৬০ লক্ষ হাজী এক সাথে মিলিত হন এবং কাবা ঘরের ইমাম সাহেব খুতবা দেন কিন্তু কোন মুনাজাত করেন না। যদি এতো লোকের দু'আ কবুল হতো তাহলে তিনি অবশ্যই সবাইকে নিয়ে ঐ দিন প্রতি বছর হাত তুলে সম্মীলিতভাবে দু'আ করতেন। মুনাজাতের বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই বইয়ের বিদ'আত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

একজন মু'মিনের দায়িত্ব কী? মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"এখন তোমরাই দুনিয়ার সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিয়ে থাক, দুস্কৃতি থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০)

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে আর অসৎকাজে বাধা দেবে, তারাই হ'ল সফলকাম।"(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব

নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা [তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে] দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। (জামে আত তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হল না, কিংবা দ্বীন প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না আর এই অবস্থায়-ই মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

উপরের দু'টি আয়াত এবং দু'টি হাদীসের নির্দেশ মত সমাজ অনাচারে ভরে যাচ্ছে তাই আমাদেরকে সেই সমাজ সংস্করণের জন্য কাজ করতে হবে। আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে হবে, বাধা দিতে হবে এবং সমাজে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটি আমাদের জন্য ফরয কাজ। আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠানোই হয়েছে সমাজের সংস্কার সাধনের জন্যে। কিন্তু তাবলীগ জামাতে মানুষকে সৎকাজের অনুরোধ করা হয় কিন্তু কোথাও অন্যায়ের বাধা দেয়া হয় না, অর্থৎ কুরআনের আয়াতের অর্ধেক মানা হয় আর অর্ধেক মানা হয় না। এছাড়া সমাজ সংস্কারের জন্য কুরআন ও তার বিধিবিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় না।

তাবলীগের মিশন হচ্ছে আকাশের উপরে এবং মাটির নীচের বিষয়গুলো নিয়ে। এর মাঝের অংশ এই পৃথিবী নিয়ে তাদের কোন বক্তব্য বা চেষ্টা নেই। তারা মনে করেন দ্বীন ও দুনিয়া দু'টি আলাদা বিষয়, দ্বীনের সাথে দুনিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এটা ভুল কারণ ইসলাম আকীদা হলো দুনিয়ার জীবন আখিরাতের জীবনেই অংশ, দুনিয়ার জীবনের কাজকর্মের প্রতিদান হিসেবে জান্নাত বা জাহান্নাম পাওয়া যাবে।

ইসলামের অর্থ কী? ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, কোন কিছু নীতি-নির্দেশকে মাথা পেতে নেয়া। পারিভাষিক অর্থে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল ﷺ প্রদর্শিত জীবন-পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং এর বিপরীত সমস্ত মত ও পথ পরিহার করে চলাকেই বলা হয় ইসলাম। মানুষের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির এটাই একমাত্র পথ। মূলতঃ মানুষ ইসলামী আদর্শ কবুলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় আর এটাই হচ্ছে কালিমা এবং শাহাদাহ। নিজের সুবিধামতো এর শুধুমাত্র কিছু অংশ মানার কোন বিধান নেই।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র প্রকৃত অর্থ কী? কালিমা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের মূলনীতিই ঘোষণা করা হয়। যে ব্যক্তি এ কালিমা কবুল করে সে আসলে দুটো

এমন নীতিকথা মেনে নেয় যা সে সারা জীবন আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী চলতে বাধ্য। 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম মানবো না- অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারো কথাই মানবো না। এটাই প্রথম নীতি।

কালিমার দ্বিতীয় অংশে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ ' কথাটিতে দ্বিতীয় নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মর্মকথা হলো, 'আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তব যে নমুনা রসূল ﷺ দেখিয়ে গেছেন একমাত্র সে নিয়মেই (তরীকা মতে) আল্লাহর হুকুম মানবো। রসূলুল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়ম গ্রহণ করবো না।'

রসূল ﷺ -এর আগমনের উদ্দেশ্য কী? দ্বীন ইসলাম কতটা ব্যাপক তা শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর বাস্তব জীবন থেকেই পরিস্কার বুঝা যায়। তিনি আল্লাহর রসূল হিসেবেই সব কাজ করতেন। মসজিদে ইমামতি করার সময় তিনি যেমন রসূল ছিলেন, মদীনার রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কাজ করার সময়ও তিনি রসূলই ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি রসূল ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যত কাজ করেছেন ও যত কথা বলেছেন তা রসূল হিসেবেই করেছেন ও বলেছেন। ধর্মীয় বিষয়ে যেমন তিনি রসূল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি বিষয়েও রসূল হিসেবেই সবকিছু করেছেন। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোটা জীবনটাই ইসলামী জীবন এবং আল্লাহর দ্বীন বা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ রসূলের জীবন যতটা ব্যাপক দ্বীন ইসলামও ততটা ব্যাপক।

শুধু কিছু নির্দিষ্ট ইবাদত বিষয়ে রসূলকে মেনে চললেই ইসলামী জীবন গড়ে উঠে না। রসূলকে সব অবস্থায় এবং সব বিষয়ে পূর্ণরূপে মেনে চলাটাই মুসলিম জীবনের কর্তব্য।

মুসলিম হবার দাবীদার হয়েও যারা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে রসূলকে আদর্শ নেতা মেনে চলে কিন্তু রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ব্যাপারে রসূলের বিপরীত নীতি ও চরিত্রের লোকদের নেতা মানে, তারা কালিমার বিপরীত কাজই করে। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, পাক্কা দ্বীনদার হিসেবে সমাজে পরিচিত এক শ্রেণীর লোকও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মত (secularist-দের) কথা বলে। তারা নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, তাসবীহ, তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের আনুগত্য করছেন। কিন্তু আইন-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, দেশ

শাসন ইত্যাদি ব্যাপারে আল্লাহর কুরআন ও রসূল ﷺ -এর সুন্নাতকে মানার কোন প্রয়োজন আছে বলে তারা মনেই করেন না।

আকিমুদদ্বীন কী? আল্লাহ যেমন কুরআনে বার বার বলেছেন 'আকিমুস সলাহ' অর্থাৎ নামায কায়েম কর, তেমনি তিনি আল কুরআনে বহুবার বলেছেন 'আকিমুদদ্বীন' (দ্বীন কায়েম কর)। অর্থাৎ 'আকিমুদদ্বীন' অর্থ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ বিধি-বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের বাধা বা অন্তরায় না থাকা। আল্লাহ বলেছেন ঃ

"তিনি তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ-কে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরহীম, মূসা ও ঈসা-কে, এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না।" (সূরা আশ শূরা ঃ ১৩)

আমাদের দেশে দ্বীন ইসলামের অবস্থা কী? যেখানে দ্বীনে বাতিল (মিথ্যা) বা ইসলাম-বিরোধী দ্বীন প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে দ্বীনে হকের (সত্য) বা ইসলামী দ্বীনের অবস্থা কিরূপ হওয়া স্বাভাবিক? দ্বীনে হক সেখানে দ্বীনে বাতিলেরই অধীনে রয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনে হক বাংলাদেশে ততটুকুই বেঁচে আছে যতটুকু দ্বীনে বাতিল অনুমতি দিয়েছে। দ্বীনে হকের ততখানি অংশ চালু আছে যতটুকুতে দ্বীনে বাতিলের আপত্তি নেই। অর্থাৎ ইসলাম এদেশে ঐ পরিমাণেই টিকে আছে যেটুকুতে ইসলাম বিরোধী শক্তি অনুমতি দিচ্ছে।

বাতিল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ইসলামকে কখনও সহ্য করতে রাযী হতে পারে না। বাতিল সমাজের কর্তারা ইসলামের ততটুকু অংশকেই সহ্য করে যতটুকু দ্বীনে বাতিলের কোন ক্ষতি না হয়। বাংলাদেশে ইসলামের যেসব খিদমত হচ্ছে তাতে বাতিল যদি শংকিত হতো তাহলে এসবকে সহ্য করতো না। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগ দ্বারা বাতিল সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত হবার কোনো ভয় নেই বলেই এসব ইসলামী কাজ বাঁধাপ্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ বাতিলের পক্ষ থেকে আপত্তি নেই বলেই এগুলো টিকে আছে। বাতিলের সাথে এগুলোর সাংঘর্ষিক নয়।

আকিমুদ্দিনের দায়িত্ব কার? দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব কার? আল্লাহ তা'আলা এ দায়িত্ব দিয়েই রসূল ﷺ কে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এ দায়িত্ব কি

শুধু রসূলেরই? রসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তারা কি শুধু সলাত, সিয়াম ও অন্যান্য কতক ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করাকেই নাজাতের (মুক্তির) জন্য যথেষ্ট মনে করতেন? না এই দায়িত্ব আমাদের সবার?

তাগুত কী? তাগুত বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শক্তিকে বুঝায় যে নিজে আল্লাহর আইন মানে না এবং অপরকেও তা না মানতে বাধ্য করে। তাগুত অর্থ হলো আল্লাহর-বিরোধী শক্তি বা ইসলাম-বিরোধী শক্তি। কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে মাত্র কিন্তু তাগুত মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করে। ফিরাউন এমনি ধরনের তাগুত ছিল।

হক ও বাতিলের (সত্য ও মিথ্যার) সংঘর্ষ হয় কেন? দুনিয়াতে যত নাবী ও রসূল এসেছেন তাঁদের সবাই দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বই পালন করে গেছেন। যে দেশে দ্বীনের হক প্রতিষ্ঠিত ছিল না সেখানে অবশ্যই বাতিল প্রতিষ্ঠিত ছিল। হক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা আসাই স্বাভাবিক। কারণ হক ও বাতিল একই সাথে চালু থাকতে পারে না। আলো ও অন্ধকারের সহঅবস্থান অসম্ভব। তাই যখনই কোন নাবী হকের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই বাতিল বাধা দিয়েছে।

তেমনিভাবে তাবলীগ জামায়াত দ্বীনের এক মহান খিদমতের কাজ করে যাচ্ছে। এ জামায়াত সারা দুনিয়াই বিপুল সংখ্যক লোককে আল্লাহ, রসূল ও আখিরাতমুখী বানাচ্ছে। এ জামায়াতের কেন্দ্র ভারতের দিল্লীতে অবস্থিত। এ বিশ্ব জামায়াতের আমীরও ভারতের নাগরিক। কিন্তু এ জামায়াতকে কোন বাতিল শক্তিই তাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করে না। এমন কি এ মহান জামায়াতের উসিলায় কমিউনিষ্ট দেশেও কালিমা-সলাতের দাওয়াত এবং আল্লাহ, রসূল ও আখিরাতের দাওয়াত পৌঁছতে পারছে-এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু তাবলীগের দ্বারা যত বড় দ্বীনি খেদমতই হোক, এ জামায়াতের দাওয়াত ও কর্মসূচীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক পরিকল্পনা নেই।

কেউ কেউ তাবলীগ জামায়াতের কাজকে হুবহু রসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিচালিত মিশন বলে প্রচার করে থাকেন। দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার যে কঠিন ও সংগ্রামপূর্ণ আন্দোলন আল্লাহর রসূল ﷺ পরিচালনা করেছিলেন এবং যে কর্মসূচী নিয়ে তিনি বাস্তবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ঠিক সে আন্দোলনের কর্মসূচীই যদি তাবলীগ জামায়াত গ্রহণ করতো তাহলে বিনা বাধায় এবং

বাতিলের সাথে কোন সংঘর্ষ ছাড়াই এভাবে সব দেশে কাজ করার সুযোগ পেতো না। আল্লাহর রসূল ﷺ ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত মক্কাবাসীর নিকট খুবই প্রিয় পাত্র ছিলেন, তাকে সবাই আল-আমীন বলে ডাকতো। কিন্তু যখনই তিনি 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র দাওয়াত দিলেন সাথে সাথে বাধা আসলো। যারা তাকে এই ৪০ বৎসর যাবত ভালোবাসতো তারা চিরশত্রু হয়ে গেল, তাঁর উপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হয়ে গেল।

আল্লাহর রসূল ﷺ যখনই কালিমার দাওয়াত দিলেন সাথে সাথে প্রভাবশালী মহল ক্ষেপে গেল। আর ঐ একই কালিমার দাওয়াত তাবলীগ ভাইয়েরাও দিচ্ছেন কিন্তু কেউ ক্ষেপছেন না, কারো মধ্যে কোন reaction বা বিরূপ প্রকিক্রিয়া হচ্ছে না। এর কারণ কী? এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে যিনি কালিমার দাওয়াত দিচ্ছেন আর যিনি দাওয়াত পাচ্ছেন দুই পক্ষই এর প্রকৃত মর্ম বুঝেন না, তাই বলে কারো মধ্যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না।

বুঝার সুবিধার্থে একটি বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক। ফীযীলালিল কুরআনের তাফসীরকারক মিশরের বিশিষ্ট স্কলার সাইয়েদ কুতুবকে তৎকালীন সরকার ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার অপরাধে দীর্ঘ দিন কারাবন্দী রাখার পর ফাঁসির আদেশ দিলেন। ফাঁসি কার্যকরের ঠিক আগ মুহূর্তে জেলখানার ইমাম সাহেব তার কাছে আসলেন তাকে কালিমা পড়ানোর জন্য। এখানেই মূল শিক্ষণীয় বিষয়। একজন কালিমা প্রতিষ্ঠার জন্য ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে যাচ্ছেন আর একজন এসেছেন তাকে কালিমা পড়ানোর জন্য। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কালিমা বুঝার ক্ষেত্রে কতো পার্থক্য! একজন কালিমা পড়া নিয়ে ব্যস্ত আরেকজন কালিমা প্রতিষ্ঠা নিয়ে ব্যস্ত।

ভুল ধারণা ঃ অনেকের এ ধারণাও হতে পারে যে, তাবলীগ জামায়াত এমন সুন্দর কায়দায় দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে যে, ইসলামের শত্রুরা টেরই পাচ্ছে না। এমন চমৎকার হিকমতের সাথে কাজ করা হচ্ছে যে, ইসলাম বিরোধীরা বাধা দেয়ার কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছে না। আল্লাহ কি তাঁর নাবীদেরকে এমন হিকমত শেখাতে পারলেন না, যাতে তারা তাবলীগ জামাতের মতো বিনা বাধায় কাজ করতে পারেন? নাবীগণ কি তাহলে এত যুলুম অত্যাচার অনর্থকই সহ্য করলেন?

ঠিক একই কারণে পীরসাহেবানদের ওরস শরীফ, মাযার, দরগা, খান্‌কা, মোরাকাবা, হালাকা যিকির ও মাহফিলের লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের সমাবেশকে

বাতিল শক্তি ভয় পায় না। এসব মাহফিলে ওয়ায, তালকীন ও যিকর-এর মারফতে ইসলামের নামে এটা-সেটা হচ্ছে। কিন্তু সেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক কোন কর্মসূচী না থাকায় ইসলাম বিরোধী মহল তাদেরকে নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক দ্বীন বুঝার তৌফিক দিন, আমীন।

তাবলীগের বইগুলো থেকে কিছু অবাস্তব এবং মিথ্যা কিচ্ছার উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো

আজগুবি গল্প ১ ঃ কোন এক বুজুর্গ প্রতি বছর মক্কায় হাজ্জ করতে যান। এক বছর তিনি হাজ্জ করতে যেতে পারেননি। ঐ বছর ঐ বুজুর্গকে হাজ্জ করানোর জন্য কাবা নিজে তার কাছে তার বাড়িতে চলে এসেছে। (নাউযুবিল্লাহ)। গল্পের খাতিরে যদি মনে করি কাবা তার বাড়িতেও চলে এসেছে তাহলেও হাজ্জ হবে না। কারণ হাজ্জের মূল কাজতো মিনা, আরাফা, মুজদালিফা, কুরবানী এবং জামারায় পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে। তাহলে এদের সবাইকে ঐ বুজুর্গের বাড়িতে আসতে হবে। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে হাজ্জ।

আজগুবি গল্প ২ ঃ তাবলীগের একটি জামাত নৌকা করে সাগর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সাগরের মাঝে প্রচন্ড ঝড় উঠলো, নৌকা ডুবে যায় যায় অবস্থা। তাদের মধ্যে ছিলেন এক বুজুর্গ, তিনি তখন ঘুমিয়ে গেলেন এবং স্বপ্নে দেখলেন তাকে রসূল ﷺ একটা দুরূদ শিখিয়ে দিয়ে বলছেন, এই দুরূদ পড় তাহলেই ঝড় থেমে যাবে। বুজুর্গ ঘুম থেকে জেগে ঐ দুরূদটি পড়লেন এবং ঝড় থেমে গেল !! (নাউযুবিল্লাহ) এখন প্রশ্ন ঐ রকম ঝড়ের মাঝে নৌকা ডুবু ডুবু অবস্থায় বুজুর্গ ঘুমালেন কীভাবে আর স্বপ্নও বা দেখলেন কীভাবে। এছাড়া ইসলামে তো স্বপ্নের মাধ্যমে কোন দূরূদ নাযিলও হয় না। যা আসার আল্লাহর রসূলের মাধ্যমে এসে গেছে। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে দুরূদ।

আজগুবি গল্প ৩ ঃ কোন এক প্রতাপশালী অত্যাচারী অমুসলিম বাদশাহ মুসলিমদের হাতে যুদ্ধে বন্দি হয়। মুসলিমরা তাকে একটি বড় ডেগের মধ্যে ভরে আগুনে জাল দিতে থাকে। তখন ঐ বাদশাহ দেব-দেবীকে ডাকতে থাকলো, যখন কাজ হলো না তখন সে কালিমা পড়তে লাগলো। তার এই ইখলাসের বদৌলতে বৃষ্টি আরম্ভ হলো এবং আগুন নিভে গেল। তারপর ঘুর্ণিঝড় এসে তার ডেগসহ উড়িয়ে অন্য এক অমুসলিম দেশে নিয়ে ফেলল। তখনও সে ঐ কালিমা পড়তে ছিল। তার নিকট ঐ দেশের জনগণ উপস্থিত হলে সে ঘটনা

খুলে বলল এবং তা শুনে সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো!! রেফারেন্স ঃ তাবলিগী নেসাব।

আজগুবি গল্প ৪ ঃ শেখ আবদুল ওয়াহেদ একজন সূফী ছিলেন। তিনি বলেন, একদা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমি তসবিহ পড়তে পারলাম না। স্বপ্নে আমি দেখি সবুজ রংয়ের রেশমী জামা পরা এক পরমা সুন্দরী বালিকা। আপাদমস্তক তার তসবিহ পাঠে রত। সে আমাকে বলল, আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা কর, আমিও তোমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টায় আছি। অতঃপর সে কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা আবৃত্তি করল। তারপর তিনি ঘুম থেকে জেগে কসম করলেন যে, জীবনে আর কখনো ঘুমাবেন না। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে নামায।

আজগুবি গল্প ৫ ঃ এক সৈয়দ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে তিনি বারদিন পর্যন্ত একই ওযূতে সমস্ত নামায আদায় করেছিলেন এবং ক্রমাগত পনের বৎসর যাবৎ ঘুমানোর সুযোগ পাননি। কিছু না খেয়ে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে যেত। সাধক পুরুষের জীবনে এরূপ অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। রেফারেন্স ঃ ফজায়েলে নামায।

আজগুবি গল্প ৬ ঃ ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব (রহ.) পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এবং আবুল তামের (রহ.) চল্লিশ বৎসর যাবৎ একই ওযূ দ্বারা ইশা ও ফযরের সলাত আদায় করেছেন। আবার ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি নাকি ত্রিশ অথবা চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ইশার ওযূ দ্বারা ফযর পড়েছেন। রেফারেন্স ঃ তাবলীগি নেসাব।

আজগুবি গল্প ৭ ঃ দালায়েলুল খাইরাত কিতাবের লেখক ওযূ করার জন্য এক কূপ হতে পানি উঠানোর জন্য পেরেশান ছিলেন। এক বালিকা কূপে থুথু ফেললে পানি নাগালের মধ্যে এলো। মেয়েটি নাকি দুরূদ পড়ে কুয়ায় থুথু ফেলেছিল। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে দুরূদ।

আজগুবি গল্প ৮ ঃ কোন বেনামী বুজুর্গের মুরীদের মৃত্যু হলে ঐ বুজুর্গ লোক মুরীদের গোসল দেয়ার সময় সে (মৃত ব্যক্তি) বুজুর্গের আঙ্গুল টেনে ধরেন। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে সাদাকাত।

আজগুবি গল্প ৯ ঃ শায়খ আবু ইয়াকুব সুনুমীর এক মুরীদ এসে বললো, সে আগামীকাল মারা যাবে। সত্যি সত্যি সে পরের দিন যোহরের নামাযের পর মারা গেল। তাকে কাফনের পর কবরে রাখার সময় সে বলে উঠলো, আমি জীবিত। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে সাদাকাত।

আজগুবি গল্প ১০ ঃ ইবনে জাওবা নামীয় কোন এক বুজুর্গ লোক বলেন, তার মায়ের মৃত্যুর পর গোসল দেয়ার জন্য তাকে খাটিয়াতে রাখলে তিনি হাসতে থাকেন। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে সাদাকাত।

আজগুবি গল্প ১১ ঃ হাসান বিন হাই বলেন, আমার ভাই আলী (রহ.)-র যখন মৃত্যু হলো তখন তিনি আমাকে আওয়াজ দিয়ে পানি চাইলেন। আমি সেই সময় সলাতে রত ছিলাম। সলাত শেষ করে তার কাছে পানি নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, এই মাত্র জিবরাঈল (আ.) পানি নিয়ে এসে আমাকে পান করিয়ে যান। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে সাদাকাত।

আজগুবি গল্প ১২ ঃ এক ব্যক্তি বড় পাপি ছিল, সে একমাত্র সূরায় সিজদা পড়তো, এই সূরা আল্লাহর কাছে তার জন্য সুপারিশ করল, তার সুপারিশ কবুল হলো। তার প্রত্যেকটি পাপের বিনিময়ে একটি করে নেকী লিখা হলো। এই সূরা নাকি আল্লাহর দরবারে ঝগড়া করে বলে, হে আল্লাহ, আমার পড়নেওয়ালাকে ক্ষমা করো নতুবা তোমার কিতাব হতে আমাকে মুছে দাও। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে কুরআন।

আজগুবি গল্প ১৩ ঃ একদিন আতা (রা.) বাজারে গিয়ে একটি মেয়ে পাগল দাসী কিনে নিয়ে আসলেন। গভীর রাতে সে ঘুম থেকে উঠে সলাত আদায় করছে এবং এমন কান্না করছে যে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হলো। তারপর সে মুনাজাতে বলল, হে আল্লাহ! তুমি যে আমাকে ভালবাস তার কসম দিয়ে বলছি তুমি আমাকে করুণা কর। আতা (রা.) এ কথা শুনে বললেন, হে দাসী! তুমি এভাবে না বলে এভাবে বল.....। এ কথা শুনে দাসী খুবই রাগান্বিত হলো এবং উপুড় হয়ে পরে গেল তারপর বলতে লাগলো অন্তর পুড়ে যাচ্ছে, প্রেমের জ্বালায় যে অস্থির সে কিভাবে সান্তনা লাভ করবে? তারপর সে বলল, হে আল্লাহ! আমার ও তোমার ব্যাপারটি এ যাবত গোপন ছিল, আজ তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কাজেই তুমি আমাকে উঠিয়ে নাও, এই বলে সে সজোরে চিৎকার করে উঠল এবং প্রাণ ত্যাগ করল। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে যিকির।

আজগুবি গল্প ১৪ ঃ করতবী (রহ.) বলেন, আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি ৭০ হাজার বার কালেমা পড়বে সে জাহান্নাম হতে নাজাত পাবে। এ কথা শুনে আমি আমার জন্য ৭০ হাজার বার এবং আমার স্ত্রীর জন্য ৭০ হাজার বার পড়ে পরকালে ধন সংগ্রহ করি। আমাদের নিকট এক যুবক কাশ্‌ফওয়ালা বলে খ্যাত ছিল। সে নাকি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পেত। এক সময় ঐ যুবক চিৎকার করে বলে

উঠলো আমার মা জাহান্নামে জ্বলছে। আমি তখন মনে মনে ৭০ হাজার বার কালেমা পড়ে তার মার জন্য বখশে দিলাম এবং আমার এই খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। হঠাৎ ঐ যুবক বলে উঠল, চাচা, আমার মা জাহান্নামের আযাব হতে নাজাত পেয়েছে। রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে যিকির।

আজগুবি গল্প ১৫ ঃ জনৈক বুজুর্গ লোক তিনি প্রতিদিন এক হাজার রাকআত দাঁড়িয়ে এবং এক হাজার রাকআত বসে সলাত আদায় করতেন!! রেফারেন্স ঃ ফাজায়েলে সাদাকাত। গল্পটি আমরা অংক করে বুঝার চেষ্টা করি।

ঐকিক নিয়ম,
যদি ১ রাকআত সলাত আদায় করতে সময় লাগে = ১ মিনিট
২০০০ রাকআত সলাত আদায় করতে সময় লাগে = ২০০০ মিনিট

তাহলে,
৬০ মিনিটে ১ ঘন্টা এবং ২৪ ঘন্টায় ১ দিন
২০০০ মিনিট $\frac{০}{০}$ ৬০ মিনিট = ৩৩ ঘন্টা ২০ মিনিট

আমরা জানি এক দিনে ২৪ ঘন্টা কিন্তু এই বুজুর্গ সলাত আদায় করেন ৩৩ ঘন্টা। তিনি দিনের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাত, ওযূ, গোসল, পায়খানা-প্রশ্রাব, খাওয়া-দাওয়া, বাজার-সদাই, আয়-রোজগার এবং পবিরারের অন্যান্য কাজই বা কখন করতেন ??

আমরা গোল হয়ে বসে এই সকল আজগুবি গল্প খুব মনযোগ দিয়ে শুনি আর বলি আলহামদুলিল্লাহ!!! ইসলাম কোন আজগুবি গল্প নির্ভরশীল ধর্ম নয়, এখানে যা আছে সব বাস্তব জীবন ধর্মী। মানুষের বানানো কিচ্ছা-কাহিনী বা কারো স্বপ্নে দেখা গল্প ইসলাম হতে পারে না।

বিশেষ অনুরোধ ঃ উপরের আলোচনা থেকে কেউ যেন মনে কোন কষ্ট না নেই। কারণ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আজ থেকে পড়াশোনা শুরু করি তা হলে দেখবো ধীরে ধীরে সব কিছু পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। যেমন, যে সারা জীবন শুধু লবণ খেয়েছে কিন্তু কোন দিন চিনি খায়নি তার কাছে চিনি দেখলেও মনে হবে লবণ। যতক্ষণ পর্যন্ত সে চিনি না খাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝবে না যে চিনি দেখতে লবণের মতো কিন্তু তা মিষ্টি, লবণের ঠিক উল্টো। তাই আমাদের উচিত হবে এ পর্যন্ত যা জানি তা একদিকে রেখে দিয়ে জ্ঞানের দরজা খুলে দিয়ে নিয়মিত অধ্যয়ন করা এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া।

৮

তরিকত

প্রথমেই কিছু প্রশ্ন

১) কুরআন এবং সুন্নাহর বাইরে আবার এতো তরিকা কেন? রসূল ﷺ -এর সময় তো কোন তরিকা ছিল না ।

২) তরিকতপন্থীরা বলেন ঃ পীর ধরা ফরয এবং যার পীর নাই শয়তানই তার পীর! এই ধরনের কথার উৎস কী?

৩) নাবী ﷺ, সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং অন্যান্য ইমামগণের সময় তো কোন পীর ছিল না? এখন এতো পীর কেন?

৪) পীর প্রথা কবে থেকে চালু হলো? পীর বলতে তো কুরআন-হাদীসে এবং আরবীতে কোন শব্দই নেই!

৫) ইসলামে কি সূফীজমের অস্তিত্ব আছে? এর ইতিহাস কী?

৬) পীরসাহেবরা কিভাবে মোরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত চলে যান? কোন সাহাবা (রা.) তো এরকম আল্লাহর আরশ পর্যন্ত যেতে পারেননি ।

৭) পীরসাহেবরা কিভাবে মুরীদদের ভাল বা মন্দ করতে পারেন? মহান আল্লাহ বলেন -"বান্দার ভাল বা মন্দ একমাত্র তিনিই করেন" ।

৮) পীরসাহেবরা কিভাবে মুরীদদের খবর জানেন? অর্থাৎ কিভাবে গায়েব জানেন? কিন্তু আল্লাহ বলেন "একমাত্র আমিই গায়েবের খবর রাখি" । *(সূরা হাশর আয়াত ২২ এবং সূরা তাগাবুন আয়াত ১৮)*

৯) পীরসাহেবরা কিভাবে রসূল ﷺ -এর সাথে নিয়মিত মিটিং করেন? এবং দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করেন? তার মানে কি

কুরআন এবং দ্বীন ইসলাম আল্লাহর রসূল ﷺ পরিপূর্ণ করে যান নাই! *(সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত দেখি)।*

১০) পীরসাহেবরা কিভাবে মৃত মানুষের সাথে যোগাযোগ করেন? যেমন ঃ আব্দুল কাদের জিলানী, মইনুদ্দিন চিশতী ইত্যাদি। এটা কি কুরআনের বাইরে নয়?

১১) অনেক পীরসাহেবরা বলেন যে রসূল ﷺ তাদেরকে স্বপ্নে ওমুক ওমুক দুরূদ শিখিয়ে দিয়েছেন। রসূল ﷺ কেনইবা শুধুমাত্র কিছু পীরসাহেবদেরকে স্পেশাল দুরূদ দিচ্ছেন?

১২) পীরসাহেব কিভাবে আখিরাতের ময়দানে এবং কবরে মুরীদকে পার করবেন? ঐদিন তার নিজের অবস্থা-ই বা কী হবে? কে জানে!

১৩) পীরসাহেবের নিজের অবস্থা আখিরাতের ময়দানে বা কবরে কী হবে তা তিনি কিভাবে জানেন? পীরসাহেবকে কে-ই বা অগ্রিম জান্নাতের সার্টিফিকেট দিল?

১৪) যিকর করলে ক্বলব পরিস্কার হয় কিভাবে? যেমন মুখে মুখে বললাম একটা আর ঠিক মতো কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আমল করলাম না, তাহলে এই পরিষ্কারের অর্থ কি?

১৫) পর্দা সকলের জন্য ফরয, কিন্তু পীরসাহেবদের সামনে মহিলারা কিভাবে যান এবং পীরসাহেব কিভাবে মহিলাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দু'আ করেন এবং কিভাবে মহিলারা পীরসাহেবদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেন?

১৬) পীরসাহেবরা কেন মুরীদদেরকে সরাসরি অর্থসহ কুরআনের তাফসীর ও সহীহ্ হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জন করতে উপদেশ/উৎসাহ দেন না?

১৭) পীর কেবলা বা পীরের দিকে মুখ ফিরালাম এর মানে কি? মুখ তো ফিরাতে হবে শুধু মহান আল্লাহ তা'আলার দিকে, ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। *(ইন্নি ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি . . . . . মুশরিকীন। সূরা আনআম ঃ ৭৯)*

১৮) কোন বিপদে-আপদে পড়লে পীর কেবলাকে স্মরণ করতে বলা হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ বলছেন বিপদে একমাত্র আল্লাহকে স্মরণ করতে। কেন এই দুই মত?

১৯) পীরের পেছনে বসে ১ ঘন্টা মোরাকাবা করা ৬০ বছরের নফল ইবাদতের সমান এই কথার দলিল কী? এটা কি কুরআনে আছে না হাদীসের কোথাও আছে?

২০) ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-এর বইগুলোর মধ্যে প্রচুর জাল ও দুর্বল হাদীস দিয়ে ভরপুর, এটা কেন? ইমাম গাজ্জালী নিশ্চয় এইসব জাল ও দুর্বল হাদীসের উপর আমল করেন নাই, হয়তো কেউ চক্রান্ত করে তার বইয়ের ভিতর এগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে।

২১) সূফীজম, তরিকত, মারিফত এবং হাকিকতের উপর বিভিন্ন বই জাল এবং দুর্বল হাদীস দিয়ে লিখা, এগুলোতে কুরআনের রেফারেন্স খুব কম, এছাড়া বিভিন্ন বানানো কেচ্ছা-কাহিনীতে এই বইগুলো ভরপুর। কেন?

২২) পীরসাহেবরা কেন প্রতি বছর হাজ্জে যান? হাজ্জ তো জীবনে একবার ফরয, ঐ টাকাটা তো তারা দেশের অসহায় মানুষদের কষ্ট দূর করার কাজে খরচ করতে পারেন! আর এই কাজ করা তো ফরয।

২৩) মুরীদদের হারাম ইনকামের টাকা কেন পীরসাহেবরা বাছবিচার না করে গ্রহণ করেন? এছাড়া মুরীদরা বিদেশ থেকে অবৈধ উপায়ে হুন্ডির মাধ্যমে হুজুর কিবলার নিকট লাখ-লাখ টাকা পাঠান। এবং সেসব তাঁরা কেন গ্রহণও করেন?

২৪) পীরসাহেবরা তো কোটি কোটি টাকা আয় করেন কিন্তু সরকারকে কেন ইনকাম ট্যাক্স দেন না? ইনকাম ট্যাক্স তো সরকারের হক এবং অন্যের হক নষ্ট করা জায়িয নেই।

২৫) শবেবরাত, মিলাদ মাহফিল ও ঈদে-মিলাদুন্নবী পরিষ্কার বিদ'আত হওয়া সত্ত্বেও কেন পীরসাহেবরা তা পালন করেন? এর ইতিহাস তাঁরা কেন পড়েন না?

২৬) পীরসাহেবরা মুরীদদের দিয়ে কুরঅনের বিপরীত নানারকম শিরকী কাজ-কারবার করাচ্ছেন! তারা কি কুরআন পরেন না?

২৭) শিক্ষিত মুরীদরা কিভাবে পীরের পাল্লায় পরে নানারকম শিরকী কাজ-কারবার করছেন?

২৮) সব পীরের আড্ডা শুধু ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে কেন? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি পীরদের প্রয়োজন নেই? যেমন ঃ আমেরিকা,

ক্যানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি দেশে তো কোন পীরের কারবার নাই।

২৯) আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি দেশে যদি পীর না থাকেন তাহলে এই দেশবাসীর কী হবে? তারা কিভাবে জান্নাতের রাস্তা পাবেন?

চার তরিকার রহস্য

তরিকা মানে পন্থা। তরিকতের ভাইয়েরা যে চার তরিকার কথা বলে থাকেন আমরা কি ঐ চারজন স্কলারের সঠিক জীবন ইতিহাস জানি? আসুন আমরা এই চারজনের বিস্তারিত জীবনী সম্পর্কে authentic source থেকে জানার চেষ্টা করি। যেমন ঃ

১) আব্দুর কাদের জিলানি (রহ.) [১০৭৭ - ১১৬৬ খৃষ্টাব্দ]
২) মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) [১১৪২ - ১২৩৬ খৃষ্টাব্দ]
৩) খাজা বাহাউদ্দীন নাক্শবন্দ (রহ.) [১৩১৭ - ১৩৯০ খৃষ্টাব্দ]
৪) শেইখ আহমাদ সিরহিন্দি (রহ.) [১৫৬৩ - ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ] - তাঁর উপাধি ছিল মুজাদ্দেদে আল্ফে সানী।

আমাদের খুবই সচেতন থাকা উচিত যে, এই চারজন ইসলামিক স্কলার সম্পর্কে বাজারে অনেক বই-ই পাওয়া যায়, যার বেশীরভাগই বানানো গাঁজাখোরী কিচ্ছা-কাহিনী দিয়ে ভরপুর, যার কোন সঠিক ভিত্তি নেই, দলিল নেই। এই চারজন তাঁদের জীবনে যা করেন নাই তা রং মাখিয়ে বানিয়ে বানিয়ে তাঁদের জীবনীতে ঢুকানো হয়েছে; অথচ তাঁরা সত্যিকারভাবে ইসলামের জন্য যা করে গেছেন তা ঐসকল বইতে অনুপস্থিত। এই চারজনই ছিলেন ইসলামের একেকজন সৈনিক। তাঁরা এই দুনিয়ার বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আগাগোড়া সংগ্রাম করে গেছেন, জিহাদ করে গেছেন। তাঁরা এসেছিলেন মানুষকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত করতে।

কিন্তু আজ অতি দুঃখের বিষয় যে তাঁদের মৃত্যুর পর এক শ্রেণীর ভ্রান্ত পথের মানুষ সঠিক জ্ঞানের অভাবে তাঁদের কবরকে বানিয়েছে পূজার দরগা, শিরকের দরগা। তাদের নামে ইবাদতের ছলে করছে প্রকাশ্য শিরক ও বিদ'আত। এই চার জনের নামে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি চালু করেছে বিভিন্ন তরিকা, যেমন, কাদেরীয়া তরিকা, চিশতিয়া তরিকা ইত্যাদি যা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী।

আমরা কি তাঁদের সঠিক ইতিহাস জানি যে এই সকল তরিকা তাঁরা নিজেরা তাঁদের নামে সৃষ্টি করে গেছেন কি না? নাকি তাঁদের মৃত্যুর পর কিছু অতি উৎসাহী লোক তা এই চার জনের নামে সৃষ্টি করেছেন? কারণ এই চার তরিকার কথা কুরআনের কোথাও নেই, হাদীসের কোথাও নেই, রসূল ﷺ -এর জমানায় নেই, সাহাবীদের জমানায় নেই, তাবীঈনদের জমানায় নেই, তাবে-তাবীঈনদের জমানায় নেই। আর থাকবেই বা কিভাবে? কারণ এই চারজন জন্মগ্রহণ করেছেন ঐসকল জমানার অনেক পরে। এই "চার তরিকা" দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। সূফীজমে মোট ১২৬টি তরিকা রয়েছে, তার মধ্যে এই ৪ তরিকা বেশী প্রসিদ্ধ। অনেক পীরসাহেব বলেন, এই ১২৬ তারিকার মধ্যে কাদেরীয়া তরিকা এবং চিশতিয়া তরিকার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া সহজ তাই তারা এই দুই তরিকা অনুসরণ করেন। (নাউযুবিল্লাহ)

রসূল ﷺ বলেছেন

- দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টটা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টটার পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)
- আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে কোন নতুন পদ্ধতি আনলো যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

তরিকতের ভাইয়েরা, আসুন আমরা পড়াশোনা করি। শুধু একধরনের বই না পড়ি। আমাদের পীরসাহেবের দেয়া প্রেসক্রিপশনের বাইরেও কিছু পড়াশোনা করি। ভয়ের কিছু নেই, পীরসাহেব তার নিজের জায়গায়ই থাকবেন। আমি যদি আজ বাইবেল পড়ি তাহলে কি আমি খ্রিষ্টান হয়ে যাবো বা আমি যদি ভগবদ গীতা পড়ি তাহলে কি আমি হিন্দু হয়ে যাবো? নিশ্চয়ই আমার ঈমান এতো দুর্বল নয়। তাই ভয়ের কিছু নেই, সঠিক ইসলামকে জানার জন্যে আরো কিছু পড়াশোনা করা প্রয়োজন। কারণ রসূল ﷺ বলেছেন "দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয" (ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)।

বাজার থেকে আমরা যখন কিছু কিনি তখনতো অবশ্যই ১০ দোকান ঘুরে ভাল জিনিসটাই কেনার চেষ্টা করি। তাই আমি যে ইসলাম পালন করে জান্নাতে যেতে চাচ্ছি সেটা একটু পড়াশোনা করে যাচাই করে দেখবো না? আমি সঠিক পথে আছি কিনা? জান্নাত পাওয়ার জন্য পীরের দরবারে বা বিভিন্ন দরগায় গিয়ে

যে কষ্ট করছি তা যেন বিফলে না যায়। সবাই চায় জান্নাতে যেতে। তাই জান্নাতে যাওয়ার পথটা সঠিক আছে কিনা তা অবশ্যই যাচাই করে দেখা দরকার।

তরিকার উৎপত্তি কোথা হতে?

ইসলামী শরিয়া হতে (ইসলামী আইনে) সন্তুষ্ট না হয়ে একদল মুসলিম একটি অনুরূপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এবং তার নাম দেয় "তরিকা" (পথ)। হিন্দুদের যেমন চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মার সঙ্গে একীভূত হওয়া এবং খ্রীষ্টানদের ছিল স্রষ্টার সঙ্গে একীকরণ; এই উদ্ভাবিত তরিকার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ফানা এবং উসূল। "ফানা" হচ্ছে আত্মবিসর্জন এবং "উসূল" হচ্ছে এই জীবনে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর সঙ্গে মানব আত্মার একীকরণ। ফানা এবং উসূল অর্জন করতে গিয়ে কতগুলি প্রাথমিক ধাপ পার হতে হয় যার নাম দেয়া হয় মাকামাত (স্তর) এবং হালাত (অবস্থা)। মানুষের সাথে স্রষ্টার এই মিলনের জন্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অনুশীলনও প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই অনুশীলনে প্রায়ই মাথা এবং শরীর দুলিয়ে যিকর করা হয় এবং এমনকি অনেক সময় এতে নাচও জড়িত থাকে (যেমন ঘূর্ণ্যমান দরবেশের বেলায় দেখা যায়)। (ইউটিউবে এর বাস্তব উদাহরণ দেখা যায়) এসব অনুশীলনগুলি বলবৎ করার উদ্দেশ্যে পরস্পর সংযুক্ত কাহিনী দিয়ে এদের উৎপত্তি রসূলের ﷺ উপর আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু কোন সহীহ হাদীসের বইতে এই দাবীর কোন নির্ভরযোগ্য সমর্থন নেই। এ সত্ত্বেও সময়ের সাথে সাথে অনেক তরিকার সৃষ্টি হয়েছে এবং খ্রীষ্টান মরমিবাদের মত এসব তরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের নামে বিপুল পরিমাণে লোককাহিনী এবং রূপকথার উৎপত্তি হয়। খ্রীষ্টান ও সন্ন্যাসীদের যেরকমভাবে তাদের বসবাসের জন্য বিশেষ ধরনের বিচ্ছিন্ন বাসস্থান (আশ্রম) বেছে নেয়, সূফী গোষ্ঠিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ যা ওইয়াহ (শাব্দিক অর্থ ঃ নিভৃত স্থান) নামে অনুরূপ গৃহায়ণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত করে। মুলতঃ মিশর ও তার্কী থেকে এদের উৎপত্তি।

উদাহরণস্বরূপ, বেশীর ভাগ তরিকা দাবি করে যে উসূল অবস্থায় পৌঁছালে আল্লাহকে দেখা যায়। আয়িশা (রা.) রসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মিরাজে (উর্দ্ধাকাশে আরোহণ) আল্লাহকে দেখেছিলেন কিনা, তিনি ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহকে দেখেননি। (সহীহ মুসলিম)

ঐশী বাণী অবতীর্ণ করার সময় আল্লাহ তাঁর সত্ত্বার কিছু অংশ একটি পাহাড়ের কাছে প্রকাশ করলে পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধূলায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই

ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ পয়গম্বর মূসা (আ.)-কেও দেখিয়েছিলেন যে তিনি বা অন্য কেউ এই জীবনে চর্মচক্ষুতে আল্লাহর দর্শন লাভ করতে পারবে না। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৪৩)। কতিপয় সূফী বিশেষ দাবি করে যে, উসূল অবস্থায় পৌঁছালে প্রত্যেকদিন পাঁচবার সলাতের বাধ্যবাধকতা আর অবশ্যকরণীয় থাকে না। তাদের অনেকে পরামর্শ দেয় যে, রসূল ﷺ অথবা তথাকথিত আউলিয়াদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা পৌঁছান যায়। অনেকে আবার আউলিয়াদের সমাধিফলক ও কবরের চারপাশে তাওওয়াফ, পশু কুরবানী এবং অন্যান্য ধরনের ইবাদতও শুরু করেছিল। আজকাল মিশরের জয়নাব এবং সাদ আল-বাদওইর কবর, সুদানের মোহাম্মদ আহম্মদ (মাহদী)-এর সমাধি ফলক এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অগণিত আউলিয়া ও সাধকদের দরগাহের চতুষ্পার্শে লোকদের তাওওয়াফ করতে দেখা যায়।

কুরআন হাদীসের বাইরে এত তরিকা কেন?

ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে যাতে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ -এর প্রদর্শিত সরল পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম একই প্রথায় একই নিয়মবিধি মেনে পালন করতে পারে, জামায়াতবদ্ধ জীবনযাপন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে এবং এই দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতের জীবনেও সাফল্য লাভ করতে পারে। আল্লাহ বলেছেন ঃ *মুসলিমগণ এক উম্মাহ, তারা পরস্পর ভাই ভাই (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)*। তোমরা বিভিন্ন মত ও পথ সৃষ্টি করো না, বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহর রসূলও তাই বলে গেছেন।

কিন্তু বাস্তব চিত্র কী? বাস্তব হলো আমরা আজ নানা মতে, নানা দলে বিভক্ত, নানা তরিকা, নানা ফির্কার ছড়াছড়ি দেশে দেশে! প্রত্যেকেরই দাবি হলো একমাত্র তারাই আল্লাহর ইবাদতের সঠিক পথ অনুসরণ করছে, অন্যেরা নয়। এবার একবার কুরআন-হাদীসের দিকে তাকাই যাতে সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারি। গোটা কুরআনেই সঠিক পথের সন্ধান ছড়িয়ে আছে। তথাপি সূরা আনআম-এর ১৫১ নং এবং ১৫২ নং আয়াতে মুসলিমদের প্রতি তাদের করণীয় নানা বিষয়ের ওপর আদেশ দেয়া হয়েছে।

১. *"এবং এই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এপথই অনুসরণ করবে, বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে সেটা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে*

বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন যাতে তোমরা সাবধান হও"। (সূরা আনআম ঃ ১৫৩)

২. *"কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হবে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০১)*

৩. *"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে (Rope/Chain) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)*

৪. *"তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মাঝে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৫)*

৫. *"যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল"। (সূরা রূমঃ৩১-৩২)*

৬. নাবী মুহম্মাদ ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন ঃ *"যারা দ্বীন সম্মন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়। তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন"। (সূরা আনআ'মঃ১৫৯)*

৭. অপর একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, (মুসলিমগণ) সময়ের প্রবাহে ৭৩টি ফির্কা বা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং শুধু সেই দলই জান্নাতের আশা করতে পারে যারা কুরআন ও তাঁর হাদীসের উপর অটল থেকে ইবাদত করে যেতে পারবে। (তিরমিযী)

বর্তমানে আমাদের মাঝে এতোই দলাদলি বা মতভেদ যে আমরা মূল ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে এসেছি এবং স্পষ্টতই আমরা মুসলিমরা সেই ৭৩ ফির্কার যুগে পৌঁছে গেছি বলা চলে। কিন্তু এই ভেদাভেদতো জাহান্নামের রাস্তা, জান্নাতের নয়। এখন আমাদের উচিৎ সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা। এটা আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব কারণ ইবাদত-বন্দেগীতো শুধু নিজেরই জন্য, নিজেরই শান্তি ও মুক্তির জন্য। নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা করে গড়ে তোলার জন্য, মুত্তাকি হওয়ার জন্য যাতে আল্লাহ খুশি হয়ে আমাদের জান্নাতে স্থান দেন, জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখেন। তবে সে জন্য চাই ফির্কা ও সমস্ত তরিকা পরিত্যাগ করে সঠিক জ্ঞানের অনুসন্ধান যা পাবো আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে। চলুন আমরা মজবুত ঈমান নিয়ে মুসলিম হই এবং

কুরআন ও সহীহ হাদীস পাঠ করতে থাকি এবং সেই জ্ঞানের আলোকে ইবাদতে নিমগ্ন হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

পীর শব্দের তাৎপর্য

যে পীর পীর করে আমরা এতো পাগল, সেই পীর শব্দটা কিন্তু আরবী শব্দ নয়। আর ওটা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায়ও কোন শব্দ নয়। পীর শব্দটা ফারসী শব্দ। পারস্যে মানুষের বয়স বেশী হয়ে গেলে সেই বুড়োবুড়ি মানুষকে বলা হয় পীর। পারস্যের অগ্নি পূজারীদের পুরোহিতকে বলা হয ‘পীরে মুগাঁ’। ফারসী অভিধানে ‘পীরে মুগাঁর’ অর্থ করা হয়েছে- ‘আতাশ পোরস্তঁকা মুরশেদ’ (অগ্নিপূজারীদের পুরোহিত)। মদের আড্ডায় যিনি মদ বিক্রয় করেন, সেই শুঁড়ি মহাশয়কে বলা হয় পীরে মুগাঁ। মুসলিমদের কোন ইমাম, খতীব, ওস্তাদ, শিক্ষক বা নেতার শানে এই পীর শব্দটাকে ব্যবহার করতে হবে, এ প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে মিলে না। তবে কেউ কেউ আধ্যাত্মিক প্রেমকে রূপকভাবে মদরূপে অভিহিত করে, সেই প্রেমরস পরিবেশন-কারীকে পীরে মুগাঁ বা শুঁড়ি মশায় বলে অভিহিত করেছেন।

খ্রীষ্টানদের Priest আর হিন্দুদের পুরোহিত বলতে যা বুঝায়, পীর বলতে ঠিক তাই বুঝায়। পীর, পুরোহিত বা Priest-এর কোন প্রতিশব্দ কুরআন-হাদীসে নেই। আবূ বকর, উমার, উসমান, আলী (রা.)ম প্রমুখ সাহাবীগণও কেউ কোনদিন পীর বলে দাবী করেননি। তাবিয়ীনদের যুগে পীরের অস্তিত্ব ছিল না। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ (রহ.) প্রমুখ ইমামগণও কখনো পীর বলে দাবী করেননি ।

পীর শব্দের অস্তিত্বই ইসলামে নেই ঃ শায়খুল মাশায়েখ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন, যে হাকিকত ও মারেফতের পিছনে শরীয়তের সমর্থন নেই সে হাকিকত ও মারেফত কুফর। কাজেই আমাদের দেখতে হবে যে পীর-মুরীদির কারবারের কথা ইসলামের কথা কিনা? পীর শব্দটার অস্তিত্বই ইসলামে নেই। সাহাবা, তাবেঈ ও মহামতি ইমামদের কেউ পীর-মুরীদি করেননি। অভিনব এক ভঙ্গিমায় বিকট চীৎকার করে যিকর করার কথাও ইসলামে নেই। ঐ যে ছাগল, গরু, চাল, ডাল, ঘি মোরগ তলব করে ওরস পালন করা হয় এরও কোন সমর্থন শরীয়তে নেই। মানুষকে পাপমুক্ত করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার দাবীও পীরদের ভিত্তিহীন দাবী। ওসীলা হওয়ার দাবীও তাদের মিথ্যা।

হাক্কানী পীর বলতে কিছু নেই

হাক্ক মানে সত্য বা সঠিক, হাক্ক থেকে হাক্কানী শব্দ। আমরা অনেক সময়ই শুনে থাকি হাক্কানী পীর। এটা সাধারণত পীরদের মধ্যে নিজেরা নিজেদেরকে প্রচার করে থাকেন। এটা দিয়ে বুঝাতে চান যে পীরদের মধ্যে সব পীর সঠিক না এদের মধ্যে কিছু আছেন সঠিক আর বাকীরা ভন্ড। এভাবে এক পীর আরেক পীরকে দোষারূপ করেন। বিষয়টি যদি কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে দেখি তাহলে, পীর বলতেই তো ইসলামেই কিছু নেই তার উপর আবার হাক্কানী কী আর ভন্ড কী! কারণ পীর-মুরীদি করতে হলে তাকে কোন না কোন তরীকায় বায়াত গ্রহণ করতে হবে যা ইসলামে নাজায়েয। কোন পীরকে যদি 'হাক্কানী' হতে হয় তাহলে তাকে সর্বপ্রথমে পীর প্রফেশন ছেড়ে দিতে হবে, তাকে তরিকত, হাকীকত, মারিফত থেকে বের হয়ে এসে একমাত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মুতাবেক জীবনযাপন করতে হবে। তাহলেই তিনি প্রকৃত মুসলিম ও মু'মিন হিসেবে চিহ্নিত হবেন।

দ্বীনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন ওলি নেই

ওলি (Saint) অর্থ কী?

ওলি কথাটার কয়েকটা অর্থ হতে পারে তার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "অভিভাবক বা সাহায্যকারী বা বন্ধু"। ওলি হচ্ছে একবচন এবং আউলিয়া হচ্ছে ওলি-র বহুবচন। দুনিয়ার কার্যকলাপে মানুষ ওলি হতে পারে। যেমন ঃ গৃহকর্তা পরিবারের অন্যান্যদের ওলি।

খ্রীষ্টান ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারে কিছু ব্যক্তি বিশেষকে বহুকাল ধরে তাদের কথিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের জন্য অতি প্রশংসা করে আসা হচ্ছিল। তাদের উপর অলৌকিক ঘটনা আরোপ করা হয়েছিল এবং "সন্ত" (Saint) মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল, আজো হচ্ছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে ওলীদের নামে দেখা যায় বিভিন্ন স্থান, চার্চ, রোড, স্কুল, কলেজ যেমন ঃ সেন্ট জোসেফ, সেন্ট মেরি, সেন্ট মার্টিন, সেন্ট ম্যাথিও ইত্যাদি। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যে যেসব শিক্ষক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার মই বেয়ে উপরে উঠেছে বলে মনে করা হত এবং যারা অলৌকিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করত তাদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্দিষ্ট করার জন্য তাদেরকে "গুরু", "অবতার" ইত্যাদি উপাধি দেয় হত। এই উপাধিগুলি

পরবর্তীতে সেইসব তথাকথিত সাধুদেরকে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী অথবা তাদের দেবতা প্রার্থনা করার জন্য সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করেছে। ফলশ্রুতিতে, এসব ধর্মীয় ঐতিহ্যে অনেক সাধক রয়েছে যাদেরকে জনগণ ভক্তি ভরে পূজা করে। অপরপক্ষে, ইসলাম এমনকি রসূল ﷺ -এর মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করারও বিরোধিতা করে। রসূল ﷺ বলেছেনঃ

"খ্রীষ্টানরা যে রকম ঈসা ইবনে মারিয়মকে প্রশংসা করত আমাকে ঐ রকম মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, আমি শুধু আল্লাহর একজন দাস মাত্র। কাজেই আমাকে বরঞ্চ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর বার্তাবাহক (রসূল) বলে ডাক"। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এখন প্রশ্ন

এই ওলি কে বা আউলিয়া কারা? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কে দিবেন? কেউ নিশ্চয়ই নিজে নিজেকে আল্লাহর ওলি বলে দাবি করবেন না। কে আল্লাহর বন্ধু আখিরাতের ময়দানে বিচারের আগে কে এই ফায়সালা করবে? অবশ্যই ওলি এই পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু আমরা যাদেরকে ওলি বলছি তারা তো নিজেরা কোন দিন বলেন নাই যে "আমি ওলি"। তাহলে আমরা কেন বলছি ওমুক ওমুক আল্লাহর ওলি। তার মানে মহান আল্লাহর বিচারের অধিকার আমরা নিজ হাতে নিয়ে নিচ্ছি। কারণ বিচারের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং তিনিই একমাত্র বিচারক। যদি আমরা আল্লাহর ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেই তাহলে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা হয়ে যাচ্ছে। তাই কে ওলি আর কে ওলি নয় তা আল্লাহ-ই declare করবেন শেষ বিচারের দিন। হ্যাঁ, কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে এবং হাদীসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন ঃ কে নাবী, কে রসূল। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ১০ জন সাহাবাকে জান্নাতের অগ্রিম সুসংবাদ দিয়েছেন। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা আর কোন ওলিকে নাম ধরে জান্নাতের অগ্রিম সুসংবাদ দেন নাই।

এমনকি আল্লাহ নিজেকে উল্লেখ করার জন্যও বিভিন্ন আয়াতে এই ওলি শব্দ ব্যবহার করেন আবার শয়তানের উদ্দেশ্যেও এই শব্দ ব্যবহার করেছেন ঃ

- *"যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের ওলি (অভিভাবক), তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান"। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৭)*
- *"আল্লাহ মু'মিনদের ওলি (অভিভাবক)"। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬৮)*

- *"উহারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে ওলি (অভিভাবক) রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ, ওলি (অভিভাবক) তো তিনিই"। (সূরা আস-শূরাঃ৯)*
- *"যালিমরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহতো মুত্তাকীগণের ওয়ালি (বন্ধু)"। (সূরা জাছিয়া ঃ ১৯)*
- *"আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে ওয়ালি (অভিভাবক) রূপে গ্রহণ করলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়"। (সূরা আন-নিসা ঃ ১১৯)*

কিন্তু যে প্রয়োগটি আমাদের সবচেয়ে উদ্বিগ্ন করে তা হলো "আউলিয়া-উল্লাহ", আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ। কুরআনে আল্লাহ মানবজাতির মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তি বিশেষকে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বলে মনোনীত করেছেন। তাঁর ওলিগণ সম্মন্ধে আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ

- *"মুত্তাকীগণই তাদের তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়"। (সূরা আনফাল ঃ ৩৪)*
- *"জেনে রাখ, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত হবে না। যারা বিশ্বাস করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে"। (সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৩)*
- *"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী"। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১৩)*

এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, একজন মানুষ অন্যজনের থেকে সত্যিকার উচ্চতর পদমর্যাদা পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। তাই সবচেয়ে তাকওয়াবান ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে শুধু আল্লাহই অবগত। কারণ তাকওয়ার স্থান হল অন্তরে। মানুষ শুধু বাহ্যিক কর্মকান্ড দ্বারা একজন অপরজনকে বিচার করতে পারে। তবে তা বিভ্রান্তিকর হতে পরে বা নাও হতে পারে। আল্লাহ কোথাও তাঁর ওলি হওয়ার জন্য অলৌকিক কাজ ঘটাতে হবে বলে উল্লেখ করেননি। সুতরাং সকল বিশ্বাসী যাদের ঈমান এবং তাকওয়া রয়েছে তারাই আল্লাহর ওলি এবং তিনি (আল্লাহ) তাদের ওলি। সুতরাং কোন ধার্মিক ব্যক্তিকে এমন পর্যায়ে ওঠানো উচিত নয় যা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে পর্যাপ্তভাবে পরিষ্কার করেছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

"মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর বিরোধী"। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২০৪)

এই লেখাটি পড়ে কেউ আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না। ওলিদেরকে আমরা সকলেই ভালবাসি শ্রদ্ধা করি। তাদেরকে অসম্মান করার জন্য এই বইতে অবশ্যই কোন কিছু লেখা হয়নি। আল্লাহর ওলিরা তাদের স্থানে স-সম্মানের সহিত আছেন। তারা কখনো মর্যাদার দিক থেকে সাহাবাদের স্থানে যেতে পারবেন না। আবার সাহাবারা কখনো মর্যাদার দিক থেকে নাবী-রসূলদের স্থানে যেতে পারবেন না। আবার নাবী-রসূলরা কখনো মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর স্থানে যেতে পারবেন না।

আউলিয়া মনোনীত করার জন্য কাউকে অনুমতি দেয়া হয়নি

বিশেষ কয়েকজন ঈমানদারকে আল্লাহর "আউলিয়া" মনোনীত করার জন্য মুসলিমদের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এ ধরনের পরিষ্কার ইসলামী বিধান থাকা সত্ত্বেও, তথাকথিত মুসলিম ওলিদের প্রাধান্য সূফী মহলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে। অনেকেই এদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। যোগ্যতার উর্দ্ধ ক্রমানুসারে তারা ওলিদেরকে বিভিন্ন ক্যাডার ভিত্তিতে chain of command অনুসারে ভাগ করেছেন (নাউজুবিল্লাহ), আর সেগুলো হলোঃ আখিয়ার (পছন্দকৃত) যাদের সংখ্যা ৩০০, আবদাল (বিকল্পগণ) সংখ্যায় ৪০, ৭ জন আবরার (ধার্মিক), ৪ জন আওতাদ (খুঁটি), ৩ জন নুকাবা (প্রহরীরা), কুতুব (খুঁটি) যাকে তার সময়কার সবচেয়ে বড় ওলি বলে গণ্য করা হয়।

তালিকার শীর্ষে ওলিদের প্রধান হ'ল "গাউথ" (গাউস) (ত্রাণকারী) যাকে কোন কোন মহল বিশ্বাস করে যে, তিনি মুরীদদের গুনাহর কিছু অংশ নিজের কাঁধে নিতে সক্ষম। সূফী বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বোচ্চ তিন শ্রেণীর ওলিগণ সলাতের সময় অদৃশ্যভাবে মক্কায় উপস্থিত হয়। গাউসের মৃত্যু হলে কুতুব তার স্থান দখল করে এবং এভাবে সবাই তালিকার উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই সব বিশ্বাস খৃষ্টীয় ধর্মের পৌরাণিক কাহিনী হতে ধার করা হয়েছে। যেমন, তসবিহ খৃষ্টীয় জপমালা (Rosary) হতে এবং মিলাদ "ক্রিসম্যাস" (খৃষ্টের জন্মোৎসব) হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে ওলি কে?

১) মানুষ যার কথা মতো চলে; যার হিদায়াত অনুযায়ী আমল করে; যার নির্ধারিত নিয়ম-নীতি-প্রথা, আইন-বিধান পদ্ধতির অনুসরণ করে কুরআনের ভাষায় তাকে ওলি বলা হয়।

২) মানুষ যার পথ প্রদর্শনের উপর বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে, সে তার জন্য সঠিক পথ বাতলে দেয় ও ভুল ভ্রান্তি হতে রক্ষা করে সে ওলি।

৩) যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে যে, সে অতি-প্রাকৃতিক উপায়ে তার সাহায্য করে, তাকে বিপদে আপদ-মুসীবত হতে রক্ষা করে, তাকে রুজী রোজগার দেয়, সন্তান দেয়, আশা আকাংখা পূরণ করে। অন্যান্য ভাবেও তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে, সে ওলি।

তাই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যে, দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ওলি নেই।

তাসাউফ শিক্ষা করা কি ফরয?

'তাসাউফ শিক্ষা করা ফরযে আইন' এই ধরনের একটি মিথ্যা কথা আমাদের সাাজে প্রচলিত আছে। ইসলামে যতো ফরয হুকুম রয়েছে তা মহান আল্লাহ তার রসুলের মাধ্যমে করেছেন। এখন রসূল ﷺ চলে যাওয়ার পর এই 'তাসাউফ' কে ফরয করলো? রসূল ﷺ নিজেই তো সূফী-দরবেশ ছিলেন না এবং তার সাহাবা (রা.)-রাও কেউ সূফী-সাধক ছিলেন না। তাসাউফ শিক্ষা করা ফরয তা-ও কুরআন ও কোন সহীহ হাদীসে কোথাও নেই। তাহলে এই ফরয কোথা থেকে আসলো, কে করল?

পীর ধরা কি ফরয?

তরিকতপন্থীরা বলেন ঃ 'পীর ধরা ফরয এবং যার পীর নাই শয়তানই তার পীর!' এই ধরনের কথা নিঃসন্দেহে কুরআন-হাদীস বিরোধী। পীর বলতে তো কুরআন-হাদীসে এবং আরবীতে কোন শব্দই নেই! আমরা তরিকতের ভাইরা কি ইতিহাস জানি? পীর প্রথা কবে থেকে চালু হয়েছে? পীর ধরা যদি ফরযই হতো তাহলে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, হাজার হাজার সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং অন্যান্য ঈমামগণের সময় তো কোন পীর ছিল না। তাহলে তাঁরা কোন পীর ধরেছিলেন আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে? এছাড়া ইসলামে

যতো ফরয হুকুম রয়েছে তা মহান আল্লাহ তার রসুলের মাধ্যমে করেছেন। এখন রসূল ﷺ চলে যাওয়ার পর এই 'পীর ধরা' কে ফরয করলো?

ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে জাহিলিয়াত যুগে মূর্তিপূজকদের মধ্যে এবং বর্তমানের পীর-মুরীদদের মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে জাহিলিয়াত যুগে আরবদের মধ্যে ইবাদতের বিশেষ কিছু নিয়ম প্রচলিত ছিলো। এর অধিকাংশই ছিলো আমর ইবনে লুহাইয়ের আবিষ্কার। লোকেরা আমর ইবনে লুহাইয়ের আবিষ্কারসমূহকে ইব্রাহীমী দ্বীনের পরিবর্তন নয়; বরং এসবকে তারা মনে করতো বিদ'আতে হাসানা। তারা আল্লাহতে এবং তাঁর ক্ষমতায় বিশ্বাস করতো কিন্তু আজকালকার পীর-আওলীয়াদের মতো অন্য কাউকে মধ্যস্ততা হিসেবে ব্যবহার করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া বা পাওয়া যাবে না, কারো মাধ্যমে যেতে হবে। নিচে তাদের বিশ্বাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেওয়াজ/প্রথা তুলে ধরা হলোঃ

১. আইয়ামে জাহিলিয়াতে (ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগের) মূর্তিপূজকরা মূর্তির সামনে নিবেদিত চিত্তে বসতো এবং তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো। জোরে জোরে তাদের ডাকতো এবং প্রয়োজন পূরণ ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যে তাদের কাছে সাহায্য চাইতো। তারা বিশ্বাস করতো, মূর্তিরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করিয়ে দেবে।

২. জাহিলিয়াত যুগের মূর্তিপূজারীরা মূর্তিগুলোর উদ্দেশ্যে হাজ্জের তাওয়াফের মতো তাওয়াফ করতো। তাদের সামনে অনুনয়-বিনয় সহকারে নিজেদের নিবেদন করতো এবং তাদের সিজদা করতো।

৩. মূর্তিগুলোর জন্যে কুরবানী ও উপহার উপস্থিত করা হতো। কখনো কখনো মূর্তির আস্তানায় নিয়ে কুরবানীর পশু জবাই করা হতো। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

৪. মূর্তির সন্তুষ্টি লাভের একটা উপায় এটাও ছিলো যে, মূর্তিপূজকেরা তাদের পানাহারের জিনিস, উৎপাদিত ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তুর একাংশ মূর্তির জন্যে পৃথক করে রাখতো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারা আল্লাহর জন্যেও একটা অংশ রাখতো।

৫. মূর্তিদের সন্তুষ্টি পাওয়ার একটা উপায় তারা এও নির্ধারণ করেছিলো যে, উৎপাদিত ফসল এবং চতুষ্পদ পশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানত করতো। (সূরা আন'আম ঃ ১৩৮)

৬. আরবের লোকেরা তাদের মূর্তিগুলোর সাথে এ বিশ্বাস করতো যে, মূর্তিগুলো তাদের আল্লাহর কাছাকাছি পৌছে দেবে এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মূর্তিপূজকরা বলতো, আমরা তো ওদের পূজা এ জন্যে করি যে তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।" (সূরা যুমার ঃ ৩)

৭. আরব পৌত্তলিকরা গণক, হারানো বস্তুর সন্ধানদাতা জ্যোতিষীদের কথার উপরও বিশ্বাস রাখতো। গণকদের কেউ কেউ দাবী করতো, তার অনুগত জ্বিন রয়েছে, সে জ্বিন তাকে খবর এনে দেয়। কেউ কেউ দাবী করতো, সে গায়েব জানে, তার মাধ্যমে সে অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্ক বলতে পারে।

৮. মুশরিকদের মাঝে অশুভ লক্ষণ গ্রহণের প্রচলনও ছিলো। এছাড়া তাদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্যও নানারকম নিয়ম-কানুন ছিল।

'ওসীলা' হওয়ার দাবী ভিত্তিহীন!

পীরদের আর এক দাবী হল, তাঁরা জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, আদালতে কেইস উদ্ধারের জন্য যেমন উকিল-মোক্তারের দরকার, মন্ত্রির নিকট যাওয়ার জন্য যেমন সেক্রেটারি প্রয়োজন, ঠিক তেমনি তোমরা সংসারের ক্ষুদ্র কীট, সরাসরি আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না। আল্লাহর কাছে যেতে গেলে ওসীলা বা মাধ্যম তোমাদেরকে ধরতেই হবে, আর সেই মাধ্যম বা উকিল মোক্তার হচ্ছি আমরা এই পীরসাহেবরা।

পীরদের এ দাবীও ভিত্তিহীন। কারণ যে আল্লাহ প্রেমময়-বান্দার অন্তরের অন্তঃস্থলের যাবতীয় খবর রাখেন, যে আল্লাহ বান্দার আকুল ফরিয়াদ সরাসরি শ্রবণ করতে সক্ষম, সেই আল্লাহকে দুনিয়ার সংকীর্ণ দৃষ্টি, সসীম জ্ঞান, একেবারে অক্ষম বিচারকদের সাথে তুলনা করে পীরদের উকিল মোক্তার সাজার দাবীটা শিরক ছাড়া আর কি হতে পারে?

- *"তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজায় লিপ্ত রয়েছে, তারা তাদের লাভ ও ক্ষতি কিছুই করতে পারে না, আর এই অপকর্মের কৈফিয়ত স্বরূপ তারা বলে থাকে, ওরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী মাত্র।" (সূরা ইউনুস ঃ ১৮)*
- *"আমাকে ছাড়া কাউকে উকিল/মধ্যস্থতাকারী বানিও না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২)*

- *"উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আহযাব ঃ ৪৮, সূরা নিসা ঃ ১৩২)*
- *"আমি তোমাকে (মুহাম্মাদকে) তাদের উকিল (মধ্যস্থতাকারী) বানিয়ে পাঠাইনি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৫)*

কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় এখানে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর আর তাঁর 'ওসীলা' অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, তাহলে তোমরা পরিত্রাণ পাবে।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩৫)

এই আয়াতের মাঝে যে 'ওসীলা' শব্দ আছে, পীরসাহেবরা বলছেন, এই ওসীলার তাৎপর্য হচ্ছে মাধ্যম। পীরসাহেবরা জোর দাবী করে বলছেন, আমরা সেই ওসীলা। আরো অগ্রসর হয়ে এক শ্রেণীর অর্ধ-আলেম পীর ধরা ফরয বলে দাবি করেন। এজন্য তারা দলিল হিসেবে প্রথমে পেশ করেন কুরআনের এই 'ওসীলার' আয়াত।

'ওসীলা' শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে 'নৈকট্য'। আর আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর দ্বারাই এটা অর্জন করতে হবে। মোটকথা সমস্ত অভিধান ও তাফসীরের কিতাব থেকে এ কথাই জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা ঐসব ইবাদত ও সৎকর্মের নাম যা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক হয়। এ নয় যে, কোন মানুষকে মাঝখানে রেখে প্রার্থনা কর, আর শেষ পর্যন্ত ঐ বুজুর্গের কাছেই চাইতে শুরু করে দাও। আল্লাহকে ইবাদত-বন্দেগী, সৎকর্ম, কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ পালনের মাধ্যমেই পেতে হবে। মহান আল্লাহ বলছেন ঃ

- *"তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো"। (সূরা বাকারা ঃ ১৫২)*
- *"যারা আমার পথে সাধনা ও সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদের আমার পথের সন্ধান দিয়ে থাকি"। (সূরা আনকাবূত ঃ ৬)*
- *"আমার বান্দারা আমার ব্যাপারে জানতে চাইলে বলে দিও, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের অতি নিকটে আছি। যখনই কেউ আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি সাথে সাথেই তাতে সাড়া দিয়ে থাকি। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৬)*

সলাত হচ্ছে মুমিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ অর্থাৎ বান্দা যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন বান্দার সাথে আল্লাহর সরাসরি যোগাযোগ হয়ে যায়, আর বান্দা যখন সিজদারত অবস্থায় থাকে তখন আল্লাহ বান্দার খুব কাছাকাছি চলে আসে। তাই আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি-মাধ্যমের প্রয়োজন নেই, যে কোন ব্যাপারে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক হবে সরাসরি আর উপরের আয়াতগুলো এটাই প্রমাণ করে।

তরিকতের যিকরের রহস্য

তরিকতের যিকরের কুরআন-হাদীসের দলিল কোথায়?

যিকর আমাদেরকে করতেই হবে কিন্তু যেসব লতিফার কথা উল্লেখ করে পীরসাহেবরা যিকরের ফর্মুলা বের করেছেন, তার প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে আছে কিনা সেটাই হলো দেখার বিষয়। পবিত্র কুরআনে ১১৪টি সূরা আছে, মোট ৬,২৩৬টি আয়াত আছে। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, পীরসাহেবদের ছয় লতিফার কথা কোন আয়াতে পাওয়া যায় না। তারপর বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি সহীহ হাদীসের কিতাবগুলো খুঁজে দেখেছি, প্রিয় নাবীর কোন হাদীস থেকে ছয় লতিফার বিবরণ মিলে না।

তাহলে প্রশ্ন হল, ছয় লতিফার বিবরণ পীরসাহেবরা পেলেন কোথা থেকে? অবশ্য কোন কোন পীর বলেন, এসব গোপন তথ্য আল্লাহর নাবী আলী (রা.)-কে দিয়ে গেছেন। হাসান বসরীর কাছ থেকে নাকি পীর কিবলারা সব কলবে কলবে পেয়ে আসছেন। তাই যদি হয়, তাহলে আলী (রা.) ছাড়া বাকী সাহাবীদের বাঁচার পথ কি? আল্লাহর নাবীর স্ত্রীদের অবস্থাই বা কি হবে? তার মেয়ে ফাতিমা (রা.)-র কি হবে? পীর কিবলারা এ সম্পর্কে কী বলেন? আল্লাহর নাবী ছয় লতিফার মূলতত্ত্ব কাউকে না দিয়ে কেবলমাত্র আলী (রা.)কে দিয়ে গেলেন- একথা বলায় আল্লাহর নাবীকে কি পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী করা হচ্ছে না? (নাউযুবিল্লাহ)

চীৎকার করে যিকর করা কি জায়িয?

আযানে, ইকামতে, সলাতে, হাজ্জে, ঈদে, প্রত্যেক কাজের আরম্ভে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বদেশে-বিদেশে, সব সময়ে যে সব দু'আ, তাসবীহ ও যিকর করার ব্যবস্থা আল্লাহ ও তাঁর রসূল শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, সেগুলির কোনটাই

এক শাব্দিক বা অসম্পূর্ণ বাক্য নয়। আযান ছাড়া আল্লাহর যত প্রকার প্রশংসাসূচক বাক্য আছে, সবগুলোর উচ্চারণ সাধারণ স্বরেই করতে হবে। খুব জোরে করা চলবে না।

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

"আপনার সলাত অনেক উঁচু আওয়াজেও পড়বেন না আবার খুব নিচু আওয়াজেও নয়। এ দুয়ের মাঝামাঝি পথই ধরুন।"
(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০)

সলাতে যা কিছু পড়া হয়, সেগুলো অবশ্যই যিকরের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, বিকট চীৎকার করে যিকর করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়।

"তোমার রবের যিকর কর মনে মনে, ব্যাকুলতা ও ভীতি সহকারে, উচ্চস্বরে নয়। এভাবে যিকর কর সকাল-সন্ধ্যায়। আর কখনও এ ব্যাপারে উদাসীন হবে না।" (সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০৫)

তোমরা আল্লাহর যিকর কর (ঐভাবে) যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৮)

তোমরা ডাকবে নিজেদের প্রভুকে নম্রভাবে ও গোপনে, নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৫)

তোমরা প্রতিপালকের যিকর কর, সকাল-সন্ধ্যায়, কাকুতি-মিনতি ও ভয়ের সাথে, অনুচ্চস্বরে, মনে মনে, আর তুমি অমনোযোগীদের/উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০৫)

অসম্পূর্ণ শব্দের যিকরের অর্থ কী?

দেখা যায় বিভিন্ন পীরের নিয়ম অনুযায়ী মুরীদগণ যিকর করে থাকেন "ইল্লাল্লাহ" "ইল্লাল্লাহ" "ইল্লাল্লাহ" "ইল্লাল্লাহ" বলে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই "ইল্লাল্লাহ" শব্দের অর্থ কি? "ইল্লাল্লাহ" আরবী শব্দের অর্থ "আল্লাহ ছাড়া"। এখন আবার প্রশ্ন, "আল্লাহ ছাড়া" "আল্লাহ ছাড়া" "আল্লাহ ছাড়া" কী? এই অর্ধেক শব্দের যিকিরের মানে কী?

তরিকতের যিকরের বৈজ্ঞানিক (Scientific) ব্যাখ্যা

অনেক যিকরের মাহফিলে দেখা যায় সকলে একসাথে তালেতালে উচ্চস্বরে যিকর করছে। এবং এভাবে অর্থ না বুঝে একই শব্দ ঘনঘন বলার কারণে তা

human brain-এর একটা specific sector-এ গিয়ে আঘাত হানে এবং কোন এক সময় তা negative reaction করতে থাকে বা ঐ সময় ঐ ব্যক্তির ব্রেইন malfunction করা শুরু করে। তখন ঐ মুহূর্তেই ঐ ব্যক্তিটি জবাই করা মুরগির মতো লাফ দিয়ে উঠে, ছটফট করতে থাকে কারণ তখন তার আর কোন হুঁশ-জ্ঞান থাকে না, তার ব্রেইন তো ঐ মুহূর্তে আর ঠিক মতো কাজ করছে না। এমনকি মাটিতে গড়াগড়ি করতে করতে পরনের কাপড়-চোপড় খুলে যায় সকলের সামনে, এ কেমন ধরনের ইবাদত বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ? পীরসাহেবরাই ভাল জানেন।

Medical science-এর মতে কেউ যে কোন শব্দ যদি উচ্চস্বরে অনেকক্ষণ ধরে ঘনঘন বলতে থাকে তাহলে তা অবশ্যই তার ব্রেইনে গিয়ে affect করবে এবং তার ব্রেইনও গরম হয়ে যাবে এবং malfunction করতে থাকবে। যদি বিশ্বাস না হয় যে কেউ নিজে প্রাকটিক্যাল করে দেখতে পারে। যেমন ধরি ঃ "ভোর হলো দোর খোল" এই শব্দ কয়টি আমি যিকরের নিয়মে অনেকক্ষণ ধরে বলতে থাকবো, এক সময় দেখবো আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

যিকর করতে করতে বাঁশ বেয়ে উপরে উঠা ঃ ইউটিউবে নানা রকমের আজগুবি যিকরের বাস্তব চিত্র দেখা যায়। যেমন বাংলাদেশের কোন এক পীরের মাহফিলে ভক্তরা যিকর করতে করতে প্যান্ডেলের বাঁশ বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে, একজন দুই জন না অনেকেই বানরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বাঁশ বেয়ে উঠছে, এই ইবাদতকে নাকি বলে মারিফতের এশ্‌ক। এ কেমন ইবাদত? ইবাদত করতে করতে কোন নাবী বা সাহাবী তো এই রকম বাঁশ বেয়ে বা গাছ বেয়ে কখনো উপরে উঠেন নাই। তারা হয়তো মারিফতের এশ্‌কের সন্ধান পান নাই!

তরিকতের যিকরের বাস্তব উদাহরণ

ধরুন গুলশানে আমি একটি বাড়িতে কেয়ারটেকারের চাকুরী নিয়েছি। বাড়ির মালিক job description অনুযায়ী আমাকে আমার সারাদিনের কাজকর্ম কি কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন ঃ ব্যাংকে গিয়ে বিভিন্ন রকম বিল পরিশোধ করা, কাপড় লন্ড্রি করা, বাগানে পানি দেয়া, গাড়ি আসলে গেইট খুলে দেয়া, বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আবার নিয়ে আসা, বাসার বাজার করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু দেখা গেল আমি আমার মালিককে এতোই ভালবাসি যে, আমার নিজ রুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে, লাইট অফ করে দিয়ে যিকরে বসে গেছি এবং

job description অনুযায়ী সারাদিন কোন কাজ না করে অনবরত মালিকের গুণ-গান গেয়ে বিভিন্ন রকম যিকর করছি। যেমন ঃ "আমার মালিক ভাল" "আমার মালিক ভাল", "আমার মালিক ভাল", আবার "আমার মালিক পবিত্র", "আমার মালিক পবিত্র", "আমার মালিক পবিত্র" আবার "আমার মালিক মহান", "আমার মালিক মহান", "আমার মালিক মহান" ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার আমার মালিক যখন রাতে বাসায় এসে দেখবেন যে আমি আমার মালিকের দেয়া job description অনুযায়ী সারাদিন কোন কাজকর্ম না করে অনবরত মালিকের গুণগান করে বিভিন্ন রকম যিকর করেছি তাহলে কি আমার চাকুরী আর এক মুহূর্তও থাকবে?

যাহোক, ঠিক একইভাবে খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি, মহান আল্লাহ আমাদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যত রকম ফরয হুকুম-আহকাম দিয়েছেন, পদে পদে হালাল-হারাম বেছে চলতে বলেছেন, সেগুলো ঠিক মতো না করে আমরা তথাকথিত যিকর করে গলা ফাটিয়ে ফেলছি। এতে কি মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি হবেন না নারাজ হবেন? বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার।

যিকর করলে কলব পরিষ্কার হয় কিভাবে?

আমি আল্লাহর দেয়া ফরয হুকুম-আহকাম বা হালাল-হারাম ঠিক মতো মেনে চলছি না কিন্তু শুধুমাত্র যিকর করে কলব পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি, ব্যাপারটা অযৌক্তিক নয় কি? আমাদের সমাজে দেখা যায় অনেক মুরীদের স্ত্রী-কন্যা আল্লাহর ফরয হুকুম পর্দা করেন না, আবার অনেকে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ সুদের সাথে জড়িত বা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীর হক ঠিক মতো আদায় করছেন না, হালাল উপায়ে আয়-রোজগার করছেন না কিন্তু নিয়মিত যিকর করে কলব পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। আমরা মহান আল্লাহর গুণগান অবশ্যই করব এবং এটা আল্লাহর আদেশ, কিন্তু তা হতে হবে রসূল ﷺ যেভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ঠিক সেইভাবে, অবশ্যই অন্য কারো বানানো নিয়মে নয়।

সত্যিকার যিকর বলতে আল্লাহ কী বুঝিয়েছেন?

- *"হে ঈমানদারগণ, বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকর কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ঘোষণা কর।" (সূরা আহযাব ঃ ৪১-৪২)*

- *"তোমার রবের যিকর কর বেশী বেশী করে আর তার পবিত্রতা ঘোষণা কর সকাল-সন্ধ্যায়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪১)*
- *"তোমার রবের নামের যিকর কর এবং সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর।" (সূরা মুজ্জাম্মিল ঃ ৮)*
- *"তোমার রবের নামের যিকর কর সকালে-বিকালে।" (সূরা দাহর ঃ ২৫)*
- *"অতঃপর যখন তোমরা সলাত আদায় করবে, তখন আল্লাহর যিকর করবে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায়ও।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)*
- *"অতঃপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো। এ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না।" (সূরা আল আরাফ ঃ ৭৪)*
- *"সলাত কায়েম কর আমার যিকরের জন্য।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ১৪)*
- *"আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যা আছে তা স্মরণ কর যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।" (সূরা আল আরাফ ঃ ১৭১)*
- *"সলাত কায়েম কর, নিশ্চয়ই সলাত পাপ কার্য ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহর যিকর তো সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫)*
- *"সেই সফলকাম হবে যে পবিত্রতা অর্জনে সচেষ্ট হয়, আল্লাহর নামের যিকর করে এবং সলাত আদায় করে।" (সূরা আ'লা ঃ ১৪-১৫)*
- *'সলাত শেষে আল্লাহর যমীনে ছড়িয়ে পড়ো। আল্লাহর হালাল রিযিক তালাশ কর এবং বেশী বেশী আল্লাহর যিকর কর।" (সূরা জুমু'আ ঃ ১০)*

যিকরের প্রকৃত অর্থ

উপরের আয়াতগুলোর মর্মার্থ বুঝার চেষ্টা করি। যিকরের শাব্দিক অর্থ হলো কোন কিছু স্মরণ করা, আবার বর্ণনা করাও হয়। কোন কিছু মনে রাখা বা মনে করাকে আমরা মনের যিকর বলতে পারি। এমনিভাবে কোথায় আল্লাহর কোন হুকুম কিভাবে মানতে হবে, কী কী কাজ আল্লাহ করতে বলেছেন আর কী কী করতে বারণ করেছেন, সেটা মনে গেঁথে নেবার নাম কলবের যিকর। আর কোন কিছু মুখে আলোচনা করাকে আমরা মুখের যিকর বলতে পারি। জুমু'আর সলাতের নির্দেশ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

"জুমু'আর দিনে যখন সলাতের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের জন্য দ্রুত হাযির হও।" (সূরা জুমু'আ ঃ ৯)

এখানে যিকর বলতে জুমু'আর সলাত ও খুৎবাকে বুঝানো হয়েছে। যার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে আল্লাহর কথা, আল্লাহর হুকুম আহকামের কথা শোনানো হয়ে থাকে। খুৎবা আসলে একটা বক্তৃতা, আল্লাহ তা'আলা তাকেও যিকরের নামে অভিহিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এই যিকর শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তিনি যিকর অর্থে কয়েকটা শব্দ মাথা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে 'হু-হা-হু-হা' করতে বলেন নাই। আল্লাহর যিকর আল কুরআনের এক বিশেষ পরিভাষা। কুরআন এটাকে তার নিজস্ব একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছে। আল কুরআনের যেসব আয়াতে যিকর কথাটি উল্লেখ আছে সেগুলোর দিকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে দৃষ্টি দিলে সেই বিশেষ অর্থ আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। যেমন ঃ

১) যিকরুল্লাহর প্রথম দাবি হলো ঈমানদারদের মনে আল্লাহর যাত, সিফাত ও হুকুম আহকাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান গভীরভাবে জাগ্রত হতে হবে।

২) যিকরুল্লাহর দ্বিতীয় দাবি হলো আল্লাহর নাম, সিফাত ও হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত যে সঠিক ধারণা তার অন্তরে বদ্ধমূল আছে তাকে আরো ভালভাবে পাকাপোক্ত করার জন্য পড়াশোনা ও চর্চা করতে হবে। অপরকেও এ ধারণা দানের জন্য আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে অর্থাৎ দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে তা প্রচার করতে হবে।

৩) যিকরুল্লাহর তৃতীয় দাবি হলো অন্তরে প্রতিষ্ঠিত এই ধারণার আলোকে তার বাস্তব জীবন অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করতে হবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ -এর দুরূদ এবং পীরসাহেবদের নতুন নতুন বানানো দুরূদের রহস্য

দুরূদ বলতে আরবী ভাষায় কোন শব্দ নেই, এটা ফার্সি শব্দ। ফার্সিতে দুরূদ মানে 'ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করা'। যাহোক, আমরা সলাতের মধ্যে যে দুরূদটা

পড়ে থাকি তাকে বলা হয় দুরূদে ইব্রাহীম যা রসূল ﷺ তাঁর উম্মতদেরকে দিয়ে গেছেন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে।

কিন্তু এই দুরূদের পরেও বাজারে আরো অনেক রকম দুরূদের ছড়াছড়ি দেখা যায় অথচ কোন সহীহ হাদীসে এদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে এই সব দুরূদ আসলো কিভাবে? যেমন ঃ দুরূদে হাজারী, দুরূদে লাখী, দুরূদে তাজ, দুরূদে শিফা, দুরূদে তুনাজ্জিনা ইত্যাদি। দুরূদে হাজারীর যিনি আবিস্কারক তাদের কমিটির সাথে চট্টগ্রামে সরাসরি যোগাযোগ করে এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছিলাম। তাদের বক্তব্য হলো তাদের পীরসাহেবকে রসূল ﷺ এই দুরূদটা দিয়েছেন এবং "হাজারী" নামকরণের অর্থ হলো এই দুরূদ যে পড়বে তার জন্য এক হাজার ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবে। এখন প্রশ্ন ঃ

- এই দুরূদটা রসূল ﷺ বাংলাদেশে এতো বড় বড় আরো অনেক পীরসাহেব থাকতে এককভাবে তাঁকেই কেন দিলেন?
- দুরূদের নামটা আবার বাংলায়, তার মানে কি রসূল ﷺ শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের জন্য এই দুরূদটা পাঠিয়েছেন?
- যদি শুধু বাংলাদেশী বাংলাভাষাভাষীদের জন্য পাঠিয়ে থাকেন তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলিমদের কি হবে? তারা তো তাহলে এটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন!
- আল্লাহর রসূল ﷺ কি তাহলে বাংলাদেশীদের খুব ভালবেসে কিছু কিছু স্পেশাল আমল বাংলায় নাজিল করেন!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, সকলের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, আসুন নিজেদের বিবেকবুদ্ধি একটু খাটানোর চেষ্টা করি। চিলে কান নিয়েছে কেউ বললেই তার পিছনে যেন না দৌড়াই। রসূল ﷺ কি শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের জন্য এসেছিলেন না কি গোটা বিশ্ববাসীর জন্য এসেছিলেন? রসূল ﷺ স্বপ্নে অথবা স্বশরীরে মদীনা থেকে বাংলা, উর্দু বা হিন্দিতে নানারকম দুরূদ বাংলাদেশী, পাকিস্তানী বা ইন্ডিয়ান পীর হুজুরদের নিকট সাপ্লাই দিচ্ছেন তাহলে আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদের কী হবে?

একটা ফর্মুলা পরিস্কার মনে রাখতে হবে, যে সকল সহজ আমল জান্নাতে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা দেখায় বা অতি অল্প পরিশ্রমে আমার জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিচ্ছে সেগুলো থেকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এই সকল আমল করার আগে অবশ্যই এর authentic দলিল কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে যাচাই করে নিতে হবে। তা না হলে আমি এবং আমার হুজুর দু'জনেই আখিরাতের ময়দানে বড় ধরনের ঝামেলায় পড়বো আর দু'জন দু'জনকে দোষারোপ করবো। রসূল ﷺ তার জীবদ্দশায় কুরআন আর সহীহ হাদীসের মাধ্যমে যা কিছু দিয়ে গেছেন সেগুলোই তো পালন করে শেষ করতে পারছি না, তার উপর আবার কেন অতিরিক্ত বোঝা নিচ্ছি?

ভিত্তিহীন আরো কিছু দু'আ ঃ বাজারে বিভিন্ন অজিফার বই পাওয়া যায় তার মধ্যে পাবেন 'দু'আয়ে গঞ্জল আরশ' এবং 'আহাদ নামা', যার ফযীলত খুবই মারাত্মক। এই ধরনের দু'আ কোন সহীহ হাদীসে নেই, অর্থাৎ রসূল ﷺ এই ধরনের কোন প্রকার দু'আ তার উম্মতদের জন্য দিয়ে যান নাই, তাই এইগুলো পড়া ও আমল করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ।

কুরআনের আয়াতের ফযীলত ঃ এই সকল ভিত্তিহীন অজিফার বইয়ের মধ্যে আরো পাওয়া যায় 'সূরা হাশরের' শেষ তিন আয়াতের ফযীলত এবং 'সূরা তওবার' শেষ দুই আয়াতের ফযীলত। এই হাদীসগুলো জাল, এই আয়াতগুলো নিয়ম করে সকাল-সন্ধ্যা পড়লে নানারকম ফযীলতের কথা কোন সহীহ হাদীসে নেই। তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে তিলাওয়াত করতে বলা হয়েছে।

অনেক পীরসাহেবদের দাবী তারা রসূল ﷺ -এর সাথে প্রায়ই মিটিং করেন!

অনেক পীরসাহেবরা দাবী করেন যে তারা যখন মদীনায় গিয়ে রসূল ﷺ -এর কবরে সালাম দেন তখন রসূল ﷺ নাকি তাঁর কবর থেকে উঠে এসে ঐ পীরসাহেবের সাথে হ্যান্ডশেক করেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরেন!

অনেক পীরসাহেবরা দাবী করেন যে তারা যখন মদীনায় গিয়ে রসূল ﷺ -এর সাথে তাদের দেখা হয় তখন তিনি তাদেরকে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসও দিয়ে দেন। যেমন ঃ রসূল ﷺ -এর গায়ের স্কার্ফ। আমার নিজের চোখে দেখা স্কার্ফ ক্যানাডায় বাংলাদেশীদের একটি খানকায় আছে।

অনেক পীরসাহেবরা দাবী করেন যে তারা মদীনায় গিয়ে রসূল ﷺ -এর সাথে বৈঠক করেন এবং মুরীদদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন নতুন নতুন আমলও তারা আসার সময় নিয়ে আসেন।

ইউটিউবে দেখেছি, ঢাকার এক নাম করা পীর বলছেন, রসূল ﷺ -এর মেয়ে ফাতিমা নাকি তার স্ত্রী। পীরসাহেবের ছেলে-মেয়েরা যখন মদীনায় গিয়েছিলেন তখন ফাতিমা নাকি কবর থেকে উঠে এসে তাদের জড়িয়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করেছে এবং তাদের জন্য দু'আ করেছে। (নাউযুবিল্লাহ)

প্রশ্ন ১ ঃ সারা পৃথিবীতে এতো অরাজকতা চলছে, আমেরিকা অবৈধভাবে মুসলিম দেশগুলিকে এক এক করে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অন্যান্য দেশের কথা বাদই দিলাম, নিজের দেশে রাজনৈতিক নেতারা আনইসলামী উপায়ে যেভাবে ইচ্ছা ঐভাবে দেশ চালাচ্ছেন, সন্ত্রাসীরা দেশের জনগণের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। পীরে পীরে দেশটা ভরে যাচ্ছে, এক পীর বলে সে সব পীরের চীফ; আবার আরেক পীর বলে সে সবার চীফ। পীরে পীরে মারামারি লেগেই আছে। যেইসব পীরেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রসূল ﷺ -এর সাথে নিয়মিত মিটিং করেন তারা কেন এইসব সমস্যার সমাধান করেন না?

প্রশ্ন ২ ঃ আমরা জানি যে রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পর বিখ্যাত চার খলিফার তিনজনকেই হত্যা করা হয়েছে। এখনকার পীরসাহেবরা যদি রসূল ﷺ -এর সাথে দফায় দফায় মিটিং করতে পারে তাহলে আমাদের খলিফারা কি তখন রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পর তাঁর সাথে মিটিং করে ঐ সময়ের সমস্যার সমাধান করে নিজেদের হত্যা ঠেকাতে পারতেন না? কারণ এখনকার পীরেরা যদি রসূল ﷺ -এর সাথে মিটিং করতে পারেন তাহলে তো সাহাবারা আরো বেশী করতে পারার কথা কারণ সাহাবারাতো রসূল ﷺ -এর জীবিত অবস্থায় তাঁর সাথে উঠাবসা করেছেন।

প্রশ্ন ৩ ঃ যখন জামালের যুদ্ধ হয়েছিল, অর্থাৎ আয়িশা (রা.) এবং আলী (রা.)-র মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কারণে দুই দলের মাঝে বড় ধরনের যুদ্ধ হয়েছিল তখন অনেক কুরআনে হাফেযও শহীদ হয়েছিলেন। মা আয়িশা (রা.) এবং আলী (রা.) কি রসূল ﷺ -এর সাথে মিটিং করে দুই দলের ভুল বুঝাবুঝি দূর করে এতো বড় যুদ্ধ কি এড়াতে পারতেন না? নাকি এখনকার পীরদের যে power আছে তা সাহাবীদের ছিল না ? (নাউযুবিল্লাহ)।

প্রশ্ন ৪ ঃ একটা আজগুবি গল্প প্রচলিত আছে যে, রসূল ﷺ নাকি একবার আব্দুল কাদের জীলানি (রহ.)-এর সাথে হ্যান্ডসেক করার জন্য কবর থেকে লম্বা হাত বের করে দিয়েছেলেন এবং এই দৃশ্য তখন উপস্থিত হাজার হাজার জনতা দেখেছে। এবার আসুন আমরা এই গল্পের ভিত্তি কি তা বিশ্লেষণ করে দেখি। আমরা যদি ইসলামের ইতিহাস পড়ি, রসূল ﷺ -এর স্ত্রীদের জীবনী পড়ি, চার খলিফার জীবনী পড়ি, রসূল ﷺ -এর মেয়েদের এবং নাতি-নাতনিদের জীবনী পড়ি এবং অন্যান্য সাহাবাদের জীবনী পড়ি তাহলে দেখি যে, রসূল ﷺ তার মৃত্যুর পর এদের কারো সাথেই কোন প্রকার মিটিং করেন নাই। রসূল ﷺ যখন মারা যান তখন মা আয়িশা (রা.)-র বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর এবং তিনি রসূল ﷺ -এর কবরের পাশেই থাকতেন, কারণ তার ঘরেই তার স্বামীর কবর হয়েছে। স্বামী হিসেবে রসূল ﷺ তো কখনোই কবর থেকে হাত বাড়িয়ে তার স্ত্রীকে একবারের জন্যও ধরেন নাই। অথবা মা আয়িশা (রা.) একাকিত্ব দূর করার জন্য তো কখনোই তার মৃত স্বামীর সাথে গল্প-গুজব করেন নাই।

জেগে থাকা অবস্থায় রসূল ﷺ -এর দর্শন লাভ অসম্ভব

জেগে থাকা অবস্থায় রসূল ﷺ -এর দর্শন লাভ অসম্ভব এবং কোনভাবেই কোন হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। প্রকৃতপক্ষে আবিষ্ট অবস্থায় এই ধরনের যা কিছু দৃশ্যমান হয়, তার ফলাফল যাই হোক না কেন, সন্দেহাতীতভাবে তা শয়তানের অপচ্ছায়া। মিরাজের সময় আল্লাহ রসূল ﷺ -কে পূর্বেকার কয়েকজন পয়গম্বরকে অলৌকিকভাবে দেখিয়েছেন এবং রসূল ﷺ তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। যারা রসূল ﷺ -কে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে বলে দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ঐ পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করে। রসূল ﷺ -কে আবিষ্ট অবস্থায় দর্শন অথবা অন্য কোন ভাবে ধর্মীয় যে কোন নতুন কিছু প্রাপ্তি (বিদ'আহ) বহু হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার কারণে ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণীয়। উদাহরণস্বরূপ, আয়িশা (রা.) উল্লেখ করেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, "যে কেউ আমাদের ব্যাপারে (অর্থাৎ ইসলামের ব্যাপারে) এমন কিছু নুতন প্রবর্তন করবে যা ইসলামের মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

শাফায়াত বা সুপারিশ সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশ কী?

শাফায়াত সম্মন্ধে বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে কিছু ধারণা চালু আছে, আর তা হচ্ছে ঃ

১) পরকালে বিভিন্ন ধরনের মানুষেরা শাফায়াত করতে পারবে ।

২) তাদের শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি পাওয়ার মতো গুরুতর গুনাহও আল্লাহ মাফ করে দিবেন ।

৩) জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করছে এমন ব্যক্তিদেরও তাদের শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করে আল্লাহ জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন ।

আর শাফায়াত সম্মন্ধে ঐ সকল ধারণার বাস্তব যে কুফল মুসলিম সমাজে আজ দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে ঃ

১) সেই সব লোকদের শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পেয়ে যাবে এ আশায় অসংখ্য মুসলিম এমন সব কাজ করছে বা এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকছে, যা যথাক্রমে না করলে জাহান্নামে যেতে হবে ।

২) যারা শাফায়াত করবে বলে লোকেরা জেনেছে, সে সকল জীবিত বা মৃত লোকদের খুশি করার জন্যে তারা ইসলামে নিষিদ্ধ নানারকম হারাম উপায় চেষ্টা করছে ।

৩) কিছু লোক শাফায়াতের লোভ দেখিয়ে মানুষকে নানাভাবে প্রতারিত করে নিজেরা লাভবান হচ্ছে ।

হাশরের ময়াঠে কে শাফায়াত করবেন?

ক) মহান আল্লাহ মূল শাফায়াতকারী

- *"(হে নাবী) বলে দিন সকল শাফায়াত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইখতিয়ারে। (শাফায়াতসহ) আকাশ ও পৃথিবীর সকল বিষয়ে সার্বভৌম কর্তৃত্ব শুধু তাঁরই"। (সূরা যুমার ঃ ৪৪)*
- *"তিনি (আল্লাহ) ছাড়া তোমাদের না কেউ ওলি আছে, আর না আছে কেউ তাঁর নিকট সুপারিশকারী। তবুও কি তোমাদের হুঁশ হবে না?"। (সূরা আস সিজদা ঃ ৪)*

- *"তিনি (আল্লাহ) ছাড়া তাদের জন্যে কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না"। (সূরা আনআম ঃ ৫১)*
- *"তবে কি তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে শাফায়াতকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে"? (সূরা যুমার ঃ ৪৩)*

খ) কুরআন শাফায়াতকারী

- "আবু উমামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা পবিত্র কুরআন পাঠ কর (জ্ঞান অর্জন কর) নিশ্চয়ই তা কিয়ামতের ময়দানে তার সাথীদের জন্য সুপারিশ করতে উপস্থিত হবে"। (সহীহ মুসলিম)

গ) মুহাম্মাদ ﷺ শাফায়াতকারী

- *"হে নাবী, সে ব্যক্তিকে (শাফায়াতের মাধ্যমে) কে বাঁচাতে পারে, যার উপর আযাবের ফয়সালা হয়ে গেছে। তুমি কি তাকে (শাফায়াতের মাধ্যমে) বাঁচাতে পারবে যাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে"? (সূরা যুমার ঃ ১৯)*
- "আমিই (রসূল সা.) প্রথম শাফায়াতকারী ও আমার শাফায়াতই প্রথম গ্রহণ করা হবে"। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ঘ) ফিরিশতা শাফায়াতকারী

- *"এবং তারা (ফিরিশতারা) শাফায়াত করে না তাদের ব্যতীত যাদের (শাফায়াত পাওয়ার) ব্যাপারে আল্লাহ রাজি বা সন্তুষ্ট"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৮)*
- *"মহাকাশে কত না ফিরিশতা রয়েছে (যারা সুপারিশ করবে) কিন্তু তাদের সুপারিশ কোন রকম ফল দিবে না (কবুল হবে না), যতক্ষণ না সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য বলে যার উপর আল্লাহ রাজি বা সন্তুষ্ট, তার জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি দেন"। (সূরা নাজম ঃ ২৬)*

ঙ) অন্য মানুষ শাফায়াতকারী

- "তিন ধরনের লোক কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন (করার অনুমতি পাবেন)। নাবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ"। (ইবনে মাযাহ, বায়হাকী)

বিশ্লেষণ ঃ নাবী-রসূলগণ ছাড়া অন্য যে সকল মানুষ শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন, তাদের নিশ্চয়ই সব ধরনের বড় ও ছোট গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কারণ, তা না হলে তাদের নিজেদেরই

অন্য কারো শাফায়াতের মাধ্যমে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে হবে। সহজেই বুঝা যায় এ ধরনের মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য হবে।

- *"এমন কে আছে যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করবে?" (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)*
- *"সেদিন শাফায়াত কার্যকর হবে না, অবশ্য স্বয়ং রহমান কাউকে উহার অনুমতি দিলে এবং তার কথা শুনতে পছন্দ করলে অন্য কথা।" (সূরা ত্বাহা ঃ ১০৯)*
- *"তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া সুপারিশ বা শাফায়াত করার কেউ নেই"। (সূরা ইউনুস ঃ ৩)*
- *"আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত আর কারো সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না।" (সূরা আস সাবা ঃ ২৩)*
- *"এমন একদিন আসবে যেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না।" (সূরা হুদ ঃ ১০৫)*
- *"তাঁকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে এই লোকেরা যাদের ডাকে তাদের শাফায়াত করার কোন ক্ষমতা নেই। ঐ লোকেরা ব্যতীত যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়"। (সূরা যুখরুফ ঃ ৮৬)*
- *"(সেদিন) কোন মানুষই আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ পেশ করার ক্ষমতা রাখবে না, তবে হ্যাঁ, যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে (তেমন কোন) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে থাকে (তবে তা ভিন্ন কথা)"। (সূরা মারইয়াম ঃ ৮৭)*

উপরোক্ত কুরআনের বাণী মুতাবেক শাফায়াতের সর্বস্বত্ব আল্লাহ দ্বারা সংরক্ষিত। রসূল ﷺ তার প্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা.)কে বলেছিলেন যে ঃ "হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাও। কিন্তু (পরকালে) আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, (আখিরাতে) আমার সাথে কী আচরণ করা হবে, তা আমি জানি না। আর এটাও আমি জানি না (সে দিন) তোমাদের সাথে কী ব্যবহার করা হবে। অথচ আমি আল্লাহর রসূল"। (সহীহ বুখারী)

উপরের হাদীসে রসূল ﷺ দু'বার আল্লাহর কসম খেয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলছেন, পরকালে তাঁর সাথে এবং সাহাবাদের সাথে কী ধরনের আচরণ করা হবে তা রসূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানেন না। হে মুসলিম ভাই-বোনেরা! এখন চিন্তার বিষয়, শাফায়াত পাবার জন্য আল্লাহর অনুমতি কারা পেতে পারেন? আর শাফায়াত কেবল আল্লাহর অনুমতিতেই পাওয়া যাবে। অতি দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের সমাজে যারা নিজেদেরকে শাফায়াতকারী হিসেবে দাবী করছেন বা মুরীদরা যাদেরকে শাফায়াতকারী হিসেবে মনে করছেন তারা তো রীতিমতো কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী শিরক ও বিদ'আতী কাজে লিপ্ত।

আসুন বিষয়টা আর একটু গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করি

ধরি আমি একটা লাভজনক ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। আমার কোম্পানীতে ২০০ পদে লোক নিয়োগ হবে বলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। আমার আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামের বিভিন্ন লোকজন আমার নিকট আসল সুপারিশের জন্য। আমিও স্বজনপ্রীতি দেখিয়ে আমার আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামের লোকজনদের যোগ্যতা ছাড়াই সুপারিশ করে চাকুরীতে ঢুকিয়ে দিলাম। এবং এভাবে পরিচিতজনদেরকে নিয়মিত আরো ব্যাপক আকারে আমার ইন্ডাস্ট্রিজে ঢুকাতে থাকলাম। একবার চিন্তা করে দেখি স্বজনপ্রীতির কারণে এই সকল অযোগ্য লোকদের গণহারে চাকুরী দেয়ার কারণে আমার ইন্ডাস্ট্রিজের প্রডাক্শনের কী অবস্থা হবে! কিছুদিনের মধ্যে অবশ্যই তা লালবাতি জ্বলবে।

ঠিক তেমনি পীরসাহেবরা যদি তাদের মুরীদদের সুপারিশ করে গণহারে জান্নাতে ঢুকাতে থাকেন তাহলে ঐ আটটি জান্নাতের কী অবস্থা হবে! বিষয়টা যদি এতোই সহজ হতো তাহলে তো সমস্ত দুই নাম্বার লোকেরা পীরদের মুরীদ হতো আর পীরসাহেবদের সুপারিশ নিয়ে জান্নাতে চলে যেত। মহান আল্লাহর আর কিতাব এবং নাবী-রসূল পাঠিয়ে মানুষকে হিদায়াত দেয়ার প্রয়োজন হতো না (নাউযুবিল্লাহ)।

এখন প্রশ্ন ঃ সহীহ হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানি যে "আশারায়ে মুবাশশারাহ" অর্থাৎ রসূল ﷺ -এর কাছে অহীর মাধ্যমে জীবিত অবস্থায় ১০ জন সাহাবা (রা.)ম আল্লাহর তরফ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে মা খাদিজা (রা.), মা আয়িশা (রা.) বা ফাতিমা (রা.) এরা কেউ নেই। এবার লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ঃ মুরীদেরকে তাদের নিজ নিজ পীরসাহেবরা আখিরাতের ময়দানে নাকি জান্নাতে পার করবেন! তার মানে যিনি পার করবেন তিনিতো

অবশ্যই আগে জান্নাতে যাবেন অর্থাৎ তার অবশ্যই জান্নাতে যাওয়ার আগে থেকেই কনফার্মেশন আছে! এখন প্রশ্ন ঃ "আশারায়ে মুবাশশারাহ"-র বাইরে কে ঐসকল পীরসাহেবদেরকে জান্নাতের অগ্রিম সার্টিফিকেট দিল?

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের খবর জানেন না। এটা স্পষ্ট কুরআনের কথা

মানবজাতির মধ্যে অনেকে আছেন যারা গায়েব বা অদৃশ্য বা ভবিষ্যৎ জানেন বলে দাবি করেন। তাদের মধ্যে দুই ধরনের লোক আছে।

প্রথম দল ঃ যাদের সত্যিকার কোন জ্ঞান বা গুপ্ত বিষয় জানা নেই। কিন্তু সাধারণ কিছু ঘটনাবলি যা মানুষের জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে তাই তাদের ধোঁকার বিষয়। এছাড়া তারা অনুমানের ভিত্তিতেও পরিকল্পিতভাবে অনেক কিছু বলে থাকে। এর কিছু কিছু অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনের সাথে মিলে যায়। যেগুলো মিলে যায় মানুষ সেগুলিই দীর্ঘ দিন মনে রাখে এবং যা মিলে না তা সাথে সাথেই ভুলে যায়, আর এটা মানুষের প্রাকৃতিক স্বভাব।

দ্বিতীয় দল ঃ দ্বিতীয় দলভুক্ত তারা যাদের জিনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এই দলটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর সঙ্গে সাধারণতঃ শিরক্-এর মত গুরুতর গুনাহ জড়িত। যারা এই কাজে জড়িত তাদের তথ্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই অতি নির্ভুল হয় এবং এভাবে মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের মধ্যে একইভাবে সত্যিকার ফিত্না (প্রলোভন/অরাজকতা) সৃষ্টি হয়। জিনদেরকে আল্লাহ কিছু গুণ দিয়েছেন যেমন, তারা উর্ধআকাশে উঠতে পারে, দ্রুত চলাফেরা করতে পারে, অদৃশ্য হতে পারে, ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে ইত্যাদি কিন্তু তারাও গায়েব জানে না। জিনদের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য কুরআনের ৭২ নং সূরা জিন-এর তাফসীর পড়ার জন্য অনুরোধ রইল। নিম্নের কুরআনের আয়াতগুলো থেকে আমরা পরিষ্কার যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের খবর জানেন না।

- *"সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি তাঁরই (আল্লাহর) নিকট, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না।" (সূরা আন'আম ঃ ৫৯)*
- *"(হে রসূল) বল ঃ আল্লাহ ব্যতীত কেউই আকাশ ও পৃথিবীতে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" (সূরা নামল ঃ ৬৫)*

- *"কিন্ত গায়েব সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা আল্লাহর নিয়ম নয়। গায়েবের কথা জানানোর জন্য আল্লাহ তাঁর রসূলদের মধ্য হতে যাকে চান মনোনীত করে নেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৯)*
- *"গায়েবের সবকিছু একমাত্র তিনিই জানেন। আর কারও কাছেই তিনি গায়েবের কোন বিষয় প্রকাশ করেন না। তবে রসূলগণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন তাকেই তিনি কিছু বাতলে দেন।" (সূরা জ্বীন ঃ ২৬-২৭)*
- *"আমি (মুহাম্মাদ) যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।" (সূরা আরাফ ঃ ১৮৮)*
- *"এভাবে সুলায়মান যখন পড়ে গেল তখন জিনদের নিকট এই রহস্য উদঘাটিত হল যে, তারা যদি গায়েব জানত তাহলে এই লাঞ্ছনার আযাবে নিমজ্জিত হয়ে থাকত না।" (সূরা সাবা ঃ ১৪)*

এছাড়া রেফারেন্স হিসেবে দেখতে পারি ঃ সূরা আল-বাকারা ঃ ৩৩, সূরা আল মায়িদা ঃ ১০৯, ১১৬, সূরা আল আনয়াম ঃ ৫৯, ৭৩, সূরা আত তাওবা ঃ ৭৮, ৯৪, ১০৫, সূরা ইউনুস ঃ ২০, সূরা হুদ ঃ ১২৩, সূরা আল কাহফ ঃ ২৬, সূরা আল ফাতের ঃ ৩৮, সূরা সাবা ঃ ৩, সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৮ ।

এবার একটু বিবেক-বুদ্ধি খাটাই

ঘটনা এক ঃ সহীহ বুখারীর একটা হাদীস "ইফ্কের ঘটনা" আমরা সকলেই জানি। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মা আয়িশা (রা.) তাঁর গলার হার হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই হার খুজঁতে যাওয়ায় কাফেলা ভুলবশত তাঁকে মরুভূমিতে ফেলেই চলে যায়। পরে সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল (রা.) নামে একজন সাহাবী মা আয়িশাকে তার উটে করে নিয়ে আসেন। কিন্তু মিসতাহ নামক একজন মুনাফিক মা আয়িশা (রা.) এবং সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল (রা.)র নামে অপবাদ রটিয়ে দেয়। এই অপবাদের কারণে রসূল ﷺ ও মা আয়িশা (রা.)-সহ সমস্ত সাহাবীগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাতে থাকেন। এভাবে প্রায় দীর্ঘ এক মাস চলতে থাকে। পরে মহান আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে কুরআনের আয়াত নাযিল হয় এবং প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। এখন প্রশ্ন ঃ এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল রসূল ﷺ ও মা আয়িশা (রা.)-সহ সমস্ত সাহাবীরা কি গায়েবের খবর জানতেন না? [সূরা নূর ঃ ১১-২০]

ঘটনা দুই ঃ আমরা যদি সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর তাফসীর পড়ি তাহলে দেখতে পাই যে এই দুটি সূরা নাযিলের উদ্দেশ্য। মদিনায় এক ইহুদী রসূল ﷺ -কে যাদু করেছিল। এই যাদুর প্রভাবে পড়ে রসূল ﷺ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং এই অসুস্থতার লক্ষণ হিসেবে দিন দিন তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছিল। যাহোক মহান আল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে দুজন ফিরিশতার মাধ্যমে যাদুর ঘটনা রসূল ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন এবং রোগমুক্তির জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল করলেন। এই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে রসূল ﷺ এবং তার সাহাবীরা (রা.) গায়েবের মাধ্যমে ঘটনা জানতেই পারেন নাই যে কী হয়েছে? রসূল ﷺ নিজেও জানতেন না যে কে তাকে যাদু করেছে। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে ঘটনা জানিয়েছেন।

ঘটনা তিন ঃ খায়বরের যুদ্ধ মিশনে এক ইহুদী মহিলা রসূল ﷺ -কে হত্যার জন্য বিষ মিশ্রিত ছাগলের মাংস খেতে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ তা গায়েবের মাধ্যমে, কাশ্‌ফের মাধ্যমে, ইলহামের মাধ্যমে, বুজুর্গের মাধ্যমে জানতেই পারেননি। আল্লাহ জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তাকে জানিয়েছেন।

ঘটনা চার ঃ একবার রসূল ﷺ জুতা পায়ে জামাতে সলাতে আদায় করছিলেন। সলাতের মধ্যে হঠাৎ তিনি জুতা খুলে ফেলেন এবং তাঁর দেখাদেখি সাহাবারাও জুতা খুলে ফেলেন। সলাত শেষে রসূল ﷺ সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা জুতা খুললে কেন? আমাকে তো জিবরাঈল (আ.) এসে জানিয়েছে যে জুতার মধ্যে নাপাকী লেগে আছে। এখানেও দেখা যাচ্ছে আল্লাহর রসূল ﷺ গায়েবের মাধ্যমে জানতে পারেননি যে তার জুতার মধ্যে নাপাকী আছে।

ঘটনা পাঁচ ঃ ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা যখন তাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে এসে তার বাবা নাবী ইয়াকুব (আ.)-কে বলেছিল বাঘে খেয়ে ফেলেছে। মাত্র তিন মাইল দূরে ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু ইয়াকুব (আ.) নাবী হয়েও ছেলে ইউসুফ (আ.)-এর সত্যি ঘটনা গায়েবের মাধ্যমে জানতে পারেননি। যদি জানতেন তাহলেতো সাথে সাথে গিয়ে তাকে কুয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসতেন।

রসূল ﷺ এবং অন্যান্য নাবীদের বিস্তারিত জীবনী পড়লে দেখা যায় যে এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে যার গায়েবের খবর আমাদের শ্রেষ্ঠ নাবী ﷺ জানতেন না এবং অন্যান্য নাবীরাও জানতেন না। মহান আল্লাহ তা পরে তাঁদেরকে জানিয়েছেন। তাই অদৃশ্য বা গায়েবের খবর কেউই জানে না। যদি কেউ বিশ্বাস

করে যে, জিন, মানুষ, পীর, দরবেশ গায়েবের খবর জানে, তাহলে অবশ্যই সে আল্লাহর নাযিলকৃত উপরোক্ত আয়াতগুলিতে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ কুরআন বিশ্বাস করেন না। তবে আল্লাহ গায়েবের খবর নাবী, রসূলগণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেছেন তাকেই তিনি প্রয়োজনীয় কিছু জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের কোন কোন পীরসাহেব নাকি গায়েবীভাবে মক্কার কাবা ঘরে সলাত আদায় করতে যান। কেউ আবার বাংলাদেশে বসেই কাবা ঘরে প্রবেশরত কুকুর তাড়ান। মনে করি, বাংলাদেশে আসরের সলাত বিকেল ৫টায়। ঐ সময় পীরসাহেব গায়েবীভাবে মক্কায় চলে গেলেন আসরের সলাত আদায় করার জন্য। এবং ১৫/২০ মিনিট পর সলাত আদায় করে আবার ফিরে আসলেন। এবার একটু লক্ষ্য করি যে, পীরসাহেব কত বড় কামেল! বাংলাদেশে যখন বিকেল ৫টা তখন মক্কায় দুপুর ২টা। তাহলে কি পীরসাহেব দুপুর ২টায় আসরের সলাত আদায় করে এলেন মক্কা থেকে? পরিতাপের বিষয় হল সাধারণ এমন কি শিক্ষিত লোকেরাও পীরসাহেবদের ধোকাবাজী বিশ্বাস করে থাকেন।

পীরসাহেব নাকি মুরীদদের পিতা হন!! পীরসাহেবদের দাবী যে তারা সম্পর্কে মুরীদদের পিতা হন কারণ তিনি মুরীদদের রূহকে জাগ্রত করেন। তারই মাধ্যমে মুরীদদের রূহানী জিন্দিগী শুরু হয়। এখন প্রশ্ন, এই ধরনের কথা পীরসাহেব পেলেন কোথায়? কুরআন ও হাদীসে তো এর কোন প্রমাণ নেই।

পীরসাহেবরা মুরীদদের কুরআন-হাদীস পড়তে উৎসাহিত করেন না কেন?

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, পীর ও সূফী লোকেরা সাধারণত মুরীদদেরকে দ্বীন-ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করার জন্যে কখনো উপদেশ দেন না। পীর কিবলা মুরীদকে মুরাকাবা করতে বলবেন, বিভিন্ন রকমের যিকর করতে বলবেন এবং হাজার বার করে 'বানানো দুরূদ শরীফের অজীফা' পড়তে বলবেন; কিন্তু আল্লাহর কালাম দ্বীন-ইসলামের মূল উৎস কুরআন, তার অনুবাদ ও তাফসীর এবং রসূল ﷺ -এর সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ পড়তে ও বুঝতে এবং আল্লাহর কথার সাথে গভীরভাবে পরিচিত হতে কখনই বলবেন না। বস্তুত এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার! কিন্তু মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন ঃ "অধিক জরুরী উপদেশ হলো এই যে, কুরআন হাদীসের অধ্যয়নে ও পড়াশুনায় কোনোরূপ ত্রুটি করবেন না। আপনার

সমস্ত সময় যদি এই অধ্যয়নে ব্যয় হয়ে যায় তাহলে ভালো। যিকর ও মুরাকাবার কোনো লোভ করবেন না।"

পীরসাহেবদের যুক্তি হচ্ছে কুরআন আল্লাহর কিতাব, সেটা আমরা পড়ে বুঝবো না। আল্লাহ কি বলতে চেয়েছেন সেটা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু এই ধারণাটা সম্পূর্ণরূপে ভুল, কারণ আল্লাহ তার কুরআনে অর্ধশত আয়াতেরও বেশী জায়গায় বলেছেন যে তিনি এই কুরআনকে অতি সহজ করে নাযিল করেছেন যাতে মানুষ তা বুঝতে পারে এবং হিদায়াত গ্রহণ করতে পারে। দলিল হিসেবে আমরা দেখতে পারি,

সূরা যুখরুফ ঃ ২; সূরা দুখান ঃ ২; সূরা বাকারা ঃ ১৮৭; সূরা বাকারা ঃ ২৫৬; সূরা ক্বামার ঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০; সূরা হামীম আস-সিজদা ঃ ৪০; সূরা যুমার ঃ ২৮; সূরা শুয়ারা ঃ ১৯৫, ১৯৬; সূরা মারিয়াম ঃ ৯৭; সূরা কাফ ঃ ১; সূরা ইউসূফ ঃ ১ ও ২; সূরা ইউনুস ঃ ২৪; সূরা বাকারা ঃ ৯৯; সূরা আন'আম ঃ ১১৪; সূরা আন'আম ঃ ৩৮; সূরা রূম ঃ ৫৮; সূরা নাহল ঃ ৮৯; সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৮; সূরা মায়িদা ঃ ৪৮; সূরা আন'আম ঃ ৯৭; সূরা রাদ ঃ ৪১; সূরা হজর ঃ ১; সূরা আশ-শুরা ঃ ১০; সূরা আহযাব ঃ ২১; সূরা মায়িদা ঃ ৩; সূরা বাকারা ঃ ১৮৫, ২২১; সূরা মায়িদা ঃ ১৫; সূরা আন'আম ঃ ১১৫; সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৫; সূরা ইউনুস ঃ ৫, ২৪, ৩৭; সূরা হুদ ঃ ১; সূরা ইউসুফ ঃ ১, ১১১; সূরা রা'দ ঃ ২; সূরা হিজর ঃ ১; সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৯; সূরা কাহাফ ঃ ৫৪, সূরা নূর ঃ ১, ৩৪, ৪৬; সূরা ফোরক্বান ঃ ৩৩; সূরা শুয়ারা ঃ ২, ১৯৫; সূরা নামল ঃ ১; সূরা কাসাস ঃ ২; সূরা ক্বলাম ঃ ৫২; সূরা হাশর ঃ ৭।

দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ফরয ঃ রসূল ﷺ বলেছেন ঃ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয (ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)।

জাহেরী ইল্ম ও বাতেনী ইল্ম কী

জাহেরী ইল্ম ও বাতেনী ইল্ম (প্রকাশ্য জ্ঞান ও গোপন জ্ঞান) বলতে কুরআন ও সহীহ হাদীসে কিছু নেই। এগুলো মানুষের বানানো তথ্য। মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন তা সুস্পষ্ট অর্থাৎ প্রকাশ্য। এখানে গোপন বলতে কোন কিছু নেই। রসূল ﷺ মা আয়িশা (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে ঃ "আমার ভেতরের-বাইরের সবকিছু মানুষের কাছে প্রকাশ করে দাও"। আর বিদায় হাজ্জের ভাষণেও রসূল ﷺ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে উপস্থিত

সাহাবাদের বলেছিলেন দ্বীনের সবকিছু তিনি মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। অর্থাৎ কোন কিছু বাকি বা গোপন নেই। এখন পীরসাহেবরা এই গোপন ইল্‌ম পেলেন কোথা থেকে? আসলে সূফীরা মুরীদদের নিকট নিজেদের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য এই তথ্য আবিষ্কার করেছে যে, 'আমরা যা জানি তোমরা তা জাননা'।

সূফীরা আরো বলে থাকেন যে কুরআন আসলে ৩০ পারা নয়, কুরআন মোট ৯০ পারা। এই পৃথিবীতে সর্বত্রই যে ৩০ পারা কুরআন দেখা যায় তা হচ্ছে 'পাতা কুরআন' অর্থাৎ প্রিন্টেড কপি এবং এই ৩০ পারা আসল কুরআন নয়। আসল কুরআন হচ্ছে বাকি ৬০ পারা যা 'দিল কুরআন' নামে অবহিত। আর এই 'দিল কুরআন' সাধারণ জনগণের কাছে নেই তা সংরক্ষিত আছে শুধুমাত্র সূফীদের কাছে তাদের দিলের মধ্যে, সবাই এটা পাওয়ার যোগ্যও নয়।

এই ধরনের আজগুবি কথার কোন দলিল বা ভিত্তি নেই। এগুলো মিথ্যা কথা এবং বিশ্বাস করাও গুনাহর কাজ। এখন হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ, information technology-র যুগ। মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়েছে, তাদের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। কুরআন হচ্ছে guidance for whole mankind, কুরআন নাজিলই হয়েছে মানুষকে হিদায়াতের জন্য। আর সেই কুরআন যদি থাকে গোপনে গোপনে এবং কিছু সূফীর দিলের মধ্যে তাহলে সকল ধর্মের মানুষ কিভাবে হিদায়াত পাবে। আল্লাহর রসূল ﷺ অবশ্যই কিছু গোপন করে যাননি সহীহ হাদীসে এর দলিল রয়েছে।

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যদি কেউ তোমাকে বলে, তাঁর অবতীর্ণ বিষয়ের যৎসামান্য কিছুও মুহাম্মাদ ﷺ গোপন করেছেন। তাহলে নিশ্চিত সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ বলেছেন, "হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি প্রচার কর।" (সহীহ বুখারী)

বিশুদ্ধতা, নির্ভরযোগ্যতা (Authenticity) ঃ আমি আমার জীবনে ইবাদত মনে করে যা কিছু করবো তা অবশ্যই কুরআন অথবা সহীহ হাদীসে অবশ্যই থাকতে হবে। কেউ যদি আমাকে কোন স্পেশাল দু'আ-দুরূদ বা কোন মহাপূণ্যের আমলও শিখিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই তার authentic দলিল চাইবো অথবা আমি নিজে কুরআন ও সহীহ হাদীস ঘেঁটে তা অবশ্যই যাচাই করে নিবো।

৯

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তার বিশ্লেষণ

সূফীজমের ভেতরে থেকে তার উপর গবেষণা

১৯৯৯ সালে দ্বীন ইসলাম শেখার জন্যে আমরা একজন প্রাইভেট শিক্ষক রাখি এবং কিছু দিন পরই ঐ শিক্ষকের মাধ্যমে সূফীজম এবং তরিকতের সাক্ষাত পাই। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সাহেব আমাদেরকে সূফীজম এবং তরিকতের উপর প্রায় পাঁচ হাজার টাকার বই কিনে দেন কিন্তু এতোগুলো বইয়ের মধ্যে কোন কুরআনের তাফসীর বা সহীহ হাদীস গ্রন্থ ছিল না। আমরা এই বিষয়কে খুব ভালভাবে আয়ত্তে আনার জন্যে নিয়মিত পড়াশোনা করতে থাকি এবং তরিকতের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে যাই। আমরা পাঁচ বছর তরিকতের সাথে যুক্ত হয়ে খুব কাছ থেকে এর গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, তরিকতকে বুঝার চেষ্টা করেছি। কারণ আমরাও তো তরিকতের অন্যান্য ভাইদের মতো অতি সহজে পরকালে পার পেতে চাই, জান্নাতে যেতে চাই।

কোন এক সময় আমাদের হাতে সূফীজমের একটা দূর্লভ বই এলো যার নাম "আল্লাহ প্রাপ্তির সহজ পথ"। এই বই পড়ে যা বুঝলাম, মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে তুর পর্বতে দেখা করেছিলেন এবং কথাবার্তা বলেছিলেন, আমাদের শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মিরাজে গিয়ে আল্লাহর সাথে দেখা করেছেন এবং কথাবার্তা বলেছেন। আমরাও যদি সূফীজম ঠিক মতো প্র্যাকটিস করি তাহলে এই পৃথিবীতেই আল্লাহর দেখা পাওয়া সম্ভব। আমাদের কাছে মনে হলো জান্নাত পাওয়া তো খুবই সহজ ব্যাপার, কিছু দু'আ-দুরূদ আর যিকর আজগর নিয়মিত করতে পারলেই এবং যে কোন কিছুর বিনিময়ে পীরসাহেবকে খুশি রাখতে পারলেই হলো। প্রায় এক বছরের মাথায় আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে জান্নাতে যাচ্ছি। এই পাঁচটি বছর আমরা সূফীজমকে খুব কাছে থেকে দেখেছি, নিজেরা এবং পরিবার-পরিজনকে নিয়ে তরিকত, মারেফত ও হাকিকত

চর্চা করেছি এবং এই বিষয়ের উপর রীতিমতো গবেষণা করেছি। আমরা কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের বিখ্যাত দু'জন পীরের সিলসিলা থেকে যা পেয়েছি তা মানুষের ভুল ভাঙানোর জন্য নিম্নে শিক্ষাস্বরূপ তুলে ধরছি।

প্রথম পীরসাহেবের উপর পর্যালোচনা

পীরের সাথে মুরীদের সম্পর্ক কেমন হবে ঃ পীরের সাথে মুরীদের সম্পর্ক কেমন হবে তা নিম্নের এই ২৭টি নির্দেশ আমরা কুমিল্লার একজন বিখ্যাত পীরের নিকট হতে পেয়েছি। এই পয়েন্টগুলো নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর সাথে কি পরিমাণ শিরক করা হয়েছে। এবং রসূল ﷺ -এর অনেক মর্যাদাই পীরসাহেব তার নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছেন। যেমন, ২৩নং ও ২৪নং পয়েন্ট আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদেরকে বলেছেন রসূল ﷺ -এর সম্মানার্থে যা পীরসাহেব তার নিজের জন্য দাবি করছেন। আবার দেখা যাচ্ছে ২৫নং ও ২৬নং পয়েন্টও সহীহ বুখারীর হাদীস যা শুধু রসূল ﷺ -এর বেলায় প্রযোজ্য, অন্য কোন পীরকে তো অনুসরণ করার প্রশ্নই উঠে না। নিম্নে পীরসাহেবের সাথে তার মুরীদের যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, রসূল ﷺ এবং সাহাবীদের বিস্তারিত জীবনী পড়লে কোথাও এরকম সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় না।

১) নিজের পীর ব্যতীত অন্য কোন পীরের প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

২) পীরের উপস্থিতিতে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত নফল ইবাদত ও যিকিরাদিতে লিপ্ত হইবে না।

৩) পীরের সম্মুখে অন্য কাহারও প্রতি মনোযোগ দিবে না। পীরের প্রতিই পরিপূর্ণরূপে লক্ষ্য রাখিবে, এমন কি যিকিরের খেয়ালও করিবে না। কিন্তু তিনি আদেশ করিলে তখনই খেয়াল করিবে।

৪) ফরয ব্যতীত তাঁহার সম্মুখে অন্য কোন সলাত আদায় করিবে না। যদি কোন অজিফা ইত্যাদি পড়িবার দরকার হয়, তাহা হইলে দূরে সরিয়া যাইয়া পড়িবে।

৫) এমন স্থানে দাঁড়াইবে না, যাহাতে নিজের ছায়া পীরের উপর কিংবা পীরের ছায়া নিজের উপর পতিত হয়।

৬) পীরের জায়নামাযের উপর পা রাখিবে না।

৭) পীরের ওযূর স্থানে ওযূ করিবে না।

৮) পীরের কোন খাস বরতন (পাত্র) থাকিলে তাহা ব্যবহার করিবে না।

৯) পীরের সম্মুখে তাঁহার বিনা ইজাজতে পানাহার করিবে না।

১০) পীরের সম্মুখে অন্য কাহারও সহিত কথাবার্তা বলিবেনা এবং কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

১১) পীরের অনুপস্থিতিকালেও তিনি যেইদিকে আছেন সেইদিকে পা লম্বা করিয়া দিবে না কিংবা থুথু ফেলিবে না।

১২) পীরের কোন কাজ দৃশ্যতঃ ভুল মনে হইলেও তাহাকে সঠিক বলিয়া জানিবে। কারণ তিনি যাহা কিছুই করেন, তাহা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই করিয়া থাকেন, তাহাতে কাহারও বলিবার কিছুই নাই।

১৩) তাঁহার কার্যকলাপ ও গতিবিধির সমালোচনা করিবে না, তাহা যত সামান্যই হউক না কেন।

১৪) পীরের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করিবে না। কারণ সৃষ্টির মধ্যে সকলের অপেক্ষা বদ্‌বখত ঐ ব্যক্তি যে অলি-আল্লাহগণের ছিদ্রান্বেষণ করে। আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন।

১৫) নিজের পীরের নিকট কোন দিন কোন কারামত দেখিতে চাহিবে না। কারণ কোন মোমেন কোন পয়গম্বরের নিকট হইতে কারামত দেখিতে চাহেন নাই।

১৬) যদি কখনও কোন বিষয়ে পীরের প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবে, তিনি সমাধান করিয়া দিবেন। যদি তাহাতে মনের তৃপ্তি না হয়, তাহা হইলে ইহা নিজেরই ত্রুটি জানিয়া ক্ষান্ত থাকিবে।

১৭) স্বপ্নে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা নিজের পীরকে জানাইবে।

১৮) নিজের কাশফের প্রতি কখনও আস্থা স্থাপন করিবে না, তাহা হইলে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে।

১৯) পীরের আদেশ ব্যতীত তাঁহার নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে না।

২০) বিনা প্রয়োজনে পীরের নিকট হইতে বিদায় লইবে না।

২১) যেখান হইতেই যে কোন ফায়েজ ও বরকত লাভ হউক না কেন, তাহা নিজের পীরের উসিলা বলিয়া জানিবে।

২২) ছোট বড় প্রত্যেকটি বিষয়েই নিজের পীরের অনুসরণ করিবে। তাঁহার নিদ্রাই হউক অথবা পোষাক পরিচ্ছদই হউক কিংবা সলাত সিয়ামেই হউক।

২৩) পীরের স্বরের অপেক্ষা নিজের স্বর উচ্চ করিবে না।

২৪) পীরের সহিত উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলিবে না। ইহা খুবই বে-আদবী।

২৫) তিনি যেভাবে সলাত আদায় করেন, সেভাবেই সলাত আদায় করিবে।
২৬) তাঁহার কাজ দেখিয়া ফেকাহর মাসলা শিখিতে হইবে।
২৭) বিপদে পড়লে পীরের কথা মনে করিবে এবং স্বীয় পীরের চেহারাটা কল্পনায় নিয়ে আসিবে।

পীরসাহেবের বিশেষ উপদেশ ঃ যখনই কোন বিপদে পড়বে তখন পীরসাহেরেব চেহারাটা কল্পনায় নিয়ে আসবে এবং পীরসাহেবের বানানো দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে তাহলে বিপদ কেটে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ) ইসলামের দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের আদেশ-নিষেধ এবং উপদেশ সম্পূর্ণরূপে শিরক।

খ্রষ্টানরা যেমন অন্ধভাবে পাদ্রীকে মানে তেমনি মুরীদরাও পীরকে মানে। পীরেরা এই বিশ্বাস তৈরী করেছেন, মুরীদদের মনে এমন আকীদা ঢুকিয়েছেন যে পীরের আদেশ-নিষেধ একটু এদিক-সেদিক হলেই ক্ষতি। আল্লাহ সূরা মুদাচ্ছিরে রসূল ﷺ -কে বলছেন "উঠ, সলাত আদায় করার জন্য জায়গা এবং কাপড় পবিত্র কর"। আর কোন কোন পীর বলেন 'জায়নামায সরাব দিয়ে রঙিন করে নামায পড়'। তাই করতে হবে, কারণ এটা পীরের হুকুম আর এতেই রয়েছে মুরীদের কল্যাণ। (নাউযুবিল্লাহ)

পীরসাহেবের ইসলাম বিরোধী কাজ ঃ আমরা দেখেছি যে এই পীরসাহেব মহিলা মুরীদদের মাথায় হাত রেখে দু'আ করেন। মহিলা মুরীদরা পীরসাহেবের পা ছুয়ে সালাম করেন। আরো দেখা যায় যে মহিলা মুরীদরা পীরসাহেবের (collected) টাকা-পয়সা তার বেড রুমে বসে গুনে দেন। আবার দেখা যায় পীরসাহেব এবং তার খলিফারা মহিলা মুরীদদের সামনে বসিয়ে ফায়েয দেন, ক্বলব জাগ্রত করেন, মদীনায় রসূলের সাথে অধ্যাতিকতার মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। (নাউযুবিল্লাহ) মহিলারা পীরসাহেবের সামনেই যেতে পারবেন না, মাথায়-পায়ে টাচ করাতো দূরের কথা, পীরসাহেবের বেড রুমে যাওয়া এবং এছাড়া মহিলাদের সামনে বসিয়ে ফায়েয দেয়া তো সম্পূর্ণরূপে হারাম।

দ্বিতীয় পীরসাহেবের উপর পর্যালোচনা

ঘটনা ১ ঃ আমি চট্রগ্রামের এক বিখ্যাত পীরের খানকায় তাদের মাসিক প্রোগ্রামে মাগরিবের সময় গেলাম, এবং ঐদিন-ই ছিল আমার প্রথম দিন। ২০-২৫ জন এর মতো উপস্থিত। আমরা সকলেই একসাথে জামাতে মাগরিবের

সলাত আদায় করলাম। সলাতের পর লাইট অফ করে দেয়া হলো এবং একজন মুরীদ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কি আমাদের হুজুরের মুরীদ? আমি বললাম না, তখন আমাকে বলল আপনি এখানে বসতে পারবেন না এবং আমাকে নিয়ে রান্নাঘরে বসিয়ে রাখা হলো। তারপর মুরীদগণ সকলে মিলে অন্ধকারে পীরের দেয়া অজিফা পড়লেন এবং মোরাকাবাসহ যিকর করলেন। তাদের ঐ বিশিষ্টি ইবাদত শেষ হয়ে যাওয়ার পর লাইট অন করা হলো এবং আমাকে ঐ রুমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো।

এখন প্রশ্ন ঃ আমরা সকলে মিলে একসাথে মাগরিবের ফরয সলাত জামাতের সাথে আদায় করলাম এবং এটা ছিল আল্লাহর দেয়া ফরয ইবাদত। এই ফরয ইবাদত এক সাথে করতে কোন অসুবিধা হলো না কিন্তু তারা এমন কী বিশিষ্ট ইবাদত করলেন যে তা ঐ মাগরিবের ফরয সলাতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। যে ইবাদতে আমাকে তাদের সাথে থাকতে দেয়া হলো না?

ঘটনা ২ ঃ তার পরের ঘটনা, তারা সলাতের পর যে অজিফাটা পড়েন তা আমি দেখতে চাইলাম। আমাকে ঐটা দেখতে দেয়ার সময় বলা হলো ঃ আপনি এটা দেখতে পারেন কিন্তু আমাদের মতো নিয়মিত এটা পড়তে পারবেন না, পড়তে হলে হুজুরের পারমিশন লাগবে। আমি হাতে নিয়ে অজিফাটা দেখলাম যে তাতে কিছু কুরআনের আয়াত, দু'আ এবং তাদের হুজুরের বানানো দুরূদ শরিফ রয়েছে।

এখন প্রশ্ন ঃ ঐ অজিফাতে তাদের হুজুরের বানানো দুরূদ শরিফ রয়েছে সেটা না হয় কেউ না পড়ল কারণ সেটা তার নিজের সম্পত্তি কিন্তু ঐ অজিফাতে কুরআনের আয়াতও রয়েছে, আর সেটা হচ্ছে আল্লাহর দেয়া মানুষের জন্য হিদায়াত তা কেন হুজুরের অনুমতি ছাড়া পড়া যাবে না?

ঘটনা ৩ ঃ অন্য আরেক দিনের ঘটনা। আমি আমার বক্তৃতায় সকলের উদ্দেশ্যে বলেছি যে ঃ রসূল ﷺ বলেছেন "দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয" - ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী। এছাড়া কুরআনের প্রথম আয়াত নাযিল হয়েছে যাতে বলা হয়েছে "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন....." - সূরা আলাক। আর জ্ঞান অর্জনের সর্বপ্রথম এবং authentic source হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। তাই আসুন আমরা সরাসরি কুরআনের অর্থ পড়ি, তাফসীর পড়ি এবং হাদীস পড়ি এবং পরিবারকে কুরআন-হাদীস কিনে দেই। ঐ মুহূর্তে তাদের পীরের একজন খলিফা আপত্তি করে

সকলের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিলেন যে, আপনারা কেউ আপনার পরিবারকে কোন কুরআনের তাফসীর কিনে দিবেন না এবং আমাদের হুজুরের অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার ইসলামী বই পড়বেন না, কারণ কুরআন বুঝার মতো যোগ্যতা আপনাদের হয় নাই ।

এখন প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা বলছেন তিনি কুরআনকে অতি সহজ করে নাযিল করেছেন যাতে মানবজাতি বুঝতে পারে । আর কুরআনকে পাঠানোই হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য গাইডলাইন হিসেবে । মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে এই কুরআনে । তাহলে কুরআনকে বুঝতে হলে আর সেই অনুযায়ী আমল করতে হলে কেন পীরসাহেবের অনুমতি লাগবে?

ঘটনা ৪ ঃ অন্য আর এক দিনের ঘটনা । অনুষ্ঠান চলাকালীন তাদের একজন বুজুর্গ তার বক্তৃতায় বলছেন যে, তাদের এই তরিকত করলে মুরীদদের কী লাভ? লাভ তো অনেক তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে গুনাহগার মুরীদ যখন মারা যাবে তখন কবরে দুইজন ফিরিশতা এসে প্রশ্ন করবে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার রসূল কে? গুনাহগার মুরীদতো ঠিক মতো উত্তর দিতে পারবে না । তখন তাদের ঐ পীরসাহেব কবরে রসূল ﷺ -কে সাথে নিয়ে উপস্থিত হবেন উত্তর দিয়ে দেয়ার জন্য । ফিরিশতার ডান দিকে থাকবেন রসূল ﷺ এবং বাম দিকে থাকবেন তাদের পীরসাহেব । পীরসাহেব কবরের মধ্যে তখন মুরীদকে বলবে 'ঐ মিয়া তুমি ইনাকে চিনলা না! ইনি হচ্ছেন আমাদের শেষ নাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ ' ।

এখন প্রশ্ন ঃ ঐ পীরসাহেবকে কে পারমিশন দিল কবরে যাওয়ার জন্য? যেখানে রসূল ﷺ স্বয়ং তার আদরের মেয়ে ফাতিমা (রা.)-কে বলেছেন মৃত্যুর পর তিনি তার কোন উপকার করতে পারবেন না, যার যার নিজের আমল দিয়ে তাকে পার পেতে হবে । ঐ পীরসাহেবের কবরেরই বা কী অবস্থা? তার নিজের প্রশ্নের উত্তর কে দিবেন?

ঘটনা ৫ ঃ কোন এক বছর আমি হাজ্জে যাওয়ার নিয়্যত করেছি । ইতিমধ্যে আমি তাদের হুজুরের সাথে দেখা করতে চাইলাম । তখন মুরীদ ভাইরা আমাকে বলল হুজুরও হাজ্জে যাচ্ছেন, সেখানে আপনি তার সাথে দেখা করতে পারবেন । সময় যখন নিকটে তখন হঠাৎ একদিন খবর আসল যে তাদের হুজুর এবার হাজ্জে যাচ্ছেন না । এবার এই খলিফা আমাকে বলছেন যে 'আপনাকে এবার হাজ্জ এ যাওয়া বাদ দিতে হবে কারণ হুজুর এবার হাজ্জে যাচ্ছেন না' ।

এখন প্রশ্ন ঃ হুজুরের সাথে তো একজন মানুষের হাজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। হাজ্জে বান্দার সম্পর্ক হচ্ছে সরাসরি আল্লাহর সাথে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি যে তারা হুজুরের জন্য আল্লাহর দেয়া ফরয হুকুমও বাতিল করে দিতে পারেন (নাউযুবিল্লাহ)।

ঘটনা ৬ ঃ এরকম অনেক ঘটনা আছে যা কুরআন ও রসূল ﷺ -এর সুন্নাহর সাথে অমিল দেখা যায়। যেমন তারা বলে থাকেন যে 'শুধু আমল করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না, তাদের হুজুরের দু'আ ছাড়া'।

এখন প্রশ্ন ঃ আমি কোন নেক আমল করব না আর শুধু হুজুরের দু'আয় জান্নাতে চলে যাব? কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বারেবারে বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন নেক আমল করার জন্য এবং এটাই একমাত্র মুক্তির পথ। সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াতে বলেছেন "তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে?" আবার সূরা আনকাবুতের ২ নং আয়াতে বলেছেন "মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে - তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না?"

ঘটনা ৭ ঃ এই তরিকতের অনেক ভাই-ই আছেন যারা সরাসরি কবিরা গুনাহর সাথে জড়িত অর্থাৎ হারাম সুদের সাথে জড়িত। যেমন অনেকেই সুদে বাড়ি কিনে তাতে পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন এবং ঐ সুদের বাড়িতে বসেই মোরাকাবা আর যিকর করে কলব পরিষ্কার করছেন!

এখন প্রশ্ন ঃ সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ "আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম।" আবার সূরা বাকারার ৪৪ নং আয়াতে আরো বলেছেন যে, "তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করো কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাক অথচ তোমরা কুরআন পড়। তোমরা কি চিন্তা কর না?" বিশ্বাস করুন, এই তরিকতের ভাইরা অনেক ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর চেয়ে তাদের পীরকে বেশী মান্য করে। যেমন ঃ আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন সুদ একটি কবিরা গুনাহ এবং তা সুস্পষ্ট হারাম। তারপরেও তারা সূদের সাথে জড়িত কিন্তু এই মুহূর্তে যদি তাদের পীরসাহেব বলেন যে সুদ একটি জঘন্যতম অপরাধ, তোমরা তা ত্যাগ কর, তাহলে ঐ মুহূর্তে তরিকতের ভাইরা সুদের বাড়ি বিক্রি করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহ যে বারেবারে কুরআনে বলেছেন তা তাদের কানে যাচ্ছে না।

ঘটনা ৮ ঃ এই তরিকতের ভাইদের বিশ্বাস যে, তাদের হুজুর যদি না চাইত তাহলে তারা কোন দিন ক্যানাডায় আসতে পারতো না। তাদের হুজুরের ক্ষমতাতেই তারা আজ ক্যানাডায় বসবাস করছে, রুজি-রোজগার করছে, আয়-উন্নতি করছে।

এখন প্রশ্ন ঃ কিন্তু আল্লাহ বলেছেন রিযিকের মালিক একমাত্র তিনি। যেমন সূরা ইসরার ৩০ নং আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ "নিশ্চয় তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন, যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন।"

ঘটনা ৯ ঃ এই তরিকতের ভাইয়েরা তাদের হুজুরের প্রতি এতোই নির্ভরশীল যে এক মুরীদ ভাই তার বক্তৃতায় খুব বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেন ঃ 'আমাদের জান্নাত প্রয়োজন নেই, আমাদের আব্বা হুজুর যেখানে যাবেন আমরাও সেখানে যেতে চাই, আমাদের আব্বা হুজুর যদি জাহান্নামে যায় আমরাও জাহান্নামে যাব, আমাদের জান্নাত প্রয়োজন নেই এবং তাতেই আমরা খুশি' (নাউযুবিল্লাহ)।

ঘটনা ১০ ঃ এই হুজুর নাকি বাংলাদেশে বসে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে ক্যানাডায় বসবাসরত তার মুরীদদের কলবে ফায়েজ দেন, মহিলা মুরীদদের কলবেও ফায়েজ দেন। এবং তিনি গায়েবও জানেন, মুরীদদের অবস্থা বলে দিতে পারেন, এখানে মহান আল্লাহর ক্ষমতা পীরসাহেব নিজেই নিয়ে নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

ঘটনা ১১ ঃ অন্য আর এক দিনের ঘটনা। মিলাদ চলছে, এক সময় মিলাদের সুরের টানে একজন মুরীদ চিৎকার দিয়ে জবাই করা মুরগির মতো লাফ দিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আমরা সবাই ঐ মাহফিলে বসা। গড়াগড়ি খেতে খেতে বেচারার হাতের তসবি ছিঁড়ে দানাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরল, পড়নের কাপড় চোপড় খুলে প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে গেল!

এখন প্রশ্ন ঃ কী আধ্যাত্মিকতার নমুনা! আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যিনি আল্লাহর ইবাদতকারী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ তিনি কি কখনও এরকম করে আল্লাহর ইবাদত করেছেন? তিনি যদি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এরকম উদ্ভট চিৎকার, লাফালাফি এবং বেহুস হয়ে কাপড় খুলে মাটিতে গড়াগড়ি করে ইবাদত করতেন তাহলে তো তা অবশ্যই হাদীস গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ থাকতো এবং সাহাবীরাও তা প্র্যাকটিস করতেন।

ঘটনা ১২ ঃ তাদের খানকায় কাঁচের ফ্রেমের বাক্সে একখানা কুরআন ও একটি স্কার্ফ রয়েছে, এবং ঐ বাক্সটা কিবলার দিকে অর্থাৎ সবাই যখন সলাত আদায়

করে তখন তা সামনে থাকে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে তাদের পীরসাহেব যখন মদীনায় রসূল ﷺ -এর কবরের কাছে গিয়ে সালাম দিয়েছেন তখন রসূল ﷺ কবর থেকে উঠে এসে তাদের পীরসাহেবকে জড়িয়ে ধরেছেন আর ঐ মূহূর্তে পীরসাহেবের গায়ে ছিল ঐ স্কার্ফ যেটাতে রসূল ﷺ -এর হাত ও গায়ের স্পর্শ লেগেছে। ক্যানাডাবাসীকে পীরসাহেব এতো ভালবাসেন যে তিনি ঐ স্কার্ফ তাদেরকে নির্দশনস্বরূপ দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন ঃ জেগে থাকা অবস্থায় রসূল ﷺ -এর দর্শন লাভ অসম্ভব এবং কোনভাবেই কোন হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। প্রকৃতপক্ষে আবিষ্ট অবস্থায় এই ধরনের যা কিছু দৃশ্যমান হয়, তার ফলাফল যাই হোক না কেন, সন্দেহাতীতভাবে তা শয়তানের অপচ্ছায়া। মিরাজের সময় আল্লাহ রসূল ﷺ -কে পূর্বেকার কয়েকজন পয়গম্বরকে অলৌকিকভাবে দেখিয়েছেন এবং রসূল ﷺ তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। যারা রসূল ﷺ -কে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন বলে দাবি করেন, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ঐ পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেন। রসূল ﷺ -কে জেগে থাকা অবস্থায় দেখা অথবা অন্য কোনভাবে ধর্মীয় যে কোন কিছু প্রাপ্তি (বিদ'আত) বহু হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার কারণে ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণীয়।

আমরা জানি কুরআন আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন মানবজাতির হিদায়াতের জন্য, এটা বুঝে পড়ে সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে বলা হয়েছে। অবশ্যই কুরআন কাঁচের ফ্রেমে বাঁধাই করে বাক্স বন্ধি করে রাখার জন্য আসেনি।

ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চোখে দেখবেন ঃ সম্মানিত তরিকতের ভাই ও বোনেরা আশা করি আমাদের কোন কথায় রাগ করবেন না, মন খারাপ করবেন না এবং আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না। ভাষাগত দুর্বলতার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। উপরের গবেষণামূলক তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে শুধু মাত্র বিষয়গুলো পরিষ্কার করার জন্য। এটা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব সঠিক তথ্য সকলের নিকট তুলে ধরা। কারো মনে কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে থাকলে আমরা আবারও ক্ষমাপ্রার্থী।

১০

সকল তরিকতের ভাইদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি

ইসলামে সত্যিকার তাসাওউফ কী?

সূফীবাদী বা তাসাওউফপন্থীগণ ফিকাহের সাথে একটি তুলনামূলক উপমা জনগণের সামনে তুলে ধরেন এভাবে যে ইবাদতের বাহ্যিক কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে ফিকাহ আর ইবাদতের আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে থাকে তাসাওউফ। তারা বলেন, ফিকাহ সলাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাহ্যিক দিকগুলি যেমন তাকবির, রুকু, সিজদা, বৈঠক, তিলাওয়াত ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে থাকে আর সলাতের আভ্যন্তরীণ যেমন খুশু, খুজু এবং আন্তরিকতা বা মনের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে দেখে তাসাওউফ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাসাওউফ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

তাসাওউফ শব্দের উৎপত্তি

তাসাওউফ শব্দটি আরবী হলেও তা কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষা নয়। শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি মতামত রয়েছে। অভিধানে সাধারণভাবে শব্দটির উৎস হিসেবে আরবী (সওফ) বা পশম যা পূর্বকালের সংসার ত্যাগী মুসলিমদের পোশাক ছিল অথবা সম্ভবত ঃ (সলাফ) বা পবিত্রতা থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে বলা হয়েছে। সূফী সাধক আল রুধাবারী শব্দ দুটিকে একসাথ করে মন্তব্য করেছেন সে সূফী হলেন তিনি যিনি পবিত্রতাকে আচ্ছাদন করেন পশমের তৈরী পোশাক দিয়ে। পশমের পোশাক অনেক সময় সূফী তরিকার প্রতীক হিসেবেও ধরা হয়। অন্যদের মতে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আহলুস সুফফা হতে। আহলুস সুফফা হলেন রসূল ﷺ -এর একদল সাহাবা যাঁরা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ছিলেন এবং তাঁরা রীতিমত যিকরে সমবেত হতেন এবং তাঁরা The people of the porch হিসেবেও পরিচিত। মধ্যযুগীয় পারস্য পন্ডিত আবু রায়হান আর

বাইরুনীর মতে সূফী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ সাফিয়া হতে যার অর্থ হলো হিকমাত বা উইসডম। বর্তমানে গবেষণার ফলে এই মতটি বেশ প্রাধান্য পাচ্ছে। সূফীইজমের আরবী হল তাসাওউফ।

তাসাওউফের মূল উৎস এবং ইতিহাস

স্রষ্টার সাথে এই পার্থিব জগতেই সৃষ্টির মূলাকাত বা মিশে যাওয়া। একাত্ম হওয়ার যে চিন্তাধারা ইসলাম পূর্বযুগ তথা প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে তাই আবার সূফীইজমে ঢুকে তাসাওউফ নামে মুসলিম বিশ্বে করেছে আত্মপ্রকাশ। নিম্নের আলোচনা থেকে তা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। খৃষ্টাব্দের ২য় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রীয়ায় অমুনমাসিকম নামে এক ব্যক্তির জন্ম হয় এবং সে ঈসায়ী ধর্ম ত্যাগ করে এক নতুন মতাদর্শ প্রকাশ করে। তার বক্তব্য ছিল মানুষের স্বাধীন স্বচ্ছ জ্ঞান তখনই লাভ হবে যখন সে বাতেনী অবস্থার সংশোধনীতে পার্থিব জগতের সকল চাহিদা হতে মুক্তি লাভ করবে এবং এরপর হাসিল হবে কাশ্‌ফ।

কাশ্‌ফের দ্বারা অদৃশ্য জগতের ভেদ রহস্য হওয়ার কারণে সে উর্দ্ধ জগতের সাথে বিলীন হয়ে একাত্ম হয়ে যাবে। প্লেটনিস (তার জন্ম হয় ২০৩ খৃষ্টাব্দে) নামে তার এক সাগরেদ অধিক মাত্রায় উপবাস থাকত আর নির্জনে কাটাত অধিক সময় আর বলত ঃ তার আধ্যাত্মিক শক্তি এত প্রবল হয় যে সে প্রভুর সাথে বহুবার দর্শন লাভ করে এবং তার দেহ ছয়বার প্রভুর সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে যায়। সে বলত ঃ জগত একটা স্বপ্নের ন্যায় এর কোন বাস্তবরূপ নেই। প্রভুর সাথে একাত্ম হওয়াটাই মানুষের জন্য পূর্ণতা ও সৌভাগ্যের প্রতীক এবং ঐ মিলন ও একাত্ম হওয়াটা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয় যে মানুষ বহির্জগতের যাবতীয় প্রতিক্রিয়া হতে মুক্ত হয়ে নিজকে উর্দ্ধ জগতের ধ্যানে বিলীন করে দেবে।

তবে মানুষের ঐ অবস্থা কেবল কাশ্‌ফ হাসিল হলেই চলবেনা বরং যখন সে নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে আত্মচেতনা ও বাহ্যিক অনুভূতি হারিয়ে ফেলবে এবং ব্যক্তি বিশেষত্বকে নির্বান (ফানা) করে সব জিনিসের আধারের সাথে নিজকে মিশিয়ে দেয়ার শক্তি অর্জন করবে তখনই সে এমন এক মরতবায় উপনীত হবে যে নিজস্ব স্বত্ত্বা এবং ফানাফিল্লাহ এর মূলতত্ত্বের রহস্য তার জন্য উদঘাটন হয়ে যাবে। ইহাই হলো তাসাওউফ থিওরীর গোড়ার কথা। পরবর্তী

যুগে তাসাওউফ পন্থীদের আধ্যাত্মিক চর্চা ঐ ধারায় চলে গেছে। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন তাসাওউফের চিন্তাধারা খৃষ্টানদের মস্তিষ্ক প্রসূত বস্তু।

কুরআন ও হাদীসে তাসাওউফের উল্লেখ আছে কি?

তাসাওউফ আরবী শব্দ হলেও তা যে কুরআন ও হাদীসে নেই তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সাইয়েয়া (খারাপ) ও হাসানাত (ভাল) এই দু'ভাগে ভাগ করে তাসাওউফের হাসানাত অংশটির দিকে কোন কোন মুসলিম বিদ্যান লোকের সমর্থন দেখা যায়। কোনভাবেই এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আসল কথা হচ্ছে আত্মশুদ্ধী বা আত্মার পবিত্রতা এ বিষয়ে যে পরিভাষা পবিত্র কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে হা হল তাযকিয়া বা আত্মার পবিত্রতা এবং হিকমাত বা প্রজ্ঞা। আর হাদীসে একে বলা হয় ইহসান যা ঈমানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী।

আল্লাহর নাযিলকৃত সর্বোচ্চ দুটি পরিভাষা (তাযকিয়া ও হিকমাত) এবং নাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ -এর দেয়া পরিভাষা ইহসানসহ মোট তিনটি পরিভাষাকে একদিকে রেখে বিজাতীয় দর্শন হতে নির্গত পরিভাষা তাসাওউফ কিভাবে মুসলিম উম্মাহ গ্রহণ করে নিতে পারে?

বিভ্রান্ত জাতিসমূহের কাছ থেকে ইসলাম-বিরোধী দর্শনের শিক্ষা লাভ করে মানুষ তাকে তাসাউফের নামে ইসলামের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করে নিয়েছে। কুরআন ও হাদীসে যার অস্তিত্ব নেই, এমনি বহু বিচিত্র ধরনের বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতিকে তারা তাসাউফের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এই ধরনের লোকেরা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে শরিয়তের আনুগত্য থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। তাদের মতে তাসাউফের সাথে শরিয়তের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের মতে শরীয়ত হচ্ছে প্রাইমারী লেভেল আর মারিফত/হাকিকত হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লেভেল। যারা মারিফত/হাকিকত লেভেলে পৌছে যায় তাদের আর প্রাইমারী লেভেলের সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত এগুলো করার প্রয়োজন হয় না। কারণ তারা তাসাউফের এমন এক লেভেলে চলে গেছে যে তারা আল্লাহতে বিলিন হয়ে গেছে আর একে বলে ফানাফিল্লাহ। যারা এ পর্যায়ে পৌছে যায় তাদের ওযূ-গোসল, খাওয়া-খাদ্য লাগে না, এদের কাপড়-চোপড় থাকে না, এরা আর সাধারণ মানুষের মতো থাকে না। (নাউযুবিল্লাহ)

সূফীদের ধারণা শরিয়তের আইন ও পদ্ধতি মানার প্রয়োজন কি? জাহিল অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানহীন সূফীরাই এই ধরনের মত পোষণ করে থাকেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। শরিয়তের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্ক

থাকবে না, ইসলামে এমন কোন তাসাওউফের স্থান নেই। কোন সূফীরই সলাত, সিয়াম, হাজ্জ ও যাকাতের আনুগত্য থেকে মুক্তিলাভের অধিকার নেই। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, ইসলামিক সাইন্স, নৈতিক দায়িত্ব, চরিত্র, পারস্পরিক আদান-প্রদান, অধিকার-কর্তব্য ও হালাল-হারামের সীমানা সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ যে নির্দেশ দিয়েছেন, কোন সূফীরই সেই নিয়মের বিরোধী কার্যকলাপের অধিকার নেই।

ইসলামের সঠিক আধ্যাত্মবাদ কী?

ইসলামের আধ্যাত্মিক নীতি কী? জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থার সঙ্গেই বা উহার সম্পর্ক কী? এই বিষয়টি ভাল করে বুঝার জন্য আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও দার্শনিক ধারণার পারস্পরিক পার্থক্য সর্বপ্রথম বুঝে নিতে হবে।

আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা

দর্শন ও ধর্ম জগতে সাধারণ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আত্মা এবং দেহ দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিস, উভয়ের ক্ষেত্র ও পরিবেশ আলাদা; উভয়ের দাবি বিভিন্ন বরং পরস্পর বিরোধী এবং এই উভয়ক্ষেত্রেই একই সঙ্গে উন্নতি লাভ কখনো সম্ভব নয়।

যারা আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিল, তারা নিজ নিজ 'আত্মার' উন্নতির জন্য এমন সব পথ খুঁজে বের করল, এই দুনিয়ার সঙ্গে যে সবের কোনই সম্পর্ক নেই। কারণ তাদের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন কোন পথ নেই, যা দুনিয়ার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। তাদের মতে আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য দেহের নিপীড়ন বা নির্যাতন অত্যন্ত জরুরী। এই কারণেই তারা এমন সব অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধনের নিয়ম উদ্ভাবন করেছে যা 'নফস'কে নিঃসন্দেহে ধ্বংস করে দেয় এবং দেহকে করে দেয় অবশ ও পঙ্গু। আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য গভীর জংগল, পর্বতগুহা এবং এই ধরনের নির্জন স্থানই উপযুক্ত বলে মনে করেছে, যেন সমাজের কোলাহল তাদের এই ধ্যান-তপস্যার গভীর একাগ্রতায় বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। আত্মার ক্রমবিকাশ সাধনের জন্য তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার এই বিপুল কর্মমুখরতা হতে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং পার্থিব জগতের সংস্পর্শে আসার সমস্ত সম্পর্ক ও সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ ছিন্ন

করে ফেলল। আত্মার উন্নতির জন্য এটা ভিন্ন অন্য কোন পথই তারা সম্ভব বলে মনে করে না।

বৈরাগ্যবাদের স্থান ইসলামে নেই

ইসলাম এভাবে জীবনের বৈষ্ণব ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছে এবং বলেছে যে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দুনিয়ার বাইরে হতে নয়, বরং এর মধ্যে থেকেই। আত্মার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ এবং সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করার আসল উপায় ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন-সমুদ্রের মাঝখানেই অবস্থিত– এর কিনারে নয়। দুনিয়া ছাড়া কোন দ্বীন নেই (There is no Deen without Dunya).

এই দুনিয়ার জীবনেই আত্মার উন্নতি

উপরের ব্যাখ্যায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী ধার্মিক ও দুনিয়াদার– উভয় ব্যক্তিরই কর্মক্ষেত্র এক, অর্থাৎ উভয়ে একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করবে।

রান্নাঘর হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স পর্যন্ত জীবনের যত ক্ষেত্র এবং ব্যাপারই হোক না কেন, তার দায়িত্ব দ্বীনদার ব্যক্তি দুনিয়াদার ব্যক্তিরই মত নিজের উপর চাপিয়ে নেবে। তবে যে জিনিস এই উভয় ব্যক্তির পথকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কের স্বরূপ।

দ্বীনদার ব্যক্তি যাই করবে, তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই সে করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত আইন অনুসারেই তা করবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদার ব্যক্তি (যে দ্বীন দ্বারা নিজের জীবনকে পরিচালনা করে না) সমস্ত কাজই করবে দায়িত্বহীনভাবে, এবং নিজের খেয়ালখুশী অনুযায়ী। এই পার্থক্যই দ্বীনদার ব্যক্তির সমগ্র পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জীবনে পরিণত করে এবং দুনিয়াদার ব্যক্তির সমগ্র জীবনকে আধ্যাত্মিকতার আলোক-জ্যোতি হতে বঞ্চিত করে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির চার স্তর

১ম স্তর – ঈমান ঃ মানুষের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়া যে, মহান আল্লাহ-ই তার একমাত্র মালিক, আইন-রচয়িতা এবং উপাস্য। আল্লাহর সন্তোষ লাভই তার সমস্ত চেষ্টা-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর আইনই তার জীবনের একমাত্র আইন। এই বিশ্বাস যত গভীর এবং দৃঢ় হবে, মানুষের মন

ততই পরিপূর্ণ ইসলামী হবে। আর তত বেশী দৃঢ়তার সাথে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চলতে পারবে।

২য় স্তর - আনুগত্য ঃ মানুষের নিজের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করা এবং কর্মজীবনে সেই একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব কবুল করা, যাকে সে নিজের প্রভু বলে মেনে নিয়েছে। কুরআনের পরিভাষায় এই আনুগত্যের, এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের নাম হচ্ছে – 'ইসলাম'।

৩য় স্তর - তাকওয়া ঃ সহজ ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি কর্তব্য-জ্ঞান ও দায়িত্ব-বোধ। মানুষ নিজের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এই কথা স্মরণ রেখে কাজ করবে যে, মহান আল্লাহর সমীপে তার চিন্তা, কথা ও কাজের পরিপূর্ণ হিসাব দিতে হবে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ প্রত্যেক কাজ হতে সে বিরত থাকবে। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যাবে এবং পরিপূর্ণ সাবধানতার সাথে হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা এবং ভাল-মন্দের বিচার করে পথ চলবে– বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে 'তাকওয়া'।

৪র্থ ও সর্বোচ্চ স্তর - ইহসান ঃ সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ইহসান। ইহসানের অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মানুষের ইচ্ছা যুক্ত হয়ে যাওয়া। আল্লাহ যা পছন্দ করেন, মানুষও ঠিক তাই পছন্দ করবে। আর আল্লাহ যা পছন্দ করেন না, মানুষের মনও ঠিক তাকে অপছন্দ করবে। আল্লাহ তাঁর নিজের পৃথিবীতে যে সব পাপের অস্তিত্ব দেখতে ভালবাসেন না, মানুষ নিজেই তা হতে দূরে সরে থাকবে। বরং তাকে বিলুপ্ত করার জন্য মানুষ সমগ্র শক্তি এবং সকল প্রকার উপায়কে নিযুক্ত করবে। আর আল্লাহ তাঁর দুনিয়াকে যে সব কল্যাণ ব্যবস্থায় সুসজ্জিত দেখতে চান, মানুষ শুধু তার নিজকে তা দ্বারা সজ্জিত করেই ক্ষান্ত হবেনা, বরং মরণপণ সংগ্রাম করে সারা দুনিয়াতে তাকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করবে। এই স্তরে পৌঁছলেই মানুষের ভাগ্যে আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ ঘটে। এই জন্যই এটা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ স্তর।

আধ্যাত্মিকতার জন্য ইসলামের শিক্ষা-পদ্ধতি

১ম পন্থা - জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ করা

জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ঃ মিডিয়া সকলের ব্রেইনে ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে : ইসলাম মানে টেররিজম, মুসলিম মানে টেররিষ্ট, ভাল মুসলিম মানে ফান্ডামেন্টালিষ্ট আর জিহাদ মানে মানুষ কাটা-কাটি বা যুদ্ধ।

জিহাদ এর সঠিক ধারণা ঃ 'জিহাদ' শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা বা Struggle. কোন কিছু লাভ করার জন্য শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, বুদ্ধি বৃত্তিক সকল প্রকার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সকল উপায়-উপাদান কাজে লাগানোকে জিহাদ বলে ।

ফী সাবীলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর রাস্তায় । আল্লাহর রাস্তায় সর্বদিক থেকে এবং সব উপায় অবলম্বন করে প্রচেষ্টা চালানোকে জিহাদ বলে । দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জবান, লেখনী, প্রচার মাধ্যম, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক তৎপরতা, সম্পদ ব্যয়, সর্বোপরি নিজের জীবন বিলিয়ে দেবার নাম জিহাদ । দ্বীনের জন্য একটি বাক্য ব্যয় করা, এক কদম হেঁটে যাওয়া, একটি লেখনী, সুন্দর ব্যবহার সবই জিহাদের অংশ । দ্বীনকে সমুজ্জল করার জন্য যে কোন প্রচেষ্টাও জিহাদের অংশ । দ্বীনের কাজে লাগবে, মুসলিম জনতার উপকারে আসবে এমন সকল প্রচেষ্টায় রত কাজই জিহাদের সমতূল্য । জিহাদের অর্থ যুদ্ধ বা কাটা-কাটি নয় । যুদ্ধ হচ্ছে "হার্‌ব" এবং "কতল" হচ্ছে কাটা-কাটি । জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ সম্মিলিত ফরয এবং সবচাইতে বড় ফরয কাজ ।

"হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি । আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে, নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের প্রাণ দ্বারা । এটিই তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পারো ।" (সূরা সফ ঃ ১০-১১)

২য় পন্থা – সলাহ (নামায)

এটা দৈনিক পাঁচবার মানুষকে নূতন করে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আল্লাহর ভয়কে অন্তরে সতেজ করে । এতে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা মানুষের মনে নিত্য নূতন করে জেগে উঠে । তাঁর আদেশ ও বিধি-নিষেধ বারে বারে মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলার কথা বারবার স্মৃতিপটে জাগ্রত করে । সলাত শুধু এককভাবে, ব্যক্তিগতভাবে আদায় করার জন্য নয়, তা জামায়াতের সাথেই আদায় করার জন্য ফরয করা হয়েছে, যেন গোটা সমাজই সমষ্টিগতভাবে এই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চলার জন্য প্রস্তুত হতে পারে ।

৩য় পন্থা – সিয়াম (রোযা)

সিয়াম প্রত্যেক বৎসরই পূর্ণ এক মাস কাল ধরে এককভাবে প্রত্যেকটি মুসলিম ব্যক্তিকে এবং সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম সমাজকে তাকওয়ার শিক্ষা দেয় ।

এই এক মাস সিয়াম কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পুরো বছরের জন্য প্রতিটি সিয়ামপালনকারীকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলে ।

৪র্থ পন্থা - যাকাত

এই যাকাত ব্যবস্থা মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থদান, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করে । আজ-কালকার মানুষ ভুলবশতঃ যাকাতকে ট্যাক্স বলে মনে করছে । অথচ যাকাতের মূল উদ্দেশ্য ট্র্যাক্স হতে সম্পূর্ণ পৃথক । যাকাতের আসল অর্থ হচ্ছে ক্রমবিকাশ ও পবিত্রতা দান । এই শব্দটি দ্বারা ইসলাম মানুষের মনে এই নিগূঢ় তত্ত্বের অনুভূতি জাগিয়ে দিতে চায় যে, আল্লাহর প্রেমে তুমি তোমার ভাইদেরকে যে আর্থিক সাহায্য করবে তাতে তোমার আত্মা উন্নতি লাভ করবে এবং তোমার চরিত্র পূত ও পবিত্র হবে ।

৫ম পন্থা - হাজ্জ

হাজ্জ হচ্ছে বিশ্ব সম্মেলন । এটা আল্লাহর ইবাদতের কেন্দ্রস্থলে ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে একত্র করে এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে । এবং এর মাধ্যমে এমন একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন চালিয়ে নেয়, যা দুনিয়ার কয়েক শতাব্দী কাল ধরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতেও অনন্তকাল পর্যন্ত তা সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে ।

কুরআন বুঝে পড়া জরুরী কেন?

কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব যা জীবন পরিচালনার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন । এর পরিপূর্ণ ব্যবহারই প্রকৃত সুফলের নিশ্চয়তা বিধান করে । এর আংশিক অনুসরণ ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাবের সুসংবাদ প্রদান করে । এ ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে ঃ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অ স্বীকার করবে? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ অবগত আছেন ।" (সূরা বাকারা ঃ ৮৫)

না জানার কারণে আমরা ক্রমাগত কুরআনের প্রতি হাস্যকর আচরণ করেই যাচ্ছি । এ কিতাবকে সবিনা খতম আর সূরা ইয়াসীন পাঠ করার জন্য ব্যবহার

করে যাচ্ছি। যে-কিতাব আমাদের যাবতীয় সফলতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে পারত সেটির কাছ হতে আমরা শুধু সামান্য সওয়াব আদায়ের জন্য আর মৃতের কুলখানির জন্য ব্যবহার করছি। অথচ এটি বিস্তারিত অর্থসহ পড়ে আমাদের জেনে নেয়া উচিত কিভাবে আমরা একটি সোনালী সমৃদ্ধিশালী জীবন গড়তে পারি যা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুস্পষ্ট সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে। আল্লাহ তাঁর নাবীকে বলেছিলেন ঃ

"তোমাকে ক্লেশ (কষ্ট) দেবার জন্যে আমি তোমার প্রতি এই কুরআন অবতীর্ণ করি নাই।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ২)

আসুন আমরা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত কুরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করি, এবং রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত বিস্তারিত পড়ে জেনে নিই – কিভাবে একটি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন সুখী-সমৃদ্ধ পরিবার ও সমাজ গড়তে পারি। আল্লাহ আমাদের তার দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে জেনে এর পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দিন। ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাব হতে পরিত্রাণ দিন। অর্থ বুঝে অধ্যয়নের পাশাপাশি সওয়াবের উদ্দেশ্যে যদি তিলাওয়াত করতে চাই তাহলে কোন দোষ নেই।

অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেন তা দশ হাজার বার পড়লেও (অর্থাৎ তিলাওয়াত করলে) কি অসুখ সারবে? মোটেও না। আমাকে ঐ ঔষধগুলি কিনে ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই কেবল আমি রোগমুক্তির আশা করতে পারি। কুরআন হলো জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের প্রেসক্রিপশন। এটা অধ্যয়ন করে, অনুধাবন করে এর শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি যদি অর্থ ছাড়া এটা কেবল রিডিং পড়ে যাই তাহলে এটা কুরআন পাঠানোর মূল লক্ষ্য ব্যর্থ করে দেবে। তাই আজ থেকে প্রতিদিন ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা নিয়মিত অর্থ বুঝে কুরআন অধ্যয়ন করি এবং সেই অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তুলি।

কুরআন স্পর্শ করার জন্য অজুর প্রয়োজন নেই ঃ কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযুর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ কুরআনের যে আয়াতে বলেছেন 'পাক-পবিত্রতার কথা', সেটা হচ্ছে লাওহে মাহফুজে যে কুরআনের মূল কপি রাখা আছে তা ফিরিশতারা ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এখানে ওযূর কথা বলা হয় নাই। ওযূ প্রয়োজন শুধু মাত্র সলাত এবং তাওয়াফের জন্য। 'কুরআন পড়তে বা ধরতে ওযূ থাকতে হবে' এটি শয়তানের একটি প্ররোচনা। কারণ শয়তান চায় না মানুষ বেশী বেশী কুরআন পড়ুক, বুঝুক এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা

করুক। মুসলিমদের বেশীরভাগ সময়ই সাধারণত ওযূ থাকে না আর সেজন্য তারা ভয়ে কুরআনও স্পর্শ করে না। মানুষ কুরআন বুঝে পড়ে সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে সেখানেই শয়তানের ব্যর্থতা।

রসূল ﷺ কুরআনের আয়াত দিয়ে চিঠি লিখে বিভিন্ন দেশের অমুসলিম রাজাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়েছেন। সেই সকল অমুসলিম রাজারা ওযূ ছাড়াই কুরআন স্পর্শ করেছেন। ইউরোপ-আমেরিকা-ক্যানাডা-অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার কপি কুরআন বিতরণ করা হয় অমুসলিমদের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে। এবং হাজার হাজার অমুসলিম ওযূ ছাড়া কুরআন পড়েই মুসলিম হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যেও কোটি কোটি আরবী ভাষাভাষী অমুসলিম রয়েছে। তাদেরকেও দ্বীনের দাওয়াত দিতে হলে কুরআন দিয়েই দিতে হবে। যদি তাদেরকে কুরআন পড়ার সুযোগ দেয়া না-ই হয় তাহলে তারা ইসলাম সম্পর্কে জানবে কীভাবে? দ্বীনের আলো পাবে কিভাবে? আল কুরআন শুধু মুসলিমদের জন্য আসেনি, এটি এসেছে গোটা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য। এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ডা. জাকির নায়েকের লিখা বই এবং ডা. মতিয়ার রহমানের লিখা বই পড়া যেতে পারে। "ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা।"

মাতা-পিতার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাঠি

আল্লাহর নিয়ামাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো নিয়ামাত হলো মাতা-পিতা, মানুষের জন্মগ্রহণ ও লালন-পালনে আল্লাহর পরেই মাতা-পিতার অবদান বড়। মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ ও তাঁদের খিদমত করা জিহাদ করার সমতুল্য। যাকে আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন তাকে আসলে জান্নাতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে এ সুযোগ কাজে লাগাবে, তাকে আল্লাহ জান্নাত দেবেন। আর যে এ সুযোগ গ্রহণ করবে না সে ধ্বংস হবে। আমার পীরের দু'আ কবুল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে, তার কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু আমার মায়ের দু'আ কবুল হবে, সেটার গ্যারান্টি আল্লাহ দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় পীর হচ্ছেন আমার মা।

"আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই যদি তোমাদের সামনে বার্ধক্যে

পৌঁছে যায়, তাহলে তাঁদেরকে উহ্! শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভৎসনা করে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দু'আ করতে থাকো যেমন, হে আমার রব (প্রতিপালক)! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন আমার শিশুকালে [সহায়হীন সময়ে] তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্যস্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

"আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসূল ﷺ -এর খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে? নাবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমার মা। সে আবার বললো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আমরা যদি কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস পর্যালোচনা করে দেখি যে, জান্নাত অনেকাংশে নির্ভর করছে জন্মদাতা মাতা-পিতার সন্তুষ্টির উপর। কুরআনে বা সহীহ হাদীসে কোথাও পীরসাহেবকে সন্তুষ্টির কথা বলা হয় নাই। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, অনেকেই সঠিক জ্ঞানের অভাবে নিজের পিতা-মাতার চেয়েও পীর কেবলাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আঙ্গুর-বেদানা নিয়ে যান পীরের দরবারে। ভাল ভাল উপহার এবং মোটা অংকের টাকা নিয়ে ঢালেন পীরের দরগায়। পিতা-মাতার খেদমত করার আর তাদের সময় থাকে না।

আখিরাতের ময়দানে পীরসাহেব মুরীদদের কোন কাজে আসবে না

সহীহ বুখারীর একটি হাদীস আমরা সকলেই জানি, হাদীসটির সারর্মম হলো যে, আখিরাতের ময়দানে সবাই ইয়া নাফসী-ইয়া নাফসী করতে থাকবে। সকলে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সর্বপ্রথম আদম (আ.)-এর কাছে যাবে এবং তিনি বলবেন আমি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে ফল খেয়েছি এবং জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছি, আমি নিজেই আজ লজ্জিত, আল্লাহর সামনে ভীত, তাই আমি আজ তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না, তোমরা নূহ (আ.)-এর কাছে যাও।

তারপর সবাই নূহ (আ.)-এর কাছে যাবে, তিনিও বলবেন আমি পারবো না, তোমরা ইবরহীম (আ.)-এর কাছে যাও, তিনিও বলবেন আমি পারবো না, তোমরা মূসা (আ.)-এর কাছে যাও, তিনিও বলবেন আমি পারবো না, তোমরা ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও, তিনিও বলবেন আমি পারবো না, তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ -এর কাছে যাও। তারপর আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর অনুমতি পাওয়ার পর যারা সঠিক পথে ছিল তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ (শাফাআত) করবেন। এখানে দেখা যাচ্ছে আদম (আ.) থেকে শুরু করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত কোন নাবীই কারো জন্য কোন সুপারিশ করতে পারবেন না, সেখানে পীরসাহেব মুরীদদের পরিত্রাণ করার তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

উপরের এই হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারছি যে ঐ দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না। যার যার হিসাব তাকেই দিতে হবে এবং প্রতিটি মানুষ তার আমল অনুযায়ী পুরষ্কার ও শাস্তি ভোগ করবে। এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের এই আয়াতগুলো দেখতে পারি ঃ

সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫, সূরা ইউনুস ঃ ৪, সূরা হুদ ঃ ১০৬-১০৮, ১১১, সূরা আন-নাহল ঃ ১১১, সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৫৬-৫৭, সূরা আল-মু'মিনুন ঃ ১০২-১০৩, সূরা আন-নূর ঃ ২৩-২৫, সূরা আন-নামল ঃ ৮৫, ৯০-৯৩, সূরা আল-আনকাবুত ঃ ১৩, সূরা আর রূম ঃ ১৪-২৩, সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৩-৫৪, সূরা আয-যুমার ঃ ১০, ৭০, সূরা আল মু'মিন ঃ ১৭, ৫২, সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ২৪, সূরা আল-জাসিয়া ঃ ৩৪-৩৫, সূরা ক্বাফ ঃ ২৮-৩১, সূরা আত-তুর ঃ ১৬-১৭, সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৭-৪৪, ৮৮-৯৪, সূরা আত-তাগাবুন ঃ ৯-১০, সূরা আত তাহরীম ৭, সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১৮-৩২, সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ২২-২৫, সূরা আল মুরসালাত ১১-১৫, ৩৫-৩৯, সূরা আন-নাযিয়াত ৩৪-৪১, সূরা আয যিলযাল ঃ ৪-৮, সূরা আল করিয়াহ ঃ ৬-৯।

আসুন একটি পরীক্ষা করে দেখি

আমাদের সকলের শেষ গন্তব্য (final destination) একটাই আর তা হচ্ছে জান্নাত। আমরা সকলেই জান্নাতে যেতে চাই কেউ-ই জাহান্নামে যেতে চাই না। আমরা যদি এবার খুব সাধারণভাবে বিষয়টা নিয়ে এভাবে চিন্তা করি যে, জান্নাতে যাওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার সকল ফরয হুকুম মেনে চলা, আর নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা এবং সকল ক্ষেত্রে কোনভাবেই

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা। আর আমাদের রসূল ﷺ যা দিয়ে গেছেন তার বাইরে অতিরিক্ত কোন ইবাদত বা আমল না করা।

এবার আমরা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে একটা পরীক্ষা করি। পীরসাহেব এবং তার মুরীদদেরকে ধরি Group-A এবং যারা পীরসাহেবদেরকে অনুসরণ করেন না কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করেন তাদেরকে ধরি Group-B।

Group-A দেখাচ্ছেন তাদের যুক্তি যে তারা যে সকল অতিরিক্ত আমল করছেন তা সঠিক এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত মার্কস হিসেবে তা সহায়ক হবে। আবার Group-B দেখাচ্ছেন তাদের যুক্তি যে এই সকল অতিরিক্ত কাজগুলো কুরআন-সুন্নাহতে নাই, তাই তা অতিরিক্ত সওয়াবের আশায় পালন করারও প্রয়োজন নেই।

আল্লাহর দেয়া ফরয বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু এই দুই গ্রুপের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেউ বলছেন না যে ফযরের ফরয সলাত দুই রাকাতের স্থানে তিন রাকাত, অথবা সিয়াম না রাখলেও চলবে।

Group-A যা বলছে বা করছে তার বেশীরভাগ বিষয়গুলোই আল্লাহর ফরয ইবাদত নয়, আলোচিত বিষয়গুলো হচ্ছে বিতর্কিত। এখন আমরা Group-A যা বলছে বা করছে তা তাদের সাথে একমত হয়ে না হয় মেনে নিলাম। আখিরাতের ময়দানে বিচারের পর Group-A যদি সঠিক হয় তাহলে অতিরিক্ত ঐ সকল কাজ করার কারণে তারা ৮০% star marks পেয়ে জান্নাতে চলে যাবেন এবং Group-B অতিরিক্ত কাজগুলো না করার কারণে শুধু ৪০% পাশ মার্কস পেয়ে জান্নাতে যাবেন। এই চিত্রে দুই গ্রুপই কিন্তু জান্নাতে যাচ্ছেন। কিন্তু Group-B-র যুক্তি অনুযায়ী যদি আল্লাহ আখিরাতের ময়দানে ইসলামে যা নেই তা অতিরিক্ত হিসেবে করার কারণে যদি অপরাধী হিসেবে ধরেন তাহলে কিন্তু Group-A বিপদে পড়ে যাবেন, কোনভাবেই রক্ষা নেই এবং Group-B কিন্তু এবারও পার পেয়ে যাবেন। উভয় ক্ষেত্রেই Group-B কিন্তু বিতর্কিত কাজগুলো না করার কারণে দুটো চিত্রেই পার পেয়ে যাচ্ছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিতর্কিত ইবাদতগুলো করার কারণে যথেষ্ট Risk রয়েছে। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে অতিরিক্ত ভাল কাজ করতেই চাই তাহলে নিম্নের লিষ্ট অনুযায়ী কুরআন-হদীসের আমলগুলো করতে থাকি।

কুরআন-হাদীসের দলিল অনুযায়ী ভাল কাজের লিষ্ট

১) পরিপূর্ণ ঈমান আনা এবং আল্লাহর সাথে সৃষ্টির অন্য কাউকে অংশীদার না করা । (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭, সূরা নিসা ঃ ৩৬)

২) দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা । (সূরা যুমার ঃ ৯)

৩) সলাত প্রতিষ্ঠা ও আদায় করা । (সূরা বাকারা ঃ ৫)

৪) আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম [জিহাদ] করা । (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮)

৫) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা । (সূরা আলে ইমরানঃ১০৪)

৬) দ্বীন ইসলামের সকল বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা । (সূরা বাকারা ঃ ২০৮)

৭) মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করা ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা । (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৩)

৮) ইয়াতিম ও দরিদ্রদের সাহায্য করা । (সূরা বাকারা ঃ ১৭৭)

৯) বিপদে ধৈর্যধারণ করা এবং একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া । (সূরা বাকারা ঃ ১৫৩)

১০) সকল ধরনের হারাম কাজ এবং কবীরা গুনাহ হতে নিজেকে রক্ষা করা । (সূরা নিসা ঃ ১৪, ৩১)

১১) সর্বদা ও নিয়মিত দুরূদ শরীফ পাঠ করা । (সূরা আহযাব ঃ ৫৬)

১২) সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করা । (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)

১৩) আল্লাহর রাস্তায় সর্বদা দান খয়রাত ও সদাকা দেয়া । (সূরা বাকারা ঃ ৩)

১৪) হালাল পথে টাকা পয়সা খরচ করা । (সূরা বাকারা ঃ ১৯৫)

১৫) মিসকিন ও দরিদ্রকে সর্বদা আহার করানো । (সূরা ইনসান ঃ ৮)

১৬) জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র রসূল ﷺ -এর জীবনাদর্শ মেনে চলা । (সূরা আহযাব ঃ ২১)

১৭) প্রয়োজনে মু'মিন ভাইদেরকে করযা-এ হাসানা দেয়া । (সূরা তাগাবুন ঃ ১৭)

১৮) মু'মিনদের মধ্যে সালামের প্রচলন করা । (সূরা নিসা ঃ ৮৬, সূরা নূর ঃ ৬১ এবং সহীহ মুসলিম)

১৯) নিয়মিত ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪, সূরা বাকারা ঃ ১৪০, সূরা নাহল ঃ ১২৫)

২০) সকল মু'মিন ও মুত্তাকীদের ভালবাসা । (সহীহ আবু দাউদ, আহমদ)

২১) সকল ফরয ও ওয়াজিব সময়মত আদায় করা । (সহীহ মুসলিম)

২২) সর্বদা অর্থ বুঝে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা । (সহীহ মুসলিম)

২৩) দ্বীনি ইলমী বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত থাকা। (সহীহ মুসলিম)
২৪) নিয়মিত দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী)
২৫) সর্বদা সত্য কথা বলা। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)
২৬) গভীর রাতে উঠে সর্বদা ও নিয়মিত তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করা। (তিরমিযী)
২৭) মেহমানকে সম্মান করা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
২৮) প্রতি চাঁদের মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে তিনটি সিয়াম পালন করা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
২৯) মহরম মাসের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে দুটি সিয়াম পালন করা। (সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)
৩০) যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন বিশেষভাবে নফল ইবাদত ও বেশি বেশি আল্লাহর যিকর (স্মরণ) করা। (সহীহ বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)
৩১) হাজ্জে না গিয়ে থাকলে যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ অর্থাৎ আরাফাতের দিন সিয়াম পালন করা। (সহীহ মুসলিম)
৩২) শাওয়াল মাসে ৬টি সিয়াম পালন করা। (সহীহ মুসলিম)
৩৩) হালাল উপায়ে টাকা পয়সা উপার্জন করা। (সহীহ মুসলিম)
৩৪) রোগীকে দেখতে যাওয়া। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
৩৫) আল্লাহর জন্য কাউকে দ্বীনি ভাই হিসেবে গ্রহণ করা। (সহীহ মুসলিম)
৩৬) মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা। (সহীহ আবু দাউদ)
৩৭) আল্লাহর পর মুহাম্মাদ ﷺ -কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা। (সহীহ বুখারী)

শেষ কথা

এই বইটি আমাদের ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের জন্য একটি সতর্কবাণী বা গাইডলাইন মাত্র। তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত এই চারটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন, তা না হলে আমাদের ঈমান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এজন্য আমাদের প্রয়োজন তাফসীরসহ আল কুরআন ও সহীহ হাদীস পাঠ এবং এই বইয়ের শেষে রেফারেন্স সেকশনে উল্লিখিত বইগুলো পড়ে নেয়া।

দুঃখের বিষয় যারা সূফীজম পালন করেন তারা দ্বীন ইসলামে যা নেই তা ফরয মনে করে বেশী বেশী করে পালন করছেন, আবার যা অতি গুরুত্বপূর্ণ হয় তা পালন করছেন না বা আংশিকভাবে পালন করছেন। অনেক কাজই পূণ্যের কাজ মনে করে করতে গিয়ে শিরক এবং বিদ'আত মিশ্রিত করে ফেলছেন। অনেকের ধারণা যে পীরসাহেব আখিরাতের ময়দানে মুরীদদেরকে পার করে দিবেন। কিন্তু সূরা আন্ নাজ্ম এর ৩৮-৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"কোন বোঝা বহনকারী অন্য কোন লোকের বোঝা বহন করবে না। মানুষ তা পায় যা সে করে। তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে।"

তাই কারো উপর নির্ভর করা ঠিক নয়, আখিরাতের ময়দানে আমার বোঝা আমাকেই টানতে হবে, ঐদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, আমার নিজ আমল দিয়েই আমাকে পার পেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

"সেদিনের ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কোন কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং পাপীদের কোন দিক হতেই সাহায্য করা হবে না।"
(সূরা বাকারা ঃ ৪৮)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাও। কিন্তু (পরকালে) আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হাদীসখানি থেকে বুঝা যায় যে পরকালে অন্য কারো তো দূরের কথা, রসূল ﷺ -এরও শাফায়াতের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কারো গুনাহ মাফ করে নেয়ার ক্ষমতা থাকবে না (যদি না আল্লাহ তেমন ইচ্ছা করেন)।

আমরা গত পনের বছর সূফীতত্ত্বর (Sufism) পাশাপাশি তাফসীরসহ কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং পৃথিবীর বিখ্যাতসব ইসলামিক স্কলারদের বই পড়াশোনা করেছি, পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামিক স্কলারদের প্রোগ্রাম দেখেছি, এতে যে জ্ঞান লাভ করেছি তার উপর ভিত্তি করেই আমরা চেষ্টা করেছি তাওহীদ-শিরক ও সুন্নাত-বিদ'আত এই চারটি বিষয়ের উপর পরিষ্কার ধারণা তুলে ধরতে। এই বইয়ের আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে হয়তো কারো জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। প্রিয় পাঠক, এই বিষয়গুলো আমরা নতুন বির্তক সৃষ্টি করার জন্য বা কাউকে হেয় করার জন্য লিখিনি। বরং কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শিরক ও বিদ'আতের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের সতর্ক করার চেষ্টা করেছি মাত্র, কারণ সূরা আলে-ইমরান এর ১০৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজে বাঁধা দেবে, তারাই হ'ল সফলকাম।"

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কী নির্দেশ তা সামনে রেখে আমরা প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলব, ইনশাআল্লাহ। ইসলামের বাইরে কোন্ হুজুর কী বলল বা কী করল তাতে আমাদের কোন কিছুই যায় আসে না। কোন বুজুর্গ যদি নৌকা ছাড়াও নদী পার হতে পারেন বা পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন আর তার মধ্যে যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ -এর কোন ফরয হুকুম মেনে চলায় অনিয়ম দেখা যায়, তাহলে সেই কেরামতিতে আপনার আমার কোনই কাজ নেই। দ্বীন-ইসলাম হচ্ছে অংকের মতো পরিষ্কার। অংকে যেমন ১০+১০ = ২০ হয় অথবা $a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2$ হয় তেমনি ইসলামেও গোজামিল দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

জীবন পরিচালনার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীসে রয়েছে। আর যা প্রয়োজন নেই তা সেখানে নেই। কোন কাজ যতোই পূণ্যের বা সওয়াবের কাজ বলে মনে হোক না কেন যদি তা কুরআন ও সহীহ হাদীসে না থাকে আর সেই কাজ যতো বড় বুজুর্গ বা ওলি'র দ্বারাই সংগঠিত হোক না কেন, তা ইসলামের অংশ নয়।। মহান আল্লাহ আমাদের বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

রেফারেন্সেস

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর - ইবনে কাসীর
২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, নাসাঈ
৩. তৌহিদের মূল সূত্রাবলী - ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস
৪. কিতাবুত তাওহীদ - দারুস্‌সালাম পাবলিকেশনস, রিয়াদ
৫. সঠিক 'আকীদা ও বিদ'আতী আমলের পরিচয় (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড) - ইঞ্জি. শামসুদ্দিন আহ্‌মদ
৬. ইসলামি অনুষ্ঠানের নামে কতিপয় অনৈইসলামিক প্রথা (সব খন্ড) - ইঞ্জি. শামসুদ্দিন আহ্‌মদ
৭. ইসলাম ও পীরতন্ত্র - ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আহ্‌মদ
৮. পীরতন্ত্রের আজব লীলা - আবু তাহের বর্দ্ধমানী (রহ.)
৯. মিলাদ, শবে বরাত ও মিলাদুন্নবী কেন বিদ'আত? - হাফেয মুহাম্মদ আইয়ুব
১০. দ্বীন ইসলামের সঠিক পথ - হাফেজ জাহিদ হোছাইন
১১. মীলাদ প্রসঙ্গ - মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১২. কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে শবে বরাত সমাধান - শাইখ আকরামুজ্জামান বিন 'আব্দুস সালাম'
১৩. মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পৌঁছে কি? - মুহাম্মদ আহমাদ 'আব্দুস সালাম'
১৪. ইসলাম ও তাসাউফ - আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী
১৫. সুন্নাত ও বিদাত - মা. আব্দুর রহীম
১৬. শিরক ও তাওহীদ - মা. আব্দুর রহীম
১৭. যুক্তির কষ্টি পাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব - খন্দকার আবুল খায়ের
১৮. সাওয়াল জওয়াব - খন্দকার আবুল খায়ের
১৯. পীর, ফকীর ও মাযার হইতে সাবধান - তাওহীদ প্রকাশনী
২০. হাকপন্থী আলেম ও ভেজাল আলেমের পরিচয় - জহুর বিন ওসমান
২১. ইসলামের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় - মা. আমানুল্লাহ্‌ বিন ইসমাঈল আল্‌-মাদানী
২২. কবর ও মাযার সংলগ্ন মাসজিদে সলাত আদায়ে সতর্ক হোন! - নাসির উদ্দিন আলবানী
২৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) - আল্লামা আবূ মুহাম্মদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)
২৪. প্রত্যেক মুসলমানের যেসব বিষয় জানা ওয়াজিব - শায়খ মু. সুলায়মান আত্‌-তামীমী (রহ.)
২৫. সুন্নাত বনাম বিদ'আত - অধ্যাপক আব্দুর নূর সালাফী (রহ.)
২৬. শাফায়াত দ্বারা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি? - ডা. মো. মতিয়ার রহমান
২৭. আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় - মতিউর রহমান
২৮. ইসলামের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ- সাইদুল হোসেন
২৯. মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল - আবদুস শহীদ নাসিম
৩০. গীবাত, চোগলখোরী, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কুসংস্কার থেকে সাবধান - হাফিজ মুহঃ আইয়ুব
৩১. ছালাতুর রসূল (ছা.) - মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩২. ইসলামি বিশ্বকোষ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা
৩৩. ফিরকাবন্দীর মূল উৎস - আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী
৩৪. ইসলামের জীবন-পদ্ধতি - Internatioanl Islamic Federation of Student Organizations, Saudi Arabia
৩৫. ইসলাম পরিচিতি - Internatioanl Islamic Federation of Student Organizations, Saudi Arabia
৩৬. হানাফী ফিকহের ইতিহাস ও পরিচয় - মুফতী মা. আব্দুর রউফ
৩৭. যঈফ ও মওজু হাদীসের সংকলন - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)
৩৮. যঈফ আত-তিরমিযী [দ্বিতীয় খন্ড] - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)
৩৯. যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)

৪০. যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব [২য় খন্ড] - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)
৪১. ইসলামী আকীদার পরিচয় - মূল: ড. সালিহ ফাওযান ইবন আবদুল্লাহ আল ফাওযান, অনুবাদ: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
৪২. বিদ'আত পরিচিতির মূলনীতি - ডা. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
৪৩. ঈমান-ইসলামের মূলভিত্তি ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাস - মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ
৪৪. লালন-সঙ্গীত (১ম খন্ড) - ফকির আনোয়ার হোসেন
৪৫. তাবলিগ জামাত ও তার নেসাব - ডা. মতিউর রহমান
৪৬. মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মানতে বাধ্য? - সুলতান বিন আবু আবদুল্লাহ আল-মাসুমী
৪৭. তাকলীদ - অবদুর নূর সালাফী (রহ.)
৪৮. মাযহাব কি ও কেন? - মাওলানা তাকী উছমানী
৪৯. ঈমান-ইসলামের মূলভিত্তি ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাস - মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ
৫০. শার'ঈ মানদণ্ডে তাবিজ-কবচ এবং ঝাড়-ফুঁক - আব্দুল আলীম ইবন কাওসার
৫১. প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন - ড.খ.ম. আব্দুর রাজ্জাক
৫২. তাফসীরুল উশরিল আখীর - মিনাল কুরআনিল কারীম
৫৩. বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণাম - ড. মোহাম্মাদ শফিউল আলম ভুঁইয়া
৫৪. Fundamentals of Tawheed – Dr. Bilal Philips
৫৫. The Book of Tawheed – Darussalam Publications
৫৬. The Concise Coll. Creed Tauhid – Darussalam
৫৭. The Many Shades of Shirk - Darussalam Publications
৫৮. Four Principles of Shirk – Muhammad Bin Abdul Wahhab
৫৯. Commentary on the Three Fundamental Principles of Islam – Darussalam.
৬০. Four Imams – by Muhammad Abu Zahra
৬১. Hadith Sonkoloner Itihash - by Maulana Muhammad Abdur Raheem
৬২. The Quranic Concept of Nikah (Wedlock) Vs Religious Prostitution – Akhtar Sherazi
৬৩. www.islamhouse.com
৬৪. www.quaraneralo.com
৬৫. www.jumarkhutba.com
৬৬. Lecture on Unity of Ummah – Dr. Zakir Naik
৬৭. Lecture – Shiekh Matiur Rahman Madani
৬৮. Lecture – Shiekh Abdur Razzaque bin Yousuf
৬৯. Lecture – Shiekh Amanullah Madani
৭০. Lecture – Shiekh Kamaluddin Jaffri
৭১. Lecture – Sheikh Shahidullah Khan Madabi
৭২. Lecture – Sheikh Saifuddin Belal Madani
৭৩. Lecture – Sheikh Saifullah Madani
৭৪. Lecture – Shiekh Muzaffar bin Mohsin
৭৫. Lecture – Dr. Monzur E Elahi
৭৬. Lecture – Dr. Mufti Muhammad Kazi Ibrahim
৭৭. ইবনু আবিদীন এর হাশিয়া ১ম খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা, رسم الفتي ১ম খণ্ড ৪র্থ পৃষ্ঠা, ছালিহ আর ফাল্লানীর إيقاظ الهمم পৃষ্ঠা ৬২ ।
৭৮. ইবনু আব্দিল বর এর فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء في الإنتقاء পৃষ্ঠা ১৪৫ ইবনুল কাইয়িম এর إعلام الوقعين (২/৩০৯), ইবনুল আবিদীন البحر الرائق এর টীকায় (৬/২৯৩), الفتي رسم পৃষ্ঠা ২৯, ৩২ ।